ওয়েস্টার্ন

# বিপাক

মাসুদ আনোয়ার

সেবা
প্রকাশনী

### ওয়েস্টার্ন

# বিপাক

## মাসুদ আনোয়ার

ধর্মসভায় যোগ দেয়ার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে নিজেকে পাল্টে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্ধর্ষ স্টেজডাকাত ফ্রাঙ্ক সেলজার। এরপর থেকে একজন সৎ ও পরিশ্রমী মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে চায়। নিজের জন্যে একটা র‍্যাঞ্চ; শান্ত, নিরিবিলি, কর্মমুখর একটি সংসার—আর একটা চমৎকার বউ...। কিন্তু সে জন্যে দরকার আরও কিছু টাকার।

শেষবারের মত পশ্চিমগামী ওভারল্যাণ্ড স্টেজকোচ ডাকাতি করে সে-টাকা জোগাড় করার ইচ্ছে তার। কিন্তু অঘটনটা ঘটে গেল তখনই। দলের একজনের গুলি খেয়ে মারা গেল ইউএস মার্শাল পপ ম্যাক্সওয়েল। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল ফ্রাঙ্কের। এখন ওর কল্পনায় মার্টা মে নামে এক অনিন্দ্য সুন্দরী, বাস্তবে নাছোড়বান্দা আইন আর পেছনে বো ব্রীন নামে এক কুটিল শত্রু...

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

---

**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন

# বিপাক

মাসুদ আনোয়ার

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-8340-7

আটাশি টাকা

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৫

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ইসমাইল আরমান

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
**সেগুনবাগান প্রেস**
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
**প্রজাপতি প্রকাশন**
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
**সেবা প্রকাশনী**
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
**প্রজাপতি প্রকাশন**
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

BIPAK
A Western Novel
By Masud Anwar

The Online Library of Bangla Books

# এক

দীর্ঘ ঢাল বেয়ে উঠতে হচ্ছে অনিচ্ছুক ঘোড়াটাকে, মাঝে মধ্যে থেমে যেতে চাইছে। তবে মালিকের দু'হাঁটুর ঘন ঘন গুঁতোর কারণে সুস্থির হতে পারছে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাঁটতে হচ্ছে।

বিকেল চারটা। সারাদিন অকৃপণ আলো আর উত্তাপ বিলিয়েছে নগ্ন সূর্য, এখন কিছুটা মিইয়ে এসেছে। পশ্চিম দিগন্তে নেমে যাচ্ছে ধীরে সুস্থে। আলো কিছুটা ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে; তাপের তারতম্য অবশ্য ঘটেনি খুব একটা।

আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল ঘোড়াটা মালিকের সঙ্কেত পেয়ে। একদম অনড় হয়ে রইল।

মালিকের নাম ফ্রাঙ্ক সেলজার। শিরদাঁড়া উঁচু করে বসে আছে স্যাডলে। সামনে সিডার ঝোপের ওপর দিয়ে চোখ চলে গেছে পুবে। একটা বাঁক ঘুরতে পশ্চিমগামী ওভারল্যাণ্ড মেইল স্টেজকোচটা নজরে এল ওর। এগিয়ে আসছে ওটা।

ভ্রূ কুঁচকে আছে ফ্রাঙ্কের। মাইল তিনেক দূরে এখনও কোচটা। ও যেখানে আছে, সেখান থেকে প্রায় দুই শ' ফুট নীচের সমতলে। তবু ড্রাইভারের পাশে বসা শটগানধারী পাহারাদারকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ও। লোকটা অচেনা। ফ্রাৎস, লনিগান কিংবা অন্য কোনও পরিচিতদের কেউ নয়। অবাক হলো সে। নিয়মিত পাহারাদারের বদলে অচেনা একজনকে কীভাবে এমন একটা

দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হলো বুঝে উঠতে পারছে না।

অবশ্য এতে অবাক হবারও কিছু নেই। এমন কোনও কথা নেই যে, সব সময় সব কিছু একই নিয়মে চলবে। একটা পূর্বপরিকল্পিত এবং নিয়মিত কাজের ছকও পরিস্থিতির কারণে শেষ মুহূর্তে পাল্টে যেতে পারে। নিয়মিত গার্ড হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে কিংবা ব্যক্তিগত কোনও জরুরি কাজে আটকে যেতে পারে–এমনকী মারাও যেতে পারে। এগুলো ছাড়াও যে আরও কারণ থাকতে পারে না, তা নয়। কিন্তু সে জন্যে স্টেজকোচ বন্ধ থাকতে পারে না। বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হয়।

নিয়মিত গার্ডের পরিবর্তন ছাড়া আর সব কিছু আগের মতই আছে।

ড্রাইভারের পাশে বসা লোকটির দিকে আবার তাকাল ফ্রাঙ্ক। লোকটার সম্পর্কে ওকে আগে ভাগে কেন জানানো হয়নি ভেবে অসন্তুষ্টি বোধ করছে।

ঘোড়ার পিঠে ঠায় বসে আছে ও। দু'ঠোঁট সংবদ্ধ। ওর সাথে যারা আছে, তারা পজিশন নিয়ে আছে জায়গামত। প্রয়োজন হলে ডাকামাত্র বেরিয়ে আসবে।

গরমে ঘামছে ফ্রাঙ্ক। দু'হাতের পিঠেও ঘাম জমতে দেখল। শক্তপোক্ত হাতের দশ আঙুল রোদে পোড়া, তামাটে।

ব্যাপারটা নিয়ে খুব বেশি ভাবা হয়ে যাচ্ছে কি না ভাবছে সে। জানে চলার পথ মসৃণ হলেও, মাঝে মধ্যে হোঁচট খাওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায় না। তবে সেটা কোনও বড় ব্যাপার নয়। ওরকম কিছুর জন্যে মনে মনে তৈরি থাকলে তা উপেক্ষা করা যায়। এইটুকু বয়সে ওকে অনেক বড় বড় বিপদ কিংবা চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে। বুদ্ধি খাটিয়ে বাঁচতেও হয়েছে সেগুলো থেকে। সুতরাং অনেক বড় বড় বিপদ-আপদ যাকে মোকাবিলা করতে হয়, তার এরকম ছোটখাট সমস্যা নিয়ে

BanglaBoi.org

মাথা না-ঘামালেও চলে। অন্তত তা নিয়ে উতলা হওয়া সাজে না।

তবে একটা জিনিস সে বুঝতে পারে যে, ওর মধ্যে ইদানীং কিছু একটা ঘটে গেছে। একটা অস্থির সময় কাটাচ্ছে সে, সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে দেয়ার তাগিদ বোধ করছে। চার্লসটনে বো ব্রীনসহ একটা ধর্মসভায় যোগ দেয়ার পর তাগিদটা বেশ জোরেশোরেই টের পাচ্ছে। কাজে-কর্মে উদাসীনতা বেশ প্রকটভাবে জানান দিচ্ছে ভেতর থেকে।

অস্থির ভাবটুকু গোপন রাখতে পারছে না ফ্রাঙ্ক। ব্রীনের তীক্ষ্ণ চোখে তা ধরা পড়ছে নিশ্চয়। ধর্মসভায় যোগ দেয়ার দিনকয়েক পরেই ব্রীন ওর কাছে জানতে চেয়েছে পাদ্রীর বক্তব্যের প্রভাবে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে সেও পাদ্রী হয়ে যাওয়ার কথা ভাবছে কিনা।

ঠিক অতটা না-হলেও ফ্রাঙ্ক কেন যেন ইদানীং একটা নিরিবিলি জীবনের কথা ভাবছে। একটা সৎ গৃহস্থ জীবন। নিজের একটা আউটফিট, দিনভর হাড়ভাঙা খাটুনি আর রাতভর নাক ডাকিয়ে ঘুম। একটা মনের মত বউ হলে ব্যাপারটা আরও চমৎকার। আর উত্তেজনা চাইলে মাঝে মধ্যে পাসিদলের সঙ্গে ডাকাত তাড়ানোর কাজে বেরিয়ে পড়া যায়।

আউটল জীবনের মধ্যে আলাদা একটা মোহ আছে। সেটা স্বীকার করে ফ্রাঙ্ক। কিন্তু এখন আউটলদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। রাশান বিল আর ব্ল্যাক জ্যাক কেচামের কথাই ধরা যাক। সুদর্শন বিলকে ওরা ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে, আর কেচাম পালিয়ে বেঁচেছে। সবচে' দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে তল্লাট ছেড়ে ভেগেছে লোকটা। অন্যদের অবস্থাও তথৈবচ। ফ্রাঙ্ক এসব দেখে শুনে এখন মোহমুক্ত। তবে বড় একটা দাঁও মারার আশায় টিকে রয়েছে এখনও। তেমন হলে হয়তো এটাই তার শেষ কাজ, শেষ ট্রেন ডাকাতি।

'বেঁচে থাকার জন্যে যারা অস্ত্রের ওপর নির্ভর করে, তাদের

বিনাশও সে-অস্ত্রের মাধ্যমেই।'

একজন পাদ্রীর এই মন্তব্যটা মনের ভেতর গেঁথে গেছে ফ্রাঙ্কের। চারদিকের হাল-অবস্থা দেখেই সম্ভবত বুড়ো পাদ্রী এমন মন্তব্য করেছিল। ফ্রাঙ্কের পরিচিত অনেকেই এভাবে মারা গেছে। গতকালসহ গত দশ দিনে তিনজন গরুচোরকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে বউয়িতে। একজন ব্যাংকডাকাতও মারা গেছে এভাবে। এ-অঞ্চলে এখন আইনের প্রয়োগ শুরু হয়ে গেছে। ভিন্ন ধরনের একদল লোক এসে বসতি স্থাপন করেছে। ওরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। চাষাবাদ করে নিজেদের জীবিকা চালায়; আগের লোকদের মত হৈ-হট্টগোল কিংবা ঝামেলা সহ্য করে না।

এগিয়ে আসতে থাকা স্টেজটার দিকে চাইল আবার ফ্রাঙ্ক। ভুরু কুঁচকাল। একটু পরে যে-ঘটনাটা ঘটতে যাচ্ছে, সেটা ভাবতে খারাপ লাগছে। তবে ভ্রূকুটি করেও মনের মেঘ কাটল না ওর। ভয় করছে। কিন্তু কাজটা করতে এসে অপছন্দ কিংবা ভয় করে লাভ কী? এর চেয়ে আরও অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করেছে সে। আজকের কাজটা সেসবের তুলনায় অনেক সহজ। এরকম একটা নির্ঝঞ্ঝাট কাজের জন্যে যে কেউ মাইলকে মাইল পাড়ি দিতে পারে।

স্টেজ বক্সে ঢুলছে বুড়ো পারকিন্স। স্টেজের পেছনে দিগন্তের শেষ পর্যন্ত উড়ন্ত ধুলোর গন্ধ কিংবা চিহ্নও পাওয়া যাচ্ছে না।

একটা জিনিস জানে ফ্রাঙ্ক। চুরি-ডাকাতি যা-ই করা হোক, মানুষ সেটা বেশিদিন মনে রাখতে পারে না–এক সময় ভুলে যায় কিংবা অতটা তীব্রভাবে মনে থাকে না। কিন্তু তা করতে গিয়ে মানুষ খুন করার ব্যাপারটা কেউ সহজে মেনে নিতে পারে না। ওটা মনে থেকে যায়–এবং বহু বছর বাদেও বিশেষ কোনও ক্ষেত্রে কারও না কারও মনে পড়ে যায়। সুতরাং ডাকাতি করতে গিয়ে এ-পর্যন্ত কখনও কাউকে খুন করেনি ফ্রাঙ্ক। এ-ব্যাপারটা

একনিষ্ঠভাবে মেনে চলে সে।

ওর লোকেরাও সেটা জানে এবং যৌক্তিক বলেই মানে। তারা সব ধরনের বেআইনি কাজ করে, কিন্তু কখনও মানুষ খুন করার মত বোকামি করতে যায় না। ব্যাপারটা ফ্রাঙ্কের কাছে একটা অলিখিত আইনের মত; সে নিজে তা মেনে চলে এবং যে-দলটার ভার তার ওপর ন্যস্ত, তাদেরও মেনে চলার পরামর্শ দেয়। সব সময় স্মরণ করিয়ে দেয় যে, নিজের জীবন বাঁচানোর জন্যে হলেও, যতক্ষণ সম্ভব কারও দিকে গুলি না-চালিয়ে থাকতে পারাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

ওর দলে বেশ ক'জন দুর্ধর্ষ লোক আছে। পিস্তলে সবারই চালু হাত। কিন্তু ওর কথা অমান্য করার সাহস হয় না কারও। ফ্রাঙ্ক যে ওদের চেয়ে চালু, সেটা ওরা বোঝে। ফ্রাঙ্ক দক্ষ মার্কসম্যান, পঞ্চাশ ফুট দূর থেকেও একটা হরতনের টেক্কার ঠিক মাঝখানটায় ফুটো করে দিতে পারে।

কিন্তু ওই ধর্মযাজক ওকে বলেছিল, সব সময় প্রথমবার বলে একটা কথা আছে। সব সময় কারও কপাল খারাপ বা ভাল যায় না।

ওরা এ-পর্যন্ত কাউকে খুন করেনি। ওদের চালচলন রুক্ষ, আচরণ অমার্জিত। শান্ত, সুশীল নাগরিক যে ওরা নয়, সেটা দেখলেই বোঝা যায়। যে কেউই সন্দেহ করতে পারে ওদের কাজকর্ম নিয়ে। তবে সন্দেহ করা এক জিনিস আর প্রমাণ করা আরেক জিনিস। তাই হঠাৎ কেউ ওদের ঘাটানোর কথা চিন্তা করে না। ওরা যখন যেখানে খুশি যেতে পারে, কেউ তাদের চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

কোচটা আরও কাছে চলে এসেছে। আর বড় জোর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে রিজের পাশে চলে আসবে। ওর সঙ্গীরা লুকিয়ে আছে জঙ্গল এবং পাথরের আড়ালে। ওর কাছ থেকে সঙ্কেত

পাওয়ামাত্র অ্যাকশনে নেমে পড়বে। নিঃশব্দে দক্ষতার সাথে কাজ সেরে হাওয়া হয়ে যাবে সবাই। পুরো ব্যাপারটা খুব হিসেব করে ছককাটা। এসব কাজে ফ্রাঙ্ক এবং তার সঙ্গীরা এতই অভ্যস্ত যে, মনে হয় মিনিট দুয়েকের বেশি লাগবে না ওদের। ঠিক কী ঘটেছে, আক্রান্তরা ভাল করে বুঝে ওঠার আগেই পগার পার হয়ে যাবে।

কাজটা উত্তেজনার, প্রতিবারই তা করতে গিয়ে এই উত্তেজনা উপভোগ করে ফ্রাঙ্ক। কিন্তু আজ এই স্টেজটাকে থামার জন্যে সিগন্যাল দেয়ার কথা ভাবতে ওর খারাপ লাগছে। আরও কম বয়সে এক সময় মাসখানেক খনিশ্রমিকের কাজ করেছিল ফ্রাঙ্ক। জীবিকা নির্বাহের জন্যে ওই কাজ করলেও পেশাটাকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করত। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কাজে যাবার সময় ওর যেরকম বিতৃষ্ণা বোধ হতো, আজ এই কাজটা করতে গিয়েও একই রকম লাগছে।

শক্তমুখে স্টেজকোচটার দিকে তাকাল ফ্রাঙ্ক। চড়াই বেয়ে উঠছে। ভারী কোচ টেনে তুলতে গিয়ে জান বেরিয়ে যাচ্ছে ঘোড়াগুলোর। মাথা নিচু করে নাগাড়ে এগোচ্ছে। গতি একটু ঢিলে হলেই চাবুকের বাড়ি খাচ্ছে। ওয়্যাগনের পেছনে ধুলো উড়ছে মোটা চাদরের মত। সূর্য আরও নীচে নেমে এসেছে। হলুদ আলো ঝিকিয়ে উঠছে ড্রাইভারের পাশে বসা নতুন গার্ডের কোলের ওপর রাখা গ্রীনারের ইস্পাতের ব্যারেলে প্রতিফলিত হয়ে। ঘোড়াগুলোর গায়ে জড়ানো শেকলের টুং টাং আর নালবাঁধানো খুরে লেগে আলগা পাথরের টুকরো ছিটকে যাওয়ার ভোঁতা শব্দ কানে আসছে ওর; একই সঙ্গে লোহায় বাঁধানো চাকার ঘর্ঘরও।

এটাই তার শেষ কাজ। এরপর নিজেকে গুটিয়ে নেবে। বাকি জীবনটা অন্যভাবে কাটাবে। সেদিন ধর্মসভায় যোগ দেয়ার পর

থেকে ওর মধ্যে যে-পরিবর্তন এসেছে, এ-সিদ্ধান্ত তারই প্রত্যক্ষ ফল। ঈশ্বরের কাছে সে নিজেকে পাল্টে ফেলবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। এরপর থেকে একজন সৎ ও পরিশ্রমী মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে চায় ও। নিজের জন্যে একটা র‍্যাঞ্চ; শান্ত, নিরিবিলি কর্মমুখর একটি সংসার—এবং একটা চমৎকার বউ...

ডান হাতটা ওঠাল ফ্রাঙ্ক, নাড়ল। ওর নিজের লোকদের প্রতি এটা একটা সঙ্কেত। এর মানে কী, সেটা আগে বলা আছে ওদের।

# দুই

শক্ত চৌকো চোয়াল আর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ফ্রাঙ্কের। এটা ওর চেহারার আলাদা বৈশিষ্ট্য, একবার দেখলে সহজে ভোলা যায় না। ওর অবিচল দু'চোখে সারাক্ষণ শ্বাপদের সতর্কতা।

কিন্তু মানুষ খুনের ব্যাপারে ওর প্রচণ্ড অনীহা—রীতিমত ঘৃণাই বলা যায়। এমনকী কেউ ওকে খুন করতে এলেও সে চেষ্টা করে প্রতিপক্ষকে খুন না-করে ব্যাপারটা সামাল দিতে। এরকম কিছু ঘটনা আছে ওর। বিশেষ করে অ্যারন ফ্লিপসের ঘটনাটা অনেকেই স্মরণ করে এখনও। স্টোন'স পাসে লোকটা সে-চেষ্টা করতে গিয়েছিল। ফ্রাঙ্ক তার দুটো পা-ই ভেঙে দিয়েছিল। মারের চোটে কাঁধের হাড় নড়ে গিয়েছিল ফ্লিপসের, চার-পাঁচটা দাঁত পড়ে গিয়েছিল। এই দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য যাদের হয়েছিল, তারা জানে, ফ্রাঙ্ক সেলজার ভয়ঙ্কর লোক, কাউকে প্রাণে মারে না—কিন্তু

হাতে মেরে অবস্থা তার চেয়ে খারাপ করে দেয়।

স্টেজ ড্রাইভার পারকিন্সকে পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এখন ফ্রাঙ্ক। থুতু ফেলল পারকিন্স। ওর পাশে বসা নতুন গার্ডেরও প্রায় সবটুকুই দেখা যাচ্ছে। লোকটাকে জরিপ করার চেষ্টা করছে ফ্রাঙ্ক। জানে, ব্যাপারটা সহজ নয়। একটা লোককে বুঝতে গেলে যদি ওর হাতে একটা শটগান দেখা যায়, তা হলে মনোযোগের বেশির ভাগই কেড়ে নেবে ওটাই।

গড়পড়তা উচ্চতা লোকটার। মাঝারি সাইজের মুখে চওড়া নাক আর নীচে পুরুষ্টু বেমানান গোঁফ। তামাকের ছোপ লেগে কটা রঙ ধরেছে। গোঁফজোড়া ওঠানামা করছে লোকটার। স্টেজ ড্রাইভারের সাথে কথা বলছে সম্ভবত। লোকটাকে দেখে তেমন উদ্বেগ বোধ করছে না ফ্রাঙ্ক। মনে হয় না, ওই লোক খুব বেশি ঝামেলা পাকাতে পারবে।

বাকস্কিনের পিঠে বসে তীক্ষ্ণ চোখে কোচটা দেখল ফ্রাঙ্ক। যে দু'জনকে দেখা যাচ্ছে তারা ছাড়া ভেতরে আর কী পরিমাণ লোক আছে, সেটা জানে না ও। একজনও হতে পারে, আবার চল্লিশ জনও থাকতে পারে। সেটা নিয়ে অবশ্য ও খুব একটা চিন্তিত নয়। মনে হচ্ছে, অনায়াসে খুব বড় একটা দাঁও মারার সুযোগ পেতে যাচ্ছে ও। আরেকবার সব কিছুর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে মুখে বাঁধা রুমালটা আরেকটু টেনে দিল সে নাকের ওপর।

ওর কাছ থেকে চল্লিশ গজ দূরত্বের মধ্যে এসে পড়েছে স্টেজকোচ। স্ক্যাবার্ড থেকে উইনচেস্টারটা বের করল ফ্রাঙ্ক। ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

স্টেজ ড্রাইভার ম্যাট পারকিন্স ওকে প্রথমে দেখল। বিনা বাক্যব্যয়ে কোচ থামিয়ে ফেলল।

গার্ডের চোখে পড়েছে সূর্যের আলো। প্রথমটায় ঠিক কী ঘটেছে, ঠাহর করে উঠতে পারল না। ড্রাইভার ব্রেক কষতে

অবাক হয়ে বলল, 'কী ব্যাপার? অমন হুট করে...'

'উঠে দাঁড়াও,' ওর কথা শেষ না-হতেই কর্কশ স্বরে হুকুম দিল ফ্রাঙ্ক। 'অস্ত্রের দিকে যেন কারও হাত না-যায়।'

গার্ডের চেহারা দেখে হাসি পেল ওর। হতভম্ব হয়ে পড়েছে বেচারা, চোয়াল ঝুলে পড়েছে। রাস্তায় হঠাৎ যমদূতের মত এসে পড়া লোকটার হুকুমে উঠে দাঁড়াবে কিনা সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে কয়েক সেকেণ্ড দেরি করে ফেলল। দ্বিতীয়বার আর মুখে আদেশ করল না অস্ত্রধারী, ওর হাতের উইনচেস্টার গর্জে উঠল। গার্ড যেখানে বসেছে, সেখানে গিয়ে বিঁধল গুলি। লাফ দিয়ে উঠল গার্ড প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে। হাতদুটো মাথার ওপর উঠে গেল।

'বেশ।' সন্তুষ্ট দেখাল ফ্রাঙ্ককে। 'এবার অস্ত্রটা লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দাও। নীচে ফেলে দাও একদম।'

হঠাৎ যেন নিজের কর্তব্যের কথা মনে পড়ে গেল গার্ডের। অস্ত্রটা লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দেয়ার কথা বলতেই গোয়ার্তুমির ভাব ফুটল চেহারায়। ওর হাবভাব দেখে আতঙ্কে গুঙিয়ে উঠল স্টেজ ড্রাইভার। 'নিজের বিপদ বুঝতে চেষ্টা করো, ভাই। অনর্থক বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে জানটা খুইয়ে বোসো না। তুমি কোনও সুযোগই পাবে না উদ্যত রাইফেলের সামনে।'

গার্ডের চোখে আগুনের ঝিলিক। একটু থামল ও। তারপর ড্রাইভারের কথার সত্যতা বুঝতে পেরে লাথি মেরে গ্রীনারটা সরিয়ে দিল দূরে।

গার্ড বা ড্রাইভার–কারও কোমরে গানবেল্ট নেই, দেখতে পেল ফ্রাঙ্ক।

মুখোশের আড়ালে দর দর ঘামছে ও। অস্বস্তি বোধ করছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটা শেষ করার তাগিদ বোধ করছে। 'তোমাদের সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা নেই,' ড্রাইভারকে বলল। 'কোচের ভেতর আরও অস্ত্র আছে। তোমরা যদি মরতে চাও,

আমার আপত্তি নেই। ওগুলো ব্যবহার করার কথা চিন্তা করতে পার।'

'আমার দিক থেকে নিশ্চিন্ত থাকতে পার,' গোমড়া মুখে বলল ড্রাইভার। 'বাহাদুরি দেখানোর কোনও ইচ্ছে আমার নেই।'

'তুমি অভিজ্ঞ লোক, ভাই,' মৃদু স্বরে বলল ফ্রাঙ্ক। 'বিপদটা ঠিকই বুঝতে পার। কিন্তু তোমার ওই গুঁফো বন্ধু, কী যেন নাম ওর? ম্যাক্সওয়েল? বেশ! যা-ই হোক, ওকে বলো, স্ট্রং বক্সটা তোমার সঙ্গে ধরাধরি করে কোচ থেকে নামিয়ে আনতে। বাহ্, বাহ্! এই তো!' স্ট্রং বক্সটা মাটিতে নামিয়ে রাখতে উৎসাহ দিল ও। 'এবার এ-পাশ দিয়ে যাত্রীরা নেমে আসুক। সবাই ওই পাথরটার কাছে গিয়ে লাইন ধরে দাঁড়াবে। ঠিক আছে? বেশ, তা হলে এবার শুরু করো।'

যাত্রীদের মধ্যে প্রথমে যে নেমে এল, সে একজন ড্রামার। মোটাসোটা গাবদা-গোবদা লোকটা। বয়স চল্লিশের ওপর। পরনে সাদা-কালো চেকের আঁটসাঁট প্যান্ট, দেখলে মনে হয়, গা ভর্তি থলথলে মাংসের চাপে যে কোনও মুহূর্তে ফট করে ছিঁড়ে যাবে। একই রঙের কোটটা ঝুলছে বাহু থেকে। অতি ধীরে, সাবধানে কোচ থেকে নীচে পা রাখার সময় ওর মুখের চর্বির কাঁপন দেখে ফ্রাঙ্কের মনে হলো, প্লেট থেকে উপচে পড়তে চাইছে যেন এক তাল মাখন।

নামল লোকটা, মুখ এখনও ভেতর দিকে ফেরানো। ওদিকে তাকাল ফ্রাঙ্ক তীক্ষ্ণ চোখে। পর মুহূর্তে নরম হয়ে উঠল দৃষ্টি। নামবে কি নামবে না—এভাবে ইতস্তত করতে করতে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে একটা মেয়ে। ভদ্রমহিলা।

সময় এবং জায়গার বিচারে মেয়েটা এখানে অপ্রত্যাশিত, ভাবল ফ্রাঙ্ক। ওর চালচলন, হাবভাব, তাকানোর ভঙ্গি, মুখের গঠন—সব কিছু মিলিয়ে দেখলে শ্রদ্ধা জাগানোর মত। সব

কিছুতেই কেমন একটা আভিজাত্যের আভাস। একই সাথে ভালবাসা এবং কামনা জাগানিয়া।

লাল রঙের একটা দামি কোট মেয়েটার গায়ে। পুবের কোনও শহরের অভিজাত দর্জির হাতে তৈরি। চঞ্চল চোখে তাকাচ্ছে মেয়েটি, দৃষ্টি কোথাও স্থির থাকছে না। ফ্রাঙ্কের চোখে চোখ পড়তে স্থির হয়ে গেল। নীল চোখে কিছুটা ভয়ের ছাপ। তবে ভয়ের সাথে সাথে চ্যালেঞ্জের ভাবটুকুও নজর এড়াল না ফ্রাঙ্কের। সে-দৃষ্টিকে নাকচ করে দিতে পারল না ফ্রাঙ্ক। আসলে গভীর নীল চোখ, কালো চকচকে চুল আর লাল কোট–তিনে মিলে রঙের বৈচিত্র্যে অনন্য দেখাচ্ছে মেয়েটাকে।

'এসো, ম্যাম,' বিনীত গম্ভীর স্বরে ডাকল ড্রামার। তারপর হাঁ করে হাঁফাতে হাঁফাতে মেয়েটাকে পাথরের ছায়ায় নিয়ে চলল। মেয়েটার ডান হাতে একটা রোদনিবারক ছাতা। বন্ধ। সূর্য দিগন্তের কাছাকাছি চলে যাওয়ায় রোদের তেমন জোর নেই বলে ওটা ব্যবহারের দরকার পড়ছে না।

ধীর পায়ে এগোচ্ছে মেয়েটা। পেছন থেকে চেয়ে রইল ফ্রাঙ্ক। মেয়েটার হাঁটার মধ্যে একটা ধীর, সাবলীল ছন্দ টের পাচ্ছে। গ্লাভসপরা বাম হাতে স্কার্টের ঝুল উঁচিয়ে ধরেছে মেয়েটি।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে ফ্রাঙ্ক। চোখ ফেরাতে পারছে না। কেমন নেশার মত লাগছে। মেয়েটার হাঁটার ভঙ্গি আর সেই সাথে শরীরের নড়াচড়া আবিষ্ট করে ফেলছে ওকে। এখানে সে কেন এসেছে, স্টেজকোচটা কেন থামিয়েছে, তাও যেন ভুলে গেল ক্ষণকালের জন্যে।

সচকিত হয়ে চোখ ফেরাল ও ড্রাইভার আর গার্ডের দিকে। লোকগুলো দাঁড়িয়ে আছে অনড়, মাথার ওপর দু'হাত তুলে। ফের মেয়েটার দিকে চোখ ফেরাল। তারপর ড্রামারকে বলল, 'কোমর

থেকে ওয়ালেটটা খুলে এদিকে ছুঁড়ে দাও। পা থেকে জুতোগুলোও।'

রাগে মুখ লাল হয়ে উঠল লোকটার। কিন্তু তাতে কাজ হবে না বুঝতে পেরে ওয়ালেটটা খুলে ছুঁড়ে দিল। তারপর পাথরের ওপর বসে পা থেকে জুতোজোড়াও খুলে ফেলল।

মেয়েটার বয়স ষোলো, ভাবল ফ্রাঙ্ক, বড় জোর আঠারো, তার বেশি হবে না। চোখে চোখ পড়তে মেয়েটার ভীত সন্ত্রস্ত ভাব টের পেল। তবে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার মত মুখের ভাব লুকোবার চেষ্টা করছে সে। মেয়েটাকে আশ্বস্ত করার জন্যে কিছু একটা বলতে চাইল ফ্রাঙ্ক। তবে কী বলবে তা ঠিক করার আগে মেয়েটি বলল, 'আমার কাছে দামি বলতে কেবল এই ব্রুচটাই আছে। তাও আমার মায়ের...'

বিড় বিড় করে গাল বকল ফ্রাঙ্ক, তারপর বলল, 'মহিলা এবং শিশুদের জিনিস লুট করার প্রবৃত্তি আমার নেই, ম্যাম। অতটা ছোট এখনও হইনি।'

ম্লান হেসে ওকে ধন্যবাদ জানাল মেয়েটি।

ড্রামারের দিকে চেয়ে ভুরু কুঁচকাল ফ্রাঙ্ক। 'জুতোজোড়া এদিকে নিয়ে এসে ওয়ালেটের পাশে রাখো। ...হ্যাঁ, ঠিক আছে। এবার যাও, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলে, সেখানে গিয়ে দাঁড়াও। হাতদুটো পেছনে থাকে যেন।'

মেয়েটির দিকে চাইল ফের। 'ম্যাম, মনে হয় অনেকদূর থেকে এসেছ। যেখানে যেতে চাও, তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর জন্যে অস্থির হয়ে আছ নিশ্চয়। ধরে নিচ্ছি, স্টেজের ভাড়া অগ্রিম দেয়া আছে, তবে খাওয়ার জন্যে...'

'ধ্যাৎ!' ছোটলোক ডাকাতটার অজ্ঞতা দেখে বিরক্তি সামলাতে পারল না ড্রামার। 'কাকে কী বলছ তুমি? উনি শিক্ষিত মহিলা, নিজের নাম লিখতে পারেন। আর টাকা যা আছে, চাইলে

এই দেশটার অর্ধেক কিনে ফেলতে পারবেন...'

'তাই নাকি?' অবাক হলো ফ্রাঙ্ক। 'তা হলে তো খুব ভাল কথা। তোমার কাছে কাগজ-পেন্সিল আছে?'

লোকটার রাগে লাল মুখ এবার ফ্যাকাসে হয়ে গেল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, বেফাঁস কথা বলে এখন পস্তাচ্ছে মনে মনে। প্রথমটায় 'নেই' বলার কথা ভাবল, পর মুহূর্তে নীল ব্যানডানার ওপরে ঠাণ্ডা চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত পাল্টাল। তাড়াতাড়ি কোটের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে অর্ডার বুকটা বের করে আনল ও। একটা পাতা ছিঁড়ে এগিয়ে দিল ওটা ফ্রাঙ্কের দিকে। তারপর পেন্সিলটাও বের করল।

'তুমি বলেছ, ভদ্রমহিলা লিখতে পারে। ওটা ওকে দাও, পেন্সিলটাও।'

ভীত কিন্তু সতর্ক চোখে ফ্রাঙ্কের দিকে চাইল মেয়েটি। 'কী করতে বলো তুমি আমাকে?'

'তেমন কিছু না। শুধু এই কাগজে তোমার নাম লিখবে।'

প্রস্তাবটা পছন্দ হলো না মেয়েটার। স্থির চোখে চেয়ে বলল, 'যদি না-লিখি?'

'আমরা এখানে মজা করতে আসিনি, মিজ!' রূঢ় স্বরে বলল ফ্রাঙ্ক। 'আমি তোমাকে তোমার নাম লিখতে বলেছি। আমার বিশ্বাস, তুমি লিখবে। আগ্রহের সাথেই লিখবে।'

চোখ নামাল না মেয়েটি, তাকিয়েই রইল। ভয়ের বদলে এখন সুস্পষ্ট রাগ তাতে।

তবে শীঘ্রই বুঝতে পারল, অস্ত্রধারী লোকটাকে চোখ রাঙিয়ে লাভ হবে না। অগত্যা চোখ নামাল। ড্রামারের হাত থেকে প্রায় ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিল কাগজ আর পেন্সিল।

হাত থেকে ছাতাটা একপাশে নামিয়ে রেখেছে মেয়েটা। ওর দিকে চেয়ে আছে ফ্রাঙ্ক এক দৃষ্টিতে। মেয়েটার দৈহিক সৌন্দর্য

অসাধারণ। স্বাভাবিকভাবেই প্রথম দেখায় মুগ্ধতায় আবিষ্ট হয়েছিল সে। তখন আরও কিছু বৈশিষ্ট্য চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। এখন সেগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। শুধু সুন্দরই নয়, মেয়েটা যথেষ্ট তেজীও। ওর মুখে ফুটে উঠেছে প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার আর কর্তৃত্বভাব। এর আগেও অনেক মেয়ে দেখেছে ফ্রাঙ্ক। কিন্তু কেউই এভাবে দাগ কাটতে পারেনি ওর মনে। এই মেয়েকে দেখেই অভূতপূর্ব এক আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে, ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে জীবনটাকে অন্যভাবে দেখতে।

গত কয়েক বছর ধরে ওর জীবন কাটছে এক অন্ধকার পথে, কানা গলিতে। তবে অভিজ্ঞতাও অবশ্য কম হয়নি তাতে। স্পষ্ট পার্থক্য করতে শিখেছে ভাল এবং মন্দের। যা সুন্দর, তা চেনার সহজাত ক্ষমতা আছে ওর। চারপাশে নষ্ট মানুষদের সাথে বছরের পর বছর কাটিয়ে এলেও ওরা ওকে পুরোপুরি নষ্ট করে ফেলতে পারেনি। কিছু ধার্মিক এবং সৎ মানুষের সাহচর্যে বড় হয়েছে সে। তাদের প্রভাব রয়ে গেছে ওর মনে। ও খারাপ মানুষদের সঙ্গে কাটিয়েছে, অন্যায় ও পাপে লিপ্ত হয়েছে, তবে তার মধ্যেও দু'চোখ খোলা রেখেছে। ফলে ওর ভেতরের শুভবোধ একেবারে বিনষ্ট হয়নি।

যে-পথে চলেছে, তার মধ্যে যে ঝুঁকি ও দণ্ড আছে, ভাল করেই জানে সে। পরিচিত খারাপ মানুষদের পরিণতি থেকে বুঝে নিয়েছে, খারাপ কাজের শাস্তি একদিন পেতে হয়। জেমস ভাইদের ব্যাংক লুট, ব্ল্যাক কেচামের ট্রেনডাকাতি কিংবা ডালটনদের সিন্দুক ভাঙা, নিঃসন্দেহে খারাপ কাজ–কিন্তু তারচে' খারাপ হলো মানুষ খুন করা। ডাকাতি করতে গিয়ে মানুষ খুন করে শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পেরেছে, এমন নজির খুব কমই আছে। মানুষ তখন আর ডাকাতিটাকে বড় করে দেখে না–খুনটাকেই মনে-প্রাণে ঘৃণা করে আর খুনিকে শাস্তি দিতে

মরিয়া হয়ে ওঠে।

ফ্রাঙ্ক সেলজারের ব্যাকট্রেইলে অনেক দুষ্কৃতির চিহ্ন থাকতে পারে, কিন্তু রক্তের দাগ নেই। কাউকে খুন করেনি সে এ পর্যন্ত, সামনেও খুন করার কোনও ইচ্ছে নেই।

এই কাজটাকেই শেষ কাজ বলে ভাবছে ও। এরপর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে। একজন সুশীল নাগরিক হিসেবে বাস করবে নিজের মত করে। কারও সাতে-পাঁচে যাবে না। ওর সামনে উদাহরণ হিসেবে আছে বার্ট আলভোর্ড। এক সময়ের নামকরা আউটল আলভোর্ডের অতীত নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না কেউ আর এখন–ওর অতীত নিয়েও যে ঘামাবে, এমন ভাবার কোনও কারণ দেখছে না ফ্রাঙ্ক। তীক্ষ্ণ চোখে মেয়েটাকে দেখছে ও, ওর প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি লক্ষ্য করছে। খেয়াল করছে মুখের সূক্ষ্মতম ভাববদলটুকুও। কাগজে পেন্সিলের আঁচড় কাটতে গিয়ে বারবার থেমে যাচ্ছে মেয়েটা, গ্লাভসপরা হাতে বেঢপভাবে ধরে আছে পেন্সিলের গোড়া।

সরু চোখে তাকাল ফ্রাঙ্ক, মেয়েটার চালাকি বোঝার চেষ্টা করছে। 'গ্লাভস খুলে ফেলো, ম্যাম। হাতের লেখা ভাল হবে না। শেষে নিজেই ধন্দে পড়ে যাব। কার লেখা বুঝতে পারব না।'

চোখ তুলল মেয়েটি ওর দিকে। মনে হলো ওর কথায় পাত্তা দেবে না। পর মুহূর্তে যেন তারচে' ভাল কিছু মনে পড়েছে, এমনভাবে কাঁধ ঝাঁকাল।

মেয়েটির বাম হাত খালি। আচমকা অভূতপূর্ব এক আনন্দে মন ভরে গেল ফ্রাঙ্কের। মনে হলো যেরকম একটা মেয়েকে সে খুঁজছে এতদিন মনে মনে, সে-মেয়ে হয়তো এ-ই। মেয়েটা সম্ভবত এখনও অবিবাহিত।

অবাক হলো ও। মেয়েটা যেখান থেকে এসেছে, সেখানকার লোকগুলো অন্ধ নাকি? তা না-হলে এই মেয়ে এতদিন ধরে

অবিবাহিত থাকে কী করে? ওর শরীরের প্রতিটি বাঁক-উপবাঁক যেটা যেখানে হওয়ার কথা, সেখানেই সুষমভাবে সন্নিবেশিত। ওর চকচকে কালো চুল, ঝকঝকে সাদা দাঁত, টকটকে লাল পুষ্ট দু'ঠোঁট। ও যুবতী, স্বাস্থ্যবান। ঘর বাঁধার জন্যে একজন সক্ষম পুরুষের এরকম মেয়েই তো চাই।

একটা পরিবার গড়ে তুলতে একজন পুরুষের জন্যে এরকম নারী দরকার। আর এ-মেয়ে শুধু একজন নারীই নয়, মনে হয় তার চেয়ে বেশি কিছু।

একজন স্বাভাবিক পুরুষ হিসেবে মহিলাদের প্রতি সহজাত আকর্ষণ রয়েছে ফ্রাঙ্কের। সাধারণত সোনালি কিংবা লাল চুলের মেয়ে ওর পছন্দ। তবে সেটাই চূড়ান্ত নয়। ওর আরও কিছু চাই। তাই লাল বা সোনালি চুলের কোনও মেয়ে দেখে দৃষ্টি আকৃষ্ট হলেও শেষ পর্যন্ত বেশিদূর এগোনো হয়নি। এই মেয়েটির চুল কালো, প্রথমেই ওকে নাকচ করে দেয়ার কথা ফ্রাঙ্কের। কিন্তু কালো চুলের এই মেয়ের মধ্যে সে এমন কিছু লক্ষ করল, যা সোনালি চুলের কোনও মেয়ের মধ্যে এ পর্যন্ত পায়নি। মেয়েটির হাতে বিয়ের স্মারক কিছু না-দেখে দারুণ খুশি ও। বিয়ে হয়ে গেলে যত কাঙ্ক্ষিত গুণের অধিকারীই হোক, মেয়েটির দিকে চোখ তুলেও চাইত না ও।

মেয়েটা বিবাহিত কিনা–এটা জানতেই ব্যস্ত ছিল ফ্রাঙ্ক, অন্য দিকে তেমন মনোযোগ ছিল না। কিন্তু মেয়েটির ডান হাতের আঙুলে আচমকা অস্তগামী সূর্যের সোনালি আলোয় কিছু একটা ঝিকিয়ে উঠতেই ওদিকে তাকাল। মধ্যমায় একটা পাথর বসানো আঙটি। নীলকান্ত মণি। গরুর চোখের মত বড় পাথরটা। চিন্তার ছায়া ঘনাল ফ্রাঙ্কের চোখে।

ওর দিকে চোখ তুলল মেয়েটি, নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল। 'কত?'

'স্রেফ তোমার নামটা লিখে দাও। বাকিটা আমি দেখব।'

ফ্রাঙ্ক আসলে ওর নামটাই জানতে চাইছে। তা হলে পরে মেয়েটাকে খুঁজে বের করা সম্ভব হবে। নাম জানা থাকলে অন্য ব্যাপারগুলো নিয়েও খোঁজ খবর করা যাবে। ওর মনে হচ্ছে, মেয়েটা ওকে ধোঁকা দিতে চাইছে। তা-ই যদি হয়, তা হলে মেয়েটাকে একটু দুশ্চিন্তার মধ্যে রাখা দরকার।

এমনিতে অবশ্য ওকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হচ্ছে। বারবার ঠোঁট কামড়াচ্ছে। বারবার এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। তবে শেষ পর্যন্ত তা ফিরে আসছে ওর ইস্পাতনীল চোখের দিকে।

মেয়েটা নিজের নাম লিখল কাগজটায়, তারপর ফেলে দিল ওটা হাত থেকে।

'ওটা নিয়ে আসো এদিকে,' হুকুম দিল ফ্রাঙ্ক। 'সাথে ওই ওয়ালেটটাও। আর হ্যাঁ, ওই জুতোগুলো...'

রাগে ফুঁসছে মেয়েটি। নাকের পাটা ফুলে উঠছে। তবে কাজটা করল।

জুতোজোড়া খালি। ড্রামারের দিকে কঠিন চোখে চাইল ফ্রাঙ্ক। 'মোজাগুলো খোলো, মিস্টার।'

কঠিন চোখে চাইল ড্রামারও। এক মুহূর্ত দু'জোড়া চোখ পরস্পরের ওপর নিবদ্ধ রইল। অচিরে মনোবলে চিড় ধরল ড্রামারের। চোখ নামাল। পা থেকে মোজা খুলতে শুরু করল।

'জুতোর ভেতর ঢোকাও ওগুলো,' আবার আদেশ করল ফ্রাঙ্ক। 'তারপর নিয়ে আসো এদিকে।'

রাগে শুধু পাগল হতে বাকি রাখল ড্রামার। দাঁত কটমট করল, কিন্তু তাতে শেষ পর্যন্ত কাজ হবে না বুঝতে পেরে নির্দেশ পালন করল।

'এখন, ম্যাম,' মেয়েটির দিকে চাইল ফ্রাঙ্ক। 'তুমি কি দয়া করে...'

একটা সিক্সশুটারের শব্দ শোনা গেল। ড্রামারের চোখ দেখে মনে হলো, আতঙ্কে ঠিকরে বেরিয়ে আসবে ওগুলো কোটর ছেড়ে।

গাল বকে ঘুরল ফ্রাঙ্ক। স্টেজকোচের সামনের দু'চাকার মাঝখানে লুটিয়ে পড়া লোকটাকে দেখল।

লোকটা স্টেজের সাথে আসা নতুন গার্ড।

# তিন

কী ঘটেছে, বুঝতে মাত্র এক সেকেণ্ড সময় লাগল ফ্রাঙ্কের। এই বোকা পাঁঠা নতুন গার্ড বুঝতে পারেনি যে, ফ্রাঙ্ক একা আসেনি। ওর সাথে যে আরও কেউ থাকতে পারে, সেটা ওর মাথায় ঢোকেনি। ড্রামার আর মেয়েটিকে নিয়ে ফ্রাঙ্ককে যেমনি ব্যস্ত থাকতে দেখেছে, অমনি একটা সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করেছে। সম্ভবত ভেবেছে, ওটা ওর দায়িত্ব। গ্রীনারটা জাপটে ধরামাত্র গুলি খেয়েছে। যে কেউই, যত সাহসীই হোক, মোটে বুদ্ধি থাকলে এরকম কাজ করবে না।

মেজাজ বিগড়ে গেল ওর। বীরত্ব ফলাতে গিয়ে অপদার্থ গার্ড নিজের জীবনটা খুইয়েছে। তারচে' বড় কথা, নিজে মরে গিয়ে ফ্রাঙ্কের জন্যে বড় ধরনের বিপদের সূত্রপাত করে গেছে। রাগ সামলাতে কষ্ট হচ্ছে ওর। কপালের শিরা ফুলে উঠেছে। এতদিন ধরে সব ধরনের সতর্কতা, মাসের পর মাস ধরে এত সযত্ন প্রয়াস, সব যেন মাঠে মারা গেল। খরস্রোতা নদীর বুকে বালির

বাঁধের মত ভেসে গেল সব প্রচেষ্টা। শেষ পর্যন্ত খুনি হিসেবে কুখ্যাত হতে যাচ্ছে ওরা; অর্বাচীন একজন মানুষের হাত থেকে ছোঁড়া একটি গুলিতে ওর সাজানো ছক সব পাল্টে যেতে বসেছে।

এদের স্বভাবটাই এরকম। মাথামোটা গর্দভের দল সব! ঈশ্বর যে প্রত্যেকের ঘাড়ের ওপর একটি করে মাথা বসিয়ে দিয়েছেন এবং সেটার ভেতরের মগজটুকু যে কোনও কাজ করার আগে একটু খাটাতে হয়, এ-আক্কেলটুকু পর্যন্ত যেন হতভাগাদের নেই। এদের হাতে অস্ত্র মানেই যে কোনও সমস্যা সমাধানের একমাত্র হাতিয়ার।

দর দর করে ঘামছে ফ্রাঙ্ক। ইচ্ছে হচ্ছে যে-হারামজাদা গুলিটা করেছে, ওকে খুঁজে বের করে মৃত লোকটার সঙ্গী করে দিতে। কিন্তু তাতে যে কোনও লাভ নেই, তাও বুঝতে পারছে। একজন মানুষ খুন হয়েছে, এটাই হলো কথা। খুনটা যে করেছে, তাকে ধরেই শুধু ক্ষান্ত হবে না; ওর সাথের পুরো দলটাকেই ধাওয়া করবে আইন, জাহান্নামের দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছে যাবে প্রয়োজনে।

বিড় বিড় করে খিস্তি আওড়ে চিন্তাটাকে এক পাশে সরিয়ে দিল ফ্রাঙ্ক। গুলির শব্দে স্টেজের ঘোড়াগুলো চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। চিৎকার করে বুড়ো পারকিন্সকে ওগুলো সামলাতে বলল। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই জিনিসগুলো নিয়ে এবার আমার কাছে আসো।'

ভয়ে পাংশু হয়ে যাওয়া মুখ তুলে ওর দিকে চাইল মেয়েটি। জিনিসগুলো তুলে নিয়ে দম দেয়া পুতুলের মত এগোল। ওর পেছনে পেছনে থপ থপ করে পা ফেলতে ফেলতে এল ড্রামারও।

ওয়ালেট, জুতো আর মোজা নিয়ে কাছে এল মেয়েটি। বিরক্ত চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ফ্রাঙ্ক। জিনিসগুলো হাতে নিয়ে বলল, 'যাও, এবার স্টেজে গিয়ে ওঠো। দু' জনেই।'

জামার হাতায় ঘামে লাল মুখ মুছল ড্রামার। কোচের খোলা দরজার দিকে এগোল।

স্টেজটা চোখের আড়াল হয়ে গেল। ফ্রাঙ্ক বসে আছে ঘোড়ার পিঠে, একই জায়গায়। এমনভাবে, যেন ওখানে ওর শেকড় গজিয়ে গেছে।

ওর চোখ সামনে পড়ে থাকা মৃতদেহটার ওপর। ও শক্ত মনের মানুষ। তবু গার্ডের লাশ দেখে অস্বস্তি বোধ করছে। লোকটি মারা গেছে। কাজটা করার সময় ও নিজে কোনও খুনখারাবি চায়নি। তবু এখানে একটা লোক মারা গেছে এবং এ-খুনের ভাগী শেষ পর্যন্ত ওকেই হতে হবে। ও নিজে গুলি না-করলেও। আইন ওকে ছেড়ে কথা কইবে না। কারণ স্টেজটা ও-ই থামিয়েছিল লুট করার জন্যে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফ্রাঙ্ক, ভুরু কুঁচকাল। যা ঘটার তা ঘটে গেছে, এখন আর পরিবর্তন করা যাবে না।

মুখে বাঁধা কাপড়টা খুলে নিল সে, তারপর ঘোড়া থেকে নামল। উইনচেস্টারটা রাখল স্ক্যাবার্ডে। ঘোড়াটাকে ঝোপের সাথে বেঁধে এগিয়ে গেল মৃত লোকটার কাছে। রাগ লাগছে ওর লোকটার ওপর। লোকটা আনাড়ী। হঠাৎ করে বীরত্ব দেখানোর খায়েশ না-জাগলে এখনও বেঁচে থাকত গাধাটা।

লোকটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ফ্রাঙ্ক। এক পলক দেখে চিনতে চেষ্টা করল। কিন্তু আগে কখনও দেখেছে কিনা মনে করতে পারল না।

ওর জামার পকেটে হাত ঢোকাল সে। এক মুঠো খুচরো পয়সা পাওয়া গেল। কোমরের ডানদিকের পকেট থেকে বের করে আনল পেটমোটা একটা ওয়ালেট।

ওটা চোখের সামনে ধরতে মাথা ঘুরে উঠল ওর। পেটের

ভেতর ঠাণ্ডা অনুভূতি জাগল। মনে হলো, ও যেন হঠাৎ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে। আশপাশে কেউ কোথাও নেই।

ওর সঙ্গীরা ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। ওদের পায়ের শব্দ আর লতাপাতা সরিয়ে আসার খস খস আওয়াজ কানে আসছে। উঠে দাঁড়াল ও। কাছাকাছি এসে পড়া বো ব্রীনের চোখে চোখ রাখল। ওয়ালেটটা ছুঁড়ে দিল ওর দিকে ফ্রাঙ্ক।

'কী ব্যাপার?' ঘোঁৎ করে উঠল ব্রীন। ফ্রাঙ্কের মুখভাব দেখে বিস্মিত। 'কী আছে ওতে?'

'আমি জানি না।' মাথা নাড়ল ফ্রাঙ্ক। 'খুলে দেখিনি।'

'তালাটা ভাঙো দেখি, স্নেক,' পাশে দাঁড়ানো একজনকে বলল ব্রীন। 'দেখি, কী আছে ওটায়।'

হেঁটে এসে ফ্রাঙ্কের মুখোমুখি দাঁড়াল। 'তোমার কী হয়েছে আমি জানি। ওই নির্বোধ যাজক তোমার মাথা বিগড়ে দিয়েছে।'

চুপ করে রইল ফ্রাঙ্ক, জবাব দিল না। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল ব্রীনের। চোখে স্পষ্ট ঘৃণা। থুতু ফেলল ও। প্যাণ্টে হাত ঘষতে ঘষতে বলল, 'যদি আমার মতামত জানতে চাও, তা হলে বলব, এরকম হলে এ-কাজে তুমি বাতিল হয়ে যাবে।'

বিশাল শরীর ফ্রাঙ্কের। ঝাড়া ছয় ফুট লম্বা। সোজা হয়ে দাঁড়াল ও। ব্রীনের কথায় ওর হতাশা রাগে পরিণত হলো। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আগুনের মত লাল হয়ে উঠেছে ওটার শরীর। লাল আলোর ছটা এসে পড়েছে ফ্রাঙ্কের চিবুকে।

গোঁয়ারের মত চিবুক উঁচিয়ে তাকিয়ে আছে ব্রীন। ওর কোমরে পিস্তল। কার্তুজের প্যাকেট গোঁজা বেল্টে। বোঝা যাচ্ছে, একটা কিছু হেস্তনেস্ত করার জন্যে মুখিয়ে আছে ও।

একটা ঘূর্ণি বাতাসের মত এসে চারপাশের ঝোপঝাড় নাড়িয়ে দিল। সর সর শব্দ হলো ছোট ছোট ডালপালার

সঞ্চালনে। ব্রীনের গলায় বাঁধা স্কার্ফটাও নড়ে উঠল বাতাসের দোলায়।

কোমরের দু'পাশে পিস্তল ঝুলিয়েছে ও। হাঁটতে পারে নিঃশব্দে, বেড়ালের মত ক্ষিপ্র পায়ে। এক মাথা লম্বা চুল, পেকে গেছে অকালে। তাতে অবশ্য তার লাভই হয়েছে বলতে হবে। প্রথম দেখায় যে কারও কাছ থেকে প্রাজ্ঞ ও প্রবীণ হিসেবে সমীহ কাড়তে সক্ষম হয়। তবে যারা ওকে চেনে, তারা জানে, এটা ওর বাইরের খোলস মাত্র। লোকটা একাধারে নিষ্ঠুর ও প্রতারক। নিজের লাভের জন্যে করতে পারে না, এমন কাজ নেই। সঙ্কুচিত দু'চোখ থেকে সারাক্ষণ ঝিলিক মারে লোভ আর হিংসার আগুন।

ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ আর ধারাল কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল যেন দু'জনের মাঝখান দিয়ে। ফ্রাঙ্কের কাছে একটা জবাব আশা করছে ব্রীন। চুপচাপ ওর দিকে তাকিয়ে আছে ফ্রাঙ্ক। জবাব দেয়ার কোনও গরজ বোধ করছে না। তবে ব্রীনের চোখ কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ওকে হঠাৎ খুব আত্মপ্রত্যয়ী আর সাহসী মনে হলো ফ্রাঙ্কের। ওর রুক্ষ চেহারা আর কুটিল দু'চোখ দেখে কিছুদিন ধরে মনের ভেতর জেগে ওঠা সন্দেহটা এখন সত্যি মনে হচ্ছে। একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠল ওর ঠোঁটের কোণে। 'আমাদের দু'জনের চিন্তায় অনেক ফাঁক, বো,' চোখ নামাল ফ্রাঙ্ক। 'তোমার বোধ হয় মনে হচ্ছে যে, আমার এখন নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত।'

'ঠিক ধরেছ,' ঘোঁৎ করে উঠল বো ব্রীন। 'আমি তোমার চেয়ে অনেক ভাল চালাতে পারব দল।'

'বেশ, ঠিক আছে। তুমিই চালাও তা হলে।'

দু'চোখ প্রায় কপালে উঠে গেল ব্রীনের। বিস্ময় সামলাতে পারছে না। ভেবেছিল, প্রস্তাবটা শোনামাত্র খেপে লাল হয়ে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াবে ফ্রাঙ্ক। ও তাই তৈরি হয়েই ছিল।

কারণ এ-প্রস্তাব ওর হুট করে দেয়া নয়। গত দু'মাস ধরে ব্যাপারটা মনে মনে মহড়া দিয়ে এসেছে। তবে এটা ঠিক, এ-মুহূর্তে অনেকটা তাৎক্ষণিকভাবে ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

কিন্তু এর বিপরীতে প্রতিপক্ষের ঠাণ্ডা প্রতিক্রিয়া দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সে। ফ্রাঙ্ককে সে এখন যতই অপছন্দ করুক, কিন্তু কখনও কাপুরুষ মনে করে না। তাই আচমকা ওর প্রতিক্রিয়াবিহীন নিঃশব্দ আত্মসমর্পণ ওকে হতভম্ব করে দিয়েছে। ব্যাপারটা কোনওভাবেই বিশ্বাস হচ্ছে না। একই সাথে রাগ ও সন্দেহ দুটোই উঁকি দিল ওর মনে। কোনও মানুষ নিজের হাত থেকে ক্ষমতার লাগাম অত সহজে এবং শান্তভাবে এক কথায় কী করে ছেড়ে দিতে পারে, বুঝে উঠতে পারছে না। অনেক কষ্টে হাঁ হয়ে যাওয়া মুখ বন্ধ করে বলতে গেল, 'ত্-তুমি বলছ...

'এ-আউটফিট তোমার,' অনুচ্চ স্বরে বলল ফ্রাঙ্ক। 'তুমি তো মনে মনে তা-ই চাইতে, তাই না? হ্যাঁ, এখন থেকে তুমিই চালাবে এটা।'

বিস্ময়ের ধাক্কা একটু একটু করে কাটিয়ে উঠছে ব্রীন। 'তোমার আসলে কী হয়েছে, বলো তো?'

'কিছুই না। এই মাত্র বুঝতে পারলাম, দায়িত্বটা আমি আর বহন করতে পারছি না। ক্ষমতার চাপ বড় বেশি মনে হচ্ছে।'

ওর কথা বিশ্বাস করতে পারছে না ব্রীন। ব্যাপারটা ওর পছন্দও হচ্ছে না। ফ্রাঙ্ক কাঁধ ঝাঁকাল। উদাস স্বরে বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি...'

'এক মিনিট,' বাধা দিল বো ব্রীন। 'তুমি যাবে তখন, যখন আমরা যেতে বলি—এবং যদি বলি। ঠিক আছে?'

এই লোকগুলোর সঙ্গে মাসের পর মাস থেকেছে ফ্রাঙ্ক। এদের সে ভাল করেই চেনে। বো ব্রীনের পেছনে যারা দাঁড়িয়ে আছে, ওরা স্রেফ চুপচাপ নীরব সমর্থন দেবে ওকে। দল ছেড়ে

যেতে চাওয়া লোকের প্রতি কোনও সহানুভূতি নেই ওদের।

আবার কাঁধ ঝাঁকাল ও। লক্ষ করল, ওর নড়াচড়ার আভাস পাওয়ামাত্র ওদের শরীর টান টান হয়ে উঠেছে।

স্নেক ফ্রেস্টন এগিয়ে গিয়ে গার্ডের ওয়ালেটটা নিয়ে ওটার তালায় গুলি করল। প্রচণ্ড শব্দ হলো তাতে। তালা ভেঙে গেল। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল খুচরা মুদ্রায় ভরা একটি ছোট থলে আর প্রচুর গ্রীনব্যাক–সবুজ পিঠঅলা ব্যাংকনোট।

ওদিকে তাকাবার দরকার মনে করল না বো। রাগে ফুঁসছে। বেড়ালের মত হলুদ, বিদ্বেষভরা চোখে দেখছে ফ্রাঙ্ককে। ফ্রাঙ্কের ধীর স্থির আর শান্তভাব ওর অসহ্য ঠেকছে। মনে হচ্ছে যেন পাত্তাই দিচ্ছে না ওকে। জেতার আনন্দ অনেকটা ফিকে হয়ে গেছে ওর। ভারী চাঁছাছোলা কণ্ঠে বলল, 'পকেটে কী আছে ওগুলো বের করে ছুঁড়ে দাও এদিকে।'

অপলক তাকাল ফ্রাঙ্ক লোকটার দিকে। সামান্য ছুতোয় ঝাঁপিয়ে পড়তে তৈরি। দীর্ঘ এক মুহূর্ত জরিপ করল ওকে। তারপর পকেট থেকে মোজা দুটি বের করে ছুঁড়ে দিল।

এতক্ষণে ম্যাক্সওয়েলের ওয়ালেটের দিকে চাইল সে। 'টাকাগুলো গুনে নাও।'

পকেট থেকে বের করে ড্রামারের ছোট ওয়ালেটটাও ছুঁড়ে দিল ফ্রাঙ্ক। বো ব্রীন সরু চোখে তাকাতে উল্লাস বোধ করল।

'এটা আবার কোথায় পেলে?'

'ড্রামারের কাছে।' হাসল ফ্রাঙ্ক। 'আগেরটা এক্সপ্রেস গার্ড ম্যাক্সওয়েলের।'

ওয়ালেটটার ওপর ঝুঁকল স্নেক। হাতে নিল। পরক্ষণে চমকে উঠে ফেলে দিল হাত থেকে। এভাবে, যেন ওটা ওয়ালেট নয়, আস্ত একটা র‍্যাটল সাপ।

উঠে দাঁড়াল ও, মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। বার দুই

ঠোঁটদুটো কাঁপল, কিছু বলতে চাইল যেন। তারপর স্রেফ বোবা হয়ে গেল।

ওর ভাবান্তর দেখল ব্রীন। ভাল লাগল না। দু'পা সামনে এগিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'তোমার আবার কী হলো? অমন করছ কেন? ওয়ালেটের ভেতর ভূত দেখেছ নাকি?'

অতি কষ্টে ঠোঁটদুটো ফাঁক করল স্নেক। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'ওই গার্ড...যাকে আমরা গুলি করে মেরেছি, একজন ইউএস মার্শাল!'

স্নেকের কথা শুনে প্রায় একই সঙ্গে চমকে ওঠা চেহারাগুলো দেখল ফ্রাঙ্ক। এই লোকগুলোর সবাই কঠিন ও দুর্ধর্ষ। ওরা সন্ত্রাস পছন্দ করে; হৈ চৈ বা গোলমাল নেই, এমন কোনও কাজে আগ্রহ পায় না। প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে কোন্দল সৃষ্টি করতে চায় উত্তেজনার লোভে। যা-ই করুক, মন দিয়েই করে।

সে এতদিন এদের সাথে ছিল। ওদের তাই হাড়ে হাড়ে চেনা আছে। ওরা ওর মত নয়, ওর আদর্শের অনুবর্তীও নয়। ওরা স্রেফ দস্যু, মানুষের সর্বস্ব লুট করাই এদের পেশা। তবে এরা সাহসী। তাই লোকগুলোর প্রতি একধরনের সমীহ ছিল ওর। দস্যুতা করলেও মানুষ খুন না-করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফ্রাঙ্ক। অনর্থক সন্ত্রাস ওর অপছন্দ। কিন্তু এদের বেলায় সে-কথা খাটে না। ওর মূল্যবোধে বিশ্বাসী নয় এরা, খুন করার কাজটা হাসিমুখেই করতে পারে।

কিন্তু এ-মুহূর্তে এদের চমকে ওঠা চেহারা আর রক্তহীন মুখ দেখে এতদিনের সমীহ ভাবটা উবে গেল ফ্রাঙ্কের। লোকগুলোকে চারপেয়ে শেয়াল কিংবা কয়োটের চেয়ে বেশি কিছু ভাবতে ঘৃণা বোধ হচ্ছে ওর।

বিতৃষ্ণ দু'চোখ ফিরিয়ে নিল ওদের ওপর থেকে। ঝোপের সাথে বাঁধা ঘোড়ার উদ্দেশে এগোল। পেছন থেকে চেঁচাল বো

ব্রীন, 'আরে! যাচ্ছ কোথায় তুমি?' ওর গলায় এখন আর আগের জোর নেই। 'দেখো, তুমি কিন্তু আমাদের এই কাজে নিয়ে এসেছ। আমরা তোমার নেতৃত্বে এসেছি...'

পাঁই করে ঘুরল ফ্রাঙ্ক, কোমর থেকে শরীর বাঁকা করে সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল। ভুরু কুঁচকে সরু চোখে দেখছে প্রতিপক্ষকে। ওর ডান হাত শরীর থেকে একটু দূরে, ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি।

ফ্রাঙ্কের শীতল ও নীরব প্রতিক্রিয়া ক্রমশ দুঃসাহসী করে তুলছিল ব্রীনকে। ফ্রাঙ্ক ওর ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে টুঁ শব্দটিও করছে না ভেবে কেবল আত্মপ্রসাদে ভুগতে শুরু করেছে, কিন্তু হঠাৎ এরকম প্রতিক্রিয়া দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। মুখে ভয়ের রেখা ফুটল ওর।

'থামলে কেন?' হিস হিস করে উঠল ফ্রাঙ্কের গলা। 'বলো!'

স্রেফ বেকুবের মত ওর দিকে চেয়ে রইল ব্রীন। ফ্রাঙ্কের আচানক প্রতিক্রিয়ায় ভড়কে গেছে ও। প্রথমে ওর হাতদুটো পিস্তলের কাছে চলে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওগুলোর বাঁট পর্যন্ত ওর হাত পৌঁছাল না। হাড়ের তৈরি বাঁটের ইঞ্চিখানেক দূরে থাকতে জমে গেল যেন। ওর ইচ্ছে হচ্ছে দু'হাতে পিস্তলদুটো বের করে উদ্ধত লোকটার বুকে দুটো করে চারটা বুলেট ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু ফ্রাঙ্ক নিরস্ত্র। ওর রাইফেল স্ক্যাবার্ডে। নিরস্ত্র লোকের ওপর গুলি করার মত গোয়ার্তুমি করতে সাহস হলো না ওর। জানে, সেটা করলে নিজের লোকেরাই ভাল চোখে দেখবে না। কাপুরুষ হিসেবে চিহ্নিত হতে হবে ওদের কাছে। কেউই আর শ্রদ্ধা করবে না। আর ভাগ্য খারাপ হলে এর জের ফাঁসির দড়িতে গিয়ে দাঁড়াতে পারে।

কর্কশ শব্দ করে হেসে উঠল ফ্রাঙ্ক। ফিরে নিজের ঘোড়ার কাছে গেল। এক হাত স্যাডল হর্নে রেখে ঘাড় ফিরিয়ে বলল,

'এখানে একজন ইউএস মার্শাল খুন হয়েছে, বো। মনে রেখো, আইন এ-ঘটনার কথা সহজে ভুলবে না। হন্যে হয়ে উঠবে খুনির খোঁজে। তোমার কোনও আশা নেই। তুমি বরং দল-টল গুটিয়ে ফেলে সময় থাকতে এই তল্লাট থেকে কেটে পড়ো।'

এক মুহূর্ত ব্রীনের নিশ্চুপ মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ফ্রাঙ্ক। ব্রীনের মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। কপালে দুশ্চিন্তার গভীর ভাঁজ। এবার মুচকি হাসল ফ্রাঙ্ক। ঘোড়ায় চড়ে বসল। পমেলে হাত রেখে শেষবারের মত চাইল লোকটার দিকে। হুট করে মেয়েটার কথা মনে হলো ওর। সুন্দর মেয়েটা। কোমল। মনে দাগ কাটার মত দৃষ্টিকাড়া চেহারা।

ব্রীনের কপালে গোধূলির আলোয় চক চক করছে ঘামের ফোঁটা, তার পাশে স্নেক ফ্রেন্সটনের ভোঁতা মুখ–তাদের পেছনে দাঁড়ানো কঠোর চেহারার মানুষগুলো। 'ওরা...ওই লোকগুলো তোমার, বো,' হাসিমুখে বলল ফ্রাঙ্ক। 'প্রার্থনা করি ওদের নিয়ে শান্তিতে থাক।'

নার্ভাস দেখাচ্ছে বো ব্রীনকে, তবে ওর চোখদুটো লোভে চক চক করে উঠল। শরীরের ভর পাল্টে দাঁড়াল ও। দৃষ্টি সরিয়ে নিল ফ্রাঙ্কের ওপর থেকে। 'আমার নিজেরও তা-ই বিশ্বাস। অনেক সুখে থাকব আমরা। ...ইয়ে...,' আমতা আমতা করল। 'তোমার ভাগটা? তুমি তো...'

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ফ্রাঙ্কের। এই স্কাউন্ড্রেলগুলোর সঙ্গে এতটা দিন কাটিয়েছে, ভাবতেই কষ্ট হচ্ছে ওর। তিক্ত স্বরে বলল, 'ওটা মার্শালের খুনিটাকে দিয়ো। আমার চেয়ে ওর বেশি কাজে লাগবে।'

ওর কথা শুনে স্বস্তিবোধ করছে ব্রীন। চুপ করে আছে, তবে ওর চোখে স্পষ্ট বিদ্বেষ। ফ্রাঙ্ক বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি। আর কখনও ফিরব না। তোমরা কেউ আশা করি, আমার পিছু ধাওয়া

করবে না। যদি কর, তা হলে কিন্তু উচিত জবাব পাবে। এরপর কী করবে, সেটা তোমাদের ব্যাপার। তবে,’ তীক্ষ্ণ চোখে চাইল ব্রীনের দিকে। ‘কখনও যদি আমাদের দেখা হয়ে যায়, তা হলে আমাকে না-চেনার ভান করলেই ভাল করবে। ঠিক আছে?’

ঘোঁৎ করে সাড়া দিল কেউ কেউ। দু’একজন মাথাও নাড়ল।

স্নেক উবু হয়ে বসে পড়ল। লুট করা মালের ভাগ-বাটোয়ারা শুরু করল। সবাই ওকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়াল। ফ্রাঙ্কের ব্যাপারে এখন আর তাদের কোনও আগ্রহ নেই।

তবে ব্রীনের চাউনি ভাল ঠেকছে না তার কাছে। ওর চোখে অশুভ কিছুর আভাস। ও সশস্ত্র, দু’পাশে দুটো পিস্তল। কিন্তু ফ্রাঙ্ক ধরতে গেলে খালি হাতে, কেবল মুখের কথা দিয়েই তাকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে। গোঁয়ার লোকটা পুরো ব্যাপারটাকে হয়তো নিজের জন্যে চরম বেইজ্জতি হিসেবে বিবেচনা করছে। ও পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়েও তা স্পর্শ করার সাহস পায়নি। অথচ চাইলে অনায়াসে খুন করতে পারত নিরস্ত্র ফ্রাঙ্ককে।

এখন ফ্রাঙ্ক চলে যাচ্ছে। এটাকে যদি সে আবার নতুন করে নিজের জন্যে পরাজয় আর দলের জন্যে বিপদ হিসেবে গণ্য করে, তা হলে ফের পিস্তলের দিকে হাত বাড়াতে পারে। বাকিরাও যে ওর পক্ষ নেবে, এটা নিঃসন্দেহে বোঝা যায়।

আস্তে আস্তে বাকস্কিনের পিঠে চড়ে লাগাম আছড়াল ও। ঘোড়াটা সামনে এগোল। শেষবারের মত আরেকবার ঘাড় ফিরিয়ে ব্রীনকে দেখে নিয়ে সামনের সিডার বনের দিকে এগোল।

ওর চোখে ভাসছে ব্রীনের মুখে বিদ্রূপের হাসি—আর প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছে পেছন থেকে গুলির শব্দের।

ঘণ্টাখানেক নাগাড়ে ঘোড়া চালিয়ে উত্তর দিকের পাহাড়গুলোর

একটা উঁচু গাছের জঙ্গলে পৌঁছাল ফ্রাঙ্ক। একটু পরই পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে যাবে চারদিক।

ওর সামনের পথটা চড়াই, প্যাণ্ডারেসের ঠাসবুনটের মধ্য দিয়ে ক্রমে ওপরের দিকে উঠে গেছে। অন্ধকার নেমে এলে পুরো পথটাকে মনে হবে নিশ্ছিদ্র গুহাপথের মত, যেখানে নিজের শরীর পর্যন্ত দেখা যাবে না। আর চারদিক এমন নিস্তব্ধ হয়ে পড়বে যে, একটা তাড়া খাওয়া প্যাঁচার ভয়ার্ত কর্কশ চিৎকারও যেন তাতে চিড় ধরাতে পারবে না। পথে বিছিয়ে আছে প্যাণ্ডারেসের সূচ্যগ্র ঝরাপাতার কার্পেট, বাকস্কিনের পায়ের শব্দ ক্ষয়ে যাবে তাতে, আর পর্বতচুড়ো ছুঁয়ে নেমে আসা বাতাসে ভাসবে জঙ্গলের সুতীব্র ঘ্রাণ।

ও চেরি কাউসে যাচ্ছে। কাজটা হয়তো বোকামি হচ্ছে। ওর মন বলছে, এখন পালানো উচিত। কিন্তু এটাও ঠিক, নিজের পাওনা ফেলে গিয়ে বো ব্রীনকে তা ভোগ করার সুযোগ করে দেয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়। আগের সব ডাকাতির মালামাল থেকে নিজের ভাগের একটা বড় অংশ ডগলাস অ্যাণ্ড ডেমিং-এর একটা জায়গায় রাখা আছে। কিন্তু প্রায় তিন হাজার ডলারের মত প্যারাডাইসে সাই টার্নারের লিভারির ফীডরুমের নীচে লুকানো। ফ্রাঙ্কের সন্দেহ, এটার খবর বো ব্রীন জানে।

তিন হাজার ডলার থাকলে একটা মানুষ সহজেই নতুন করে জীবন শুরু করতে পারে। কিন্তু ফ্রাঙ্ক ভুলতে পারছে না যে, পশ্চিমগামী স্টেজকেচটা ওর নির্দেশেই থেমেছিল। ম্যাট পারকিন্স সে-কথা বলে দেবে। ওর বাকস্কিনটাকেও নিশ্চয় খেয়াল করেছে ওরা—বলার সময় ওটার কথাও মনে পড়ে যাবে হয়তো। টার্নারের ওখানে গিয়ে ফ্রাঙ্ক অবশ্য ঘোড়াটা পাল্টে ফেলতে পারবে। টার্নারের সাদামুখো নীল রোয়ানটা চমৎকার ঘোড়া। শক্ত মজবুত পা। দৌড়াতে পারে রেসের ঘোড়ার মত। ফ্রাঙ্ক ওটাই নেবে।

সকাল হওয়ার আগেই ও এ-তল্লাট ছেড়ে চলে যেতে চায়। নীল রোয়ানটা পেলে সেটা সম্ভব।

ফ্রাঙ্ক নিশ্চিত, গার্ড তথা ইউএস মার্শালকে হত্যার ব্যাপারটা তোলপাড় সৃষ্টি করবে মানুষের মনে। আইনের লোকেরা হন্যে হয়ে উঠবে খুনিকে ধরার জন্যে। একজন ইউএস মার্শালকে খুন করে খুনি যদি শেষ পর্যন্ত পার পেয়ে যায়, তা হলে নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়বে ওরা। বিপন্ন বোধ করবে। সুতরাং বেজন্মা খুনিটাকে গ্রেফতার না-করা পর্যন্ত হাল ছাড়বে না ওরা।

ইউএস মার্শাল ম্যাক্সওয়েল যে ফ্রাঙ্কের হাতে খুন হয়নি, সেটা পারকিন্স ঠিকই জানে। তবে তাতে তেমন কিছু হেরফের হবে না। তারা বাকস্কিনে চড়া লোকটির পেছনেই ছুটবে। স্টেজ যারা থামিয়েছে, সেও তাদেরই একজন। তা ছাড়া ওর নাম ফ্রাঙ্ক সেলজার, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর তাদের জন্যে। ফ্রাঙ্ক সম্পর্কে ওরা জানে। খুব একটা অপরিচিত নয় সে ওদের কাছে।

ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে চাইল ফ্রাঙ্ক। কিছুই দেখল না। দেখবে না জানতই। ব্যাকট্রেইল নিয়ে এখনও চিন্তিত হওয়ার দরকার নেই। ওর বিপদ যদি হয়, সেটা সামনেই। পারকিন্স যেখানে মুখ খুলতে পারে, সেটা এখান থেকে আরও কম পক্ষে মাইল চল্লিশেক দূরে। পারকিন্সের সেখানে পৌঁছতে আরও প্রায় এক ঘণ্টা লাগবে। এরপর ওর মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে আইনের লোকেরা ছুটে এসে ওর ট্র্যাক খুঁজে বের করতে করতে আরও ঘণ্টা তিনেক। তা ছাড়া ওরা একত্রে আসবে না–বিভিন্ন জন বিভিন্ন দিকে ভাগ হয়ে বেরিয়ে পড়বে।

উদ্বেগ এক পাশে সরিয়ে রেখে আগে ইতিকর্তব্য ঠিক করার কথা ভাবতে শুরু করল ফ্রাঙ্ক। ও যদি ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে পারে, তা হলে কেউ ওকে খোঁজার কথা ভাববে না। ওর এখন যা

দরকার, তা হলো লুকিয়ে রাখা টাকাগুলো হাতে পাওয়া, বাকস্কিনটা পাল্টে টার্নারের রোয়ানটা নেয়া এবং–এরপর ওর কাজ হবে খুনিকে ধরার ব্যাপারে আইনকে সহায়তা করা।

চিন্তাটা ওর জন্যে বেশ স্বস্তিকর হলো; মনের ভার কেটে অনেকটা হালকা হয়ে গেল। নিজের চলার পথ নিয়ে ভাবতে শুরু করল এবার। পর্বতমালার এ-পাশটা ওর তেমন পরিচিত নয়, তাই এখন আর আনমনা হলে চলবে না।

প্যারাডাইস জায়গাটা বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে এখন। নষ্ট চরিত্রের বিপথগামীদের জন্যে আক্ষরিক অর্থেই স্বর্গরাজ্য। রাত-দিন নরক গুলজার চলছে ভবঘুরে আর আউটলদের দাপটে। বার, বেশ্যাখানা আর জুয়ার আসর চলছে হরদম। পয়সা ফেললে ভোগের নানা আয়োজন সারাক্ষণ আমন্ত্রণ জানাচ্ছে সমঝদারদের। তবে ফ্রাঙ্ক জানে সে সমঝদার নয়। তার মত মানুষদের কদর নেই প্যারাডাইসে।

গাছগাছড়ার জঙ্গল ছেড়ে যখন সে একটা স্পারে পৌঁছাল, তখন চাঁদ উঠে গেছে। স্পারের নীচে ঝরনার পানিতে আলোর প্রতিফলন চোখে পড়ল ওর। ঝরনার পাড়ে ওক আর জুনিপারের দঙ্গল।

পানির গন্ধে চঞ্চল হয়ে উঠল বাকস্কিন। বিনা তাড়নায় এগিয়ে চলল ঝরনার দিকে। ফ্রাঙ্ক যেতে দিল। ওর নিজের অবস্থাও ঘোড়াটার মত। ঝরনায় নেমে একই সাথে পানি খেতে লাগল আরোহী আর বাহন। ফ্রাঙ্ক কয়েক ঢোক খেয়ে সোজা হলো–তারপর টান দিল পানরত ঘোড়ার লাগামে। প্রথমে বার দুয়েক আপত্তি জানাল বাকস্কিন ভোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে। পিপাসা মেটেনি ওর। কিন্তু মালিকের অনিচ্ছার কথা বুঝতে পেরে শেষে উঠে এল ঠোঁট চাটতে চাটতে।

চাঁদের আলোয় আরেকটু সামনে যেতে জন গ্যালের

পরিত্যক্ত কুটিরটা দেখতে পেল। জন গ্যালে এক সময় আকরিক থেকে সোনা পৃথক করার কাজ করত এখানে। পরে ব্যবসায় লাভ করতে না-পেরে চলে যায়। এখন পড়ে আছে ভাঙাচোরা টিন আর ঢাউস কিছু মেশিনের ভগ্নাংশ।

ক্যানিয়নের উঁচু অংশের মাঝখান দিয়ে সরু পথ। সামনে যেতে যেতে মাঝে মধ্যে নানারকম আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ও। বেশির ভাগই গানফায়ারের। নিশ্চিত বোধ করছে ফ্রাঙ্ক। গোলাগুলির শব্দ শোনার মানে হচ্ছে ঠিক পথে চলেছে সে। আর কিছুক্ষণ সামনে গেলেই শহর পাবে।

আরও আধঘণ্টা যেতে শহরের বাতির আলো দেখতে পেল সে। ঘোড়ার গতি কমাল। মনে মনে ভাবছে, সরাসরি শহরে ঢুকে বারে গিয়ে আগে গলা ভিজিয়ে নিয়ে কাজ শুরু করবে, নাকি চুপি চুপি কারও চোখে না-পড়ে নিজের কাজ সেরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করবে। দ্বিতীয়টাই ওর কাছে বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মনে হলো। ও এখানে সময় নষ্ট করবে না।

এই এলাকায় ফ্রাঙ্ক সেলজার *কার্লি ফ্রাঙ্ক* নামে পরিচিত। একজন ঘোড়া ব্যবসায়ী আর বদমেজাজী লোক, যাকে ঘাঁটানোটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয় বলে জানে সবাই। তাসের কারসাজির জন্যে ট্যাটিরন নামের একজনকে পিস্তল দিয়ে পিটিয়ে লাশ বানিয়ে ফেলেছিল প্রায়।

এখান থেকে কোথায় যাবে, তা এখনও ঠিক করেনি ফ্রাঙ্ক। যাওয়ার জন্যে অবশ্য অনেক জায়গাই আছে। এই পর্বতমালার ভেতর দিয়ে উত্তর-পশ্চিমে চলে যেতে পারে ও। কিংবা সোজা উত্তরে। দক্ষিণে অ্যাপাচি ক্যানিয়নের ভেতর দিয়ে সান বার্নার্ডিনো অথবা দক্ষিণ-পশ্চিমে পির্টলভাইল অথবা বিসবিতেও যাওয়া যায়।

কিন্তু ফ্রাঙ্কের মাথায় ঘুরছে এখন ওই মেয়েটি। ড্রামারের

কথামত মেয়েটি নিজের নাম লিখতে পারে–এবং চাইলে এই দেশের অর্ধেকটা কিনে ফেলতে পারে। ওর মনে হলো, যে কোনও মানুষের মনে ওই মেয়ে নিজের আসন ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। মেয়েটি ছোট, বয়স কম, অথচ সমীহ্ জাগানোর মত তার ব্যক্তিত্ব। যে কোনও সত্যিকার পুরুষই এই মেয়েকে ভাল না-বেসে পারবে না।

শহরে ঢুকতে প্রথমে বার্ড ফুলারের দোকান। লণ্ঠনের ক্যাটক্যাটে আলোয় ভরা দোকানের ভেতরটা। একটা স্প্রিং ওয়্যাগনের পাশ কাটাতে গিয়ে জিম জনসনকে দেখে একটা হাত তুলল। জ্যাক ডলের সেলুনের দিকে তাকিয়ে দেখল ব্যাটউয়িং-এর ওপাশে ঠাসাঠাসি ভীড়। হঠাৎ কী মনে করে পেছনে ওয়্যাগনের দিকে ঘাড় ফেরাল সে। লম্বা, হাড্ডিসার লোকটাকে দেখল। একটা টোবাকো পাইপ চিবুচ্ছে লোকটা। এরপর গার্ডি নেলসের দোকান থেকে কর্কশ ঝগড়াটে গলার আওয়াজ ভেসে এল ওর কানে।

আরেকটু এগোতে স্মেসনের দোকানের সামনে মারামারিরত দু'জন মাইনারকে দেখতে পেল। তুমুল ঘুসাঘুসি চলছে দু'জনের মধ্যে। নাপিতের দোকানের ভেতর বাউরিং বেনসনকে দেখল জুলফি ছাঁটিয়ে ঠিক করাচ্ছে।

নিক ব্যাবককের আস্তাবলের পেছনে বাকস্কিনটাকে থামাল ফ্রাঙ্ক। স্যাডল থেকে নেমে বাঁধল ওটাকে। তারপর এগোল ব্যাবককের দোকানের দিকে। কিন্তু দোরগোড়ায় পৌঁছে মত পাল্টে নিক এবং লোন স্টার মার্কেন্টাইলের মধ্যের গলিপথে ঢুকল। ভাঙা বোতল আর বিয়ারের খালি ক্যানের মাঝখান দিয়ে সন্তর্পণে এগোল সে। মনে মনে অবাক হচ্ছে। হঠাৎ এতটা সাবধানী হয়ে ওঠার কারণ কী বুঝতে পারছে না। ব্যাপারটা ভালও লাগছে না ওর। কেন যেন আতঙ্ক বোধ করছে।

যখন রাস্তায় উঠল, তখনও লোক চলাচলের কমতি নেই। এবড়োখেবড়ো রাস্তায় ধুলোর ঝড় তুলে টলোমলো গতিতে চলছে আকরিক বোঝাই ওয়্যাগন। ঝাপসা দেখাচ্ছে দু'পাশের বাড়িঘর আর দোকানপাট। নাপিতের দোকানের সামনে কয়েকজন দাঁড়িয়ে জোর বিতর্ক জুড়ে দিয়েছে আগামী কালের নাচের প্রতিযোগিতায় কে জিতবে তা নিয়ে। দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে লিটল জোয়ের সমর্থকই বেশি। হিচরেইলের পাশ দিয়ে হেঁটে সাই টার্নারের দোকানের দিকে যেতে যেতে দু'জন ভদ্রলোককে এ-ব্যাপারে রীতিমত শপথ করতে শুনল ফ্রাঙ্ক।

সাই টার্নারের লিভারি আস্তাবল ক্যারাডাইনের ব্রথেল হাউসের পেছনে। জায়গাটা একটা গালশের মত। সামনের দিকে ক্রমশ চওড়া হয়ে গেছে। এর পরেই মার্সার হোটেল। ব্রথেল হাউসের পুব পাশে একটা অন্ধকার জায়গায় থামল ফ্রাঙ্ক। চোখ সরু করে সন্ধানী দৃষ্টি বুলাল চারপাশে। সন্দেহ করার মত কিছু আছে কিনা পরখ করে নিচ্ছে। পকেট থেকে কাগজ আর তামাক বের করে সিগারেট রোল করতে শুরু করল। কোথাও কোনও নড়াচড়া চোখে পড়ছে না। সব কিছুই মনে হচ্ছে স্বাভাবিক।

তবু ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না ওর। এতটা স্বাভাবিক থাকাটাকেই কেন যেন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। ভয় হচ্ছে, অন্ধকার থেকে আলোতে গেলে ওর অবস্থা হবে অ্যাকুয়রিয়ামে রাখা গোল্ডফিশের মত।

কিন্তু তা মনে হলেও ওর কী করার আছে?

অবশ্য সে চাইলে এখান থেকে চুপচাপ চলে যেতে পারে। যে-টাকাগুলো গোপন জায়গায় রেখেছে, সেগুলোর মায়া ত্যাগ করে সোজা সীমান্তের দিকে ঘোড়া ছোটাতে পারে।

কিন্তু সে জানে, সেটা সে করবে না। তিন হাজার ডলার মানে তিন হাজার ডলার। বো ব্রীনের মত বেজন্মা কোনও

কাপুরুষের ভোগের জন্যে টাকাটা রেখে যাবে না সে।

চুপচাপ কান পেতে রইল ফ্রাঙ্ক। নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায়।

দূরে আস্তাবলের সামনে লণ্ঠন জ্বলছে। ওর আর আস্তাবলের মাঝের দূরত্ব লণ্ঠনের আলোয় পুরোপুরি পরিষ্কার হয়নি। অন্ধকার যেন ঘাপটি মেরে আছে ওখানে। আস্তে আস্তে আলো সয়ে এল চোখে। বুঝতে পারছে, লণ্ঠনের আলোয় উদ্ভাসিত প্রধান দরজা ছাড়া ভেতরে ঢোকার আর কোনও পথ নেই। পেছন থেকে বাধা হয়ে আছে একটা উঁচু বেড়া। ওটা বেয়ে অবশ্য ওঠা যায়। কিন্তু তাতে যে-শব্দ হবে, তা এড়ানোর উপায় নেই। শব্দ শুনে সবাই হা হা করে ছুটে আসবে চোর ভেবে।

অনিশ্চয়তায় ভুগছে ফ্রাঙ্ক। জানে, এখানে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা ঠিক হচ্ছে না। সময় চলে যাচ্ছে হু হু করে। ওর উচিত, এক্ষুণি ঘোড়া ছুটিয়ে এখান থেকে সরে পড়া।

আরও কয়েক সেকেণ্ড সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিক পর্যবেক্ষণ করল সে; এরপর সোজা আস্তাবলের দরজার দিকে এগোল।

আস্তাবলে ঢোকার পথে লণ্ঠন জ্বলছে। লণ্ঠনের আলোয় চারদিক আলোকিত। এখন সরাসরি আলোর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ও। সবাই দেখতে পাচ্ছে ওকে। পরিষ্কার। আতঙ্কিত বোধ করছে ফ্রাঙ্ক। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছে আচমকা কেউ একজন বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছে, গুড়ুম শব্দে গুলি করতে যাচ্ছে। দুই পা ভারী ঠেকছে ওর কাছে। মনে হচ্ছে হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবে।

কিন্তু কেউই চেঁচাল না, কেউই চ্যালেঞ্জ করল না; অন্ধকার থেকে আচমকা কোনও গুলি ছুটে এল না, কিংবা ঝাঁপিয়েও পড়ল না কেউ ছুরি হাতে।

বড় বড় পা ফেলে আস্তাবলে ঢুকে গেল ফ্রাঙ্ক। ওর হাঁটুদুটো কাঁপছে। কপালে শীতল ঘাম। মনে হচ্ছে, আস্তাবলের সামনের

যে-পথটুকু পেরিয়ে এসেছে, ওটা পথ নয়, সাগর। আর ও সাগরটা সাঁতরে পেরিয়েছে। হাতের কাছে বড় একটা খুঁটি পেয়ে ওটা জড়িয়ে ধরে দাঁড়াল ও, হাঁফাতে লাগল।

খুঁটি ধরে হাঁফাতে হাঁফাতে ধাতস্থ হওয়ার চেষ্টা করছে ফ্রাঙ্ক। আস্তাবলের সামনের পথটুকু পেরোতে বড় জোর তিরিশ সেকেণ্ড সময় লেগেছে। কিন্তু ওর মনে হচ্ছে তিরিশ সেকেণ্ড নয়, বরং অনন্তকাল ধরে হাঁটছিল সে ওই পথ ধরে।

একটা ঘোড়া ডেকে উঠল মৃদু স্বরে, চমক ভাঙল ওর। পায়ের কাঁপন আগের চেয়ে কিছুটা কমেছে টের পেল। খুঁটি ছেড়ে দিয়ে সোজা হলো সে। সরে গেল খুঁটির কাছ থেকে। এবার দরজার ওপাশে আলো দেখল। জানে, ওদিকেই সাই টার্নারের অফিস। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। আলোর ছটা বেরিয়ে আসছে, এমন এক জায়গা দিয়ে উঁকি দেয়ার চেষ্টা করল। স্পষ্ট কিছু দেখতে না-পেয়ে শেষে কান পাতল দেয়ালে।

কারও গলার শব্দ শুনতে পেল না। তবে মাঝে মধ্যে কাগজপত্র নাড়াচাড়ার খস খস শব্দ আসছে ভেতর থেকে।

হোলস্টারের বাঁধন কিছুটা আলগা করে নিল ফ্রাঙ্ক। তিন পা এগিয়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল। তারপর আচমকা পাল্লা ঠেলে দিয়ে দরজা জুড়ে দাঁড়াল। চশমার ওপর দিয়ে তাকাল টার্নার, হাতে একখানা খবরের কাগজ। নামটা পড়ল ফ্রাঙ্ক। এক সপ্তাহ আগের *টম্বস্টোন এপিটাফ*। 'হাই' সম্ভাষণ জানাল সাই। তারপর ফের কাগজ পড়ায় মন দিল।

বুকে চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ছাড়ল ফ্রাঙ্ক। রুমের ভেতরে ঢুকে পড়ল। পেছন থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিল ঢোকার পর।

লণ্ঠনের হলুদ আলো জ্বলছে টিম টিম করে। ম্লান আলোয় স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে ফ্রাঙ্ককে। বেপরোয়াই বলা যায়। আসলে মরিয়া হয়ে উঠেছে ও।

'সাই,' ডাকল আস্তাবল মালিককে। 'আমি তোমার ঘোড়াটা কিনে নেব।'

'কোন্ ঘোড়াটার কথা বলছ, ফ্রাঙ্ক?' খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলল না সাই।

'তোমার ওই সাদামুখো রোয়ানটা।'

'ওল্ড বাগলারের কথা বলছ তো?' ভুরু কুঁচকাল আস্তাবল মালিক।

'একটা দাম বলে দাও। রোয়ানের সাথে তার সাজ আর একটা স্যাডল গানও লাগবে।'

হাতের কাগজটা এবার নামাল টার্নার। এক পাশে রাখল। চোখ থেকে এতক্ষণ ধরে রাখা নির্লিপ্ত ভাব কেটে গিয়ে স্পষ্ট ধূর্ততা ফুটে উঠেছে। 'ওটা বেচার কথা আমি বলেছি বলে তো মনে পড়ছে না। আর একটা ভাল স্যাডলও চাইলেই হুট করে পাওয়া যায় না। কিন্তু তোমার ঘোড়ার সাজটার কী হয়েছে?'

'দেখো, সাই, পোকার আমার প্রিয় খেলা নয়। তুমি নিজেও তা জান। সোজা কথায় বলে দাও, তুমি ওই ঘোড়াটা বেচবে কিনা?'

'বেচার ইচ্ছে আমার নেই। তবে তুমি যদি একান্তই চাও, তা হলে রাজি হয়ে যাব। ওটা আমার দু'শ' ডলারে কেনা। তুমি নিতে চাইলে ছয়শ' লাগবে। অবশ্য এর মধ্যে ঘোড়ার সাজ আর স্যাডল গানের টাকাটাও যোগ করা হয়েছে।'

'বেশ, তাই দেব। তুমি ঘোড়ার সাজ আর স্যাডল গান নিয়ে আসো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব তৈরি চাই আমি।'

জরিপ করার ভঙ্গিতে ওকে দেখছে সাই। তবে কোনও কথা না-বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে রুম থেকে বেরিয়ে গেল। দেয়ালের হুকের সঙ্গে ঝোলানো লণ্ঠনটা নিয়ে আস্তাবলের পেছনে চলে গেল।

ওর বার্নে ঢোকা পর্যন্ত অপেক্ষা করল ফ্রাঙ্ক। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠল। ফীডরুমে ঢুকে সামনে এগোল। সাবধানে বস্তাভরা শস্যের মাঝখান দিয়ে কিছুদূর যেতে আলো কমে গিয়ে অন্ধকার হয়ে গেল। আরও কিছুদূর গিয়ে সামনের দেয়ালের একটা আলোকিত অংশের সামনে দাঁড়াল।

জায়গাটা পুব পাশের দেয়ালের একটা জানালা। অফিসরুমের ঠিক পেছনে।

জানালার স্টপারগুলো সরিয়ে দিয়ে নীচের দিকের শার্সিটা তুলে ধরল ফ্রাঙ্ক। কান পেতে শুনল কাছে পিঠে কোথাও শব্দ হয় কিনা। নিশ্চিন্ত হয়ে নেমে গেল তারপর। ধপ করে মাটিতে পড়ল। খুব একটা শব্দ হলো না তাতে। তবু অপেক্ষা করল ফ্রাঙ্ক। ওর সাথে আলো নেই। তবে অন্ধকার গাঢ় না-হওয়ায় চারপাশ দেখতে অসুবিধে হচ্ছে না।

বুকে হেঁটে আরেকটু সামনে এগোল ও। আট ফুট বাই আট ফুট ফাউণ্ডেশনটার কাছে এসে থামল। ফাউণ্ডেশনের তলায় একটু ফাঁকা অংশ। তার ভেতরে একটা গর্ত করে টাকাটা রেখেছে ও। গর্তের মুখে রাখা আবর্জনা সরিয়ে হাত বাড়াল। জানে টাকাটা ওখানেই আছে। অনেক মাথা খাটিয়ে টাকাটা লুকোনোর জন্যে এ-জায়গা খুঁজে বের করেছিল সে। তিন হাজার ডলার রেখেছিল কাকপক্ষীটিও টের না-পায় মত করে।

হাত আরেকটু ভেতরে ঢোকাল ফ্রাঙ্ক। ধুলোবালিতে ভরে আছে জায়গাটা। যেভাবে রেখেছিল, তাতে খুঁজে পেতে এতক্ষণ লাগার কথা নয় অবশ্য। তবে...

মিনিটখানেক পরে খালি হাত বের করে আনল ও। নেই টাকাটা!

# চার

বুকের ভেতরটা ফাঁকা মনে হলো ফ্রাঙ্কের। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। সাথে সাথে প্রচণ্ড ক্রোধে দিশেহারা হওয়ার মত অবস্থা হলো। প্রথমেই যে-কথাটা ওর মনে হলো, সেটা হলো বো ব্রীনের মাথাটা চিবিয়ে খাওয়া। এখানে টাকা রাখার কথা কাকপক্ষীটি টের না-পেলেও ব্রীন যে কিছু একটা আঁচ করতে পেরেছিল, সেরকম সন্দেহ হয়েছিল ওর। কিন্তু সন্দেহটাই শেষ পর্যন্ত সত্যে পরিণত হবে, তা কে জানত? দাঁতে দাঁত ঘষল ফ্রাঙ্ক। অতদূর থেকে অতটা পথ পাড়ি দিয়ে আসাটা তার অর্থহীন হয়ে গেল। ব্রীনের হলুদ ঘিনঘিনে হাসিটা চোখের সামনে ভেসে উঠল যেন। মনে মনে লোকটাকে অভিশাপ দিতে দিতে বেরিয়ে এল ও।

সাই টার্নারের লণ্ঠনের আলোয় উদ্ভাসিত অফিসরুমে এসে ঢুকল ফের। টাকাটা না-পেয়ে এখন তার মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। অনেক বড় ভরসা ছিল তার এই টাকাটার ওপর। ভবিষ্যতে একজন সুশীল নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পাথেয় হিসেবে ভাবছিল এটাকে। কিন্তু এখন তার সব হিসেব গোলমাল হয়ে যেতে বসেছে।

এবারের ডাকাতিটাকেই শেষ কাজ হিসেবে ধরে নিয়েছিল সে। লুটের মাল ভাগাভাগি করে যা পাওয়া যেত, তার সাথে জমানো টাকা মিলিয়ে মোটামুটি নতুন করে জীবন শুরু করার

ব্যবস্থা হয়েই যেত। কিন্তু এবার একটা মানুষ খুন হয়েছে এবং মৃত লোকটা একজন ইউএস মার্শাল। সুতরাং আত্মরক্ষার তাগিদেই সে নিজের ভাগ ফেলে ধরতে গেলে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু এখন জমানো টাকার হদিস না-পেয়ে কী করবে বুঝতে পারছে না।

সাই-এর ডেস্কের ওপর বসল ও। একটু পরে বার্নে সাই-এর পায়ের শব্দ শুনল। একই সাথে ঘোড়ার খুরের আওয়াজও। অফিসের সামনে এসে লণ্ঠনটি আগের জায়গায় রাখল টার্নার। হাত থেকে ঘোড়ার লাগামটা ফেলে দিয়ে বলল, ‘সব আনা হয়েছে।’

‘বেশ!’ দ্রুত চিন্তা করছে ফ্রাঙ্ক। এরপর কী করা উচিত জানে সে। লোকটাকে খুন করে ঘোড়াটা নিয়ে পালিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু স্টেজকোচের চাকার মধ্যখানে পড়ে থাকা ম্যাক্সওয়েলের লাশের কথা মনে হতেই নিজেকে সামলে নিচ্ছে। সে একটা খুনের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে তল্লাট ছেড়ে পালাচ্ছে। পালাতে গিয়ে আরেকটা খুন করলে সেটা তার সমস্যা বাড়াবেই শুধু। সেটা আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

অবশ্য এটা বলা যায় যে, সে ঘোড়া কেনার ব্যাপারে মত পাল্টেছে, কারণ ঘোড়া কেনার টাকাটা তাকে এখুনি জরুরি কাজে ব্যয় করতে হবে। ওকে টাকা হারিয়ে গেছে, এসব বলে লাভ নেই। তাতে সাই-এর মন গলবে না। নিজের লাভ হচ্ছে না, এমন কোনও ব্যাপারে ওর কোনও আগ্রহ নেই।

নীল রোয়ানটার নাম বাগলার। ওটা ছাড়াও অবশ্য আস্তাবলে আরও ঘোড়া আছে। কিন্তু ওগুলোর প্রতি ফ্রাঙ্কের কোনও আগ্রহ নেই। ওর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছে বাগলারের গতি এবং কষ্টসহিষ্ণুতার ওপর ভিত্তি করেই। ভুরু কুঁচকে টার্নারের দিকে চাইল সে। ওর চলার পথটা সত্যি কঠিন হয়ে পড়েছে।

ডেস্কের ওপর থেকে উঠে দাঁড়াল ও, তারপর টার্নারের দিকে এগোল।

চোখে পড়ার মত লোক বটে সাই টার্নার। দশাসই চেহারা, বিশাল বুক। হাতুড়িপেটা কামারের মত পেশী ফোলানো বাহু। দরজার মুখে এসে দাঁড়াল লোকটা। 'আমার টাকা?'

'আমার কথার নড়চড় পেয়েছ কখনও, সাই?' অবাক হওয়ার ভান করল ফ্রাঙ্ক।

'তোমার কথা দিয়ে আমি কী করব? ওটা দিয়ে তো ঘোড়ার খাবারও জোটানো যাবে না। এখানে লিভারি আস্তাবল চালাতে টাকা-পয়সা লাগে, কারও মুখের কথায় কাজ হয় না,' গোঁয়ারের মত বলল সাই।

ফ্রাঙ্কের সামনে এখন দুটো পথ। হয়তো ঘোড়া না-নিয়ে চুপচাপ চলে যেতে হবে, নইলে লোকটাকে কাবু করে ঘোড়াটা নিয়ে যেতে হবে। নিজেকে ফাঁদে পড়া চারপেয়ে জন্তুর মত মনে হচ্ছে ওর। কল্পনায় পাসির দলটাকে ক্রমে বিশাল থেকে বিশালতর ঠেকছে।

'তুমি কিন্তু আমাকে অপমান করছ, সাই। তবে আগে আমার কথাটা একটু শোনো। তোমার আস্তাবলের ফীডরুমের মেঝের তলায় আমার কিছু টাকা ছিল। আমি নিজেই লুকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি, ওগুলো নেই।' একটু থামল ফ্রাঙ্ক। 'যা হোক, আমি তোমাকে একটা হ্যাণ্ডনোট লিখে দিচ্ছি অথবা ধরো...'

'ফ্রাঙ্ক, আমার কাছে এসব বলে খুব একটা সুবিধে করতে পারবে না। আমি ব্যবসায়ী মানুষ...'

রাগে লাল হয়ে উঠল ফ্রাঙ্কের মুখ। 'আমি তোমার কাছে কীসের সুবিধে চাইব, সাই? আমি তোমাকে সত্যি কথাটাই বললাম। আমার টাকাটা চুরি হয়ে গেছে। সুতরাং একটা ঘোড়া

এবং সাজসরঞ্জাম আমাকে ধারে কিনতে হবে। আমি তোমাকে বন্ধু ভাবি বলেই ধারের কথা বললাম। কিন্তু তুমি আমাকে...'

'দুঃখিত, আমি তোমার মত ভাবি না। ওয়ালেটের ভেতর রাখতে পারি, এমন কিছুকেই আমি বন্ধু মনে করি। যাও, এখন আর ফালতু কথা বলে লাভ নেই। তুমি ঘোড়াটা নিচ্ছ কিনা?' চাঁছাছোলা কণ্ঠে জানতে চাইল টার্নার।

'ঠিক বলেছ,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ফ্রাঙ্ক। 'আমি অবশ্যই ঘোড়াটা নেব।' বলেই আচমকা প্রচণ্ড এক ঘুসি হাঁকাল আস্তাবলরক্ষকের চোয়ালে। রাগ, হতাশা আর ক্ষোভের মিশেলে হাঁকানো সে একটা ঘুসিতেই চিৎপটাং হওয়া উচিত ছিল লোকটার। কিন্তু সাই সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছিল ফ্রাঙ্ক।

অনায়াসে ঘুসিটা হজম করে নিল সাই। তারপর মৃদু কিন্তু ভয়ঙ্কর হাসি হেসে এগোল বেয়াড়া খদ্দেরের উদ্দেশে।

ষাঁড়ের মত প্রচণ্ড শক্তি ওর শরীরে। শুধু শক্তি নয়, ওর ক্ষিপ্রতা সম্পর্কেও ভুল ধারণা করেছিল ফ্রাঙ্ক। বিশাল শরীর নিয়েও স্প্রিং-এর মত নড়ে উঠল সাই, মুঠো পাকাল। মাথা নিচু করে সরে গিয়ে ঘুসি কাটানোর চেষ্টা করল ফ্রাঙ্ক। পুরোপুরি পারল না। টার্নারের হাতের শক্তিশালী আঘাত টালমাটাল করে দিল ওকে। পরের ঘুসিটা ওকে দেয়ালের ওপর আছড়ে ফেলল। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে চোখে সর্ষেফুল দেখল ফ্রাঙ্ক। এক সাথে এক হাজার তারাবাতি জ্বলে উঠল যেন ওর চারদিকে। লোকটার ঘুসি যেন হাতুড়ির মত আঘাত করছে ওর মাথায়। সোজা হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ পাচ্ছে না ফ্রাঙ্ক। ওদিকে প্রতিপক্ষের কুপোকাত অবস্থা দেখে উৎসাহ আরও বেড়ে গেছে সাই-এর।

ঘুসির পর ঘুসি মারছে সাই। নাগাড়ে। কোনওমতেই সামলে উঠতে পারছে না ফ্রাঙ্ক। মার অসহ্য ঠেকছে। মনে হচ্ছে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না আর; যে কোনও মুহূর্তে হাঁটু

ভেঙে পড়ে যাবে।

তবু দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে ও। অন্ধের মত হাতড়াচ্ছে, মাথা ঝাঁকি দিয়ে ব্যথার ঘোর কাটানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। ওর একমাত্র লক্ষ্য সাই-এর শার্টের সামনের অংশটা। ওটা আঁকড়ে ধরতে চায় সে। তবে সাই সেয়ানা। সুযোগ বুঝে বুঝে আচমকা মার দিচ্ছে। প্রতিপক্ষের নাগালের কাছে ভিড়ছে না। ঘুসি মেরেই ছিটকে সরে যচ্ছে। চোখে অন্ধকার দেখছে ফ্রাঙ্ক। চোখ বন্ধ অবস্থায় দমের জন্যে দাঁড়িয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে সাই-এর মত বিশাল শরীরের লোকটাকেও হাঁফাতে শুনল। প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে সাই-এর ফুসফুসে বাতাস টানার সময়। ঘুসির তোড় কমেছে কিছুটা।

এ-সময়টাকে কাজে লাগাতে চাইল ফ্রাঙ্ক। এতক্ষণ প্রতিপক্ষকে কেবল মারের ওপর রাখতে গিয়ে নিজের বিপদ খেয়াল করতে পারেনি সাই। এক তরফা মারতে পেরে আসলে ওর ভালই লাগছিল। ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ফের মার শুরু করার জন্যে শক্তি সঞ্চয় করছিল সে। ফলে কয়েক সেকেণ্ড সময় পেল ফ্রাঙ্ক। তাতেই সুযোগটা দেখতে পেল।

ফের বেয়াদব লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত হলো সাই। জিরিয়ে নেয়ার সময় ফ্রাঙ্কের প্রায় নেতিয়ে পড়া ভাবটা খেয়াল করেছে। এখন আর খুব বেশি প্রতিরোধের আশা করছে না শত্রুর কাছ থেকে। লড়াইটা এবার তার শেষ করে দেয়ার ইচ্ছে।

নিজের জায়গা থেকে এক চুলও নড়েনি ফ্রাঙ্ক। সেও হাঁফাচ্ছে, কুকুরের মত জিভ বের করে। তবে ওর চোখ সাই-এর ওপর। লড়াইটা শেষ করে দেয়ার ইচ্ছে নিয়ে নেতিয়ে পড়া শত্রুর ওপর ফের ঝাঁপ দিয়ে পড়ল সাই। গায়ের ওপর এসে পড়ার ঠিক এক মুহূর্ত আগে জায়গা থেকে সরে গেল ফ্রাঙ্ক। ব্যাপারটা খেয়াল

করল সাই, কিন্তু তখন আর তার থামার উপায় নেই। শেষ মুহূর্তে চেষ্টা করল বটে গায়ের ঝোঁক সামলাতে। তবে কাজ হলো না। হুমড়ি খেয়ে পড়ল যে-জায়গায় ফ্রাঙ্ক বসেছিল, সেটার ওপর। সেখান থেকে পিছলে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটল ওর।

বিদ্যুদ্বেগে উঠে দাঁড়াল ফ্রাঙ্ক। তাকাল বিশাল শরীরের লোকটার দিকে। মেঝেয় পড়ে আছে লোকটা। মাথা ঝাঁকাচ্ছে বারবার। পতনের ধাক্কায় মাথা ঝিম ঝিম করছে সম্ভবত। হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে, এমন সময় ফের আক্রমণে গেল ফ্রাঙ্ক। ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রচণ্ড জোরে ঘুসি হাঁকাল ওর পাঁজরে। মাথা ঝাঁকানো বন্ধ হয়ে গেল সাই-এর। ফ্রাঙ্কের পরের ঘুসিটা নেমে এল উপুড় অবস্থা থেকে সবেমাত্র চিত হওয়া সাই-এর খোলা মুখের ওপর। এরপর পরপর দুটো।

দুটো ঘুসিই পড়ল সাই-এর হাঁ করা মুখের ওপর। ওর শক্ত দাঁতের সাথে আঘাতের ফলে আঙুলের চামড়া কেটে গেল ফ্রাঙ্কের। ব্যথা পাচ্ছে ও। তবে থামল না। আরও গোটাকয়েক ঘুসি হাঁকাল আস্তাবলরক্ষকের মুখে। ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল মুখ। রক্ত আর থুতুতে ভরা মুখ দেখে শেষ পর্যন্ত নিজেরই ঘৃণা বোধ হলো ফ্রাঙ্কের। মনে হলো বমি করে ফেলবে।

সোজা হয়ে দাঁড়াল ও লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে, টলতে টলতে পিছিয়ে এল। মার থামাতে উঠে দাঁড়াল সাইও। খুনে চোখ আর মুষ্টিবদ্ধ হাত নিয়ে ফ্রাঙ্কের দিকে তাকাল। থেঁতলে যাওয়া মুখ আর নড়ে যাওয়া দাঁতের যন্ত্রণায় ঘোঁৎ করে উঠল। আবার চার্জ করে তেড়ে এল লোকটা। কাছাকাছি আসতে হঠাৎ মাথা নিচু করে ওর ঘুসি কাটাল ফ্রাঙ্ক। কিন্তু পরেরটা কাটাবার অবকাশ পেল না। পরের ঘুসিটা ওকে ডেস্কের ওপর নিয়ে ফেলল।

চট করে উঠে পড়ল ফ্রাঙ্ক। সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগেই

দেখল ফের তেড়ে আসছে টার্নার। ওই অবস্থায় ডান পায়ে লাথি চালাল সে। উরুতে লাগল টার্নারের। এক পাক ঘুরে গেল লোকটা। কিন্তু শক্তিশালী লোকটাকে তাতে কাবু করা গেল না। ফ্রাঙ্ক স্থির হয়ে দাঁড়ানোর আগে আবার তেড়ে এল। আবার লাথি হাঁকাতে গেল ও সে-অবস্থায়। কিন্তু সাই-ই তাকে আগে মারল। মারটা সহ্য করল ফ্রাঙ্ক, তারপর সাই-এর কুঁচকি সই করে ফের হাঁকাল লাথিটা। সাই-এর গলা চিরে চিৎকার বেরিয়ে এল। ব্যথা পেয়েছে বেচারা। টলতে টলতে পিছিয়ে গেল। এবার মাথা ঝাঁকাল ফ্রাঙ্ক। ডেস্কের ওপর থেকে উঠে দাঁড়াল সোজা হয়ে।

টার্নারও ততক্ষণে সামলে উঠেছে। ও আবার হামলে পড়ার জন্যে তৈরি হওয়ার আগে প্রত্যাক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে ফ্রাঙ্ককে।

কিন্তু সাই-এর ক্ষিপ্রতার সাথে পারল না। আবার মার খেল। পেটের ওপর সাই-এর ঘুসিটা বোমার মত ফাটল যেন। দম বন্ধ হয়ে এল ফ্রাঙ্কের। মাথায় যেন জ্বলে উঠল হাজার বাল্বের বাতি। চোখে অসংখ্য জোনাকি পোকা। নিজেকে মেঝের ওপর শায়িত অবস্থায় আবিষ্কার করল সে। সে-অবস্থায় চোখের কোনায় টার্নারের নড়াচড়া দেখতে পেল। মারমুখো লোকটার কাছ থেকে যথাসময়ে সরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে গড়ান দিল ও। লাফ দিয়েছিল টার্নার। ওর বুটপরা পা এসে পড়ল মেঝের ওপর। যেখানে ফ্রাঙ্কের মাথা ছিল, সেখানে ওর বুটের কাঁটাঅলা তলা পড়ে মেঝের ওপর ঘষটে গেল। টাল সামলাতে না-পেরে দড়াম করে পড়ল সে। পতনের চোটে মেঝে কেঁপে উঠল। আর কেউ হলে লড়াই ওখানেই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু লোকটা টার্নার বলেই হয়তো উঠে পড়ল। আতঙ্কের সাথে লোকটাকে আবার উঠে বসতে দেখল ফ্রাঙ্ক। ওর গায়ের শার্ট অর্ধেকটা ছিঁড়ে গেছে। ঝুলছে গলা থেকে। হামাগুড়ি দেয়ার মত করে এগোল সে। চোখ

জ্বল জ্বল করছে খুনের নেশায়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সাথে গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে জান্তব গোঙানি। চিবুক কেটে রক্ত ঝরছে টপ টপ করে।

উঠে দাঁড়াচ্ছে না লোকটা। হামাগুড়ি দিয়েই ক্রমে ফ্রাঙ্কের কাছে চলে আসছে। তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে ওর ওঠার অপেক্ষা করছে ফ্রাঙ্ক। ওর হাতে ছুরিটা ঝিক করে উঠতে যখন দেখল, তখন দেরি হয়ে গেছে। শেষ মুহূর্তে লাফ দিল সে। ওর জামার হাতায় টান পড়ল। পর মুহূর্তে মেঝেয় ধাতব শব্দ শুনল। অল্পের জন্যে হাতটা বেঁচে গেছে ওর। তবে জামার হাতা ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেল। লক্ষ্যচ্যুত ছুরিটা ফের নিজের হাতে পাওয়ার জন্যে হামাগুড়ি দেয়া অবস্থা থেকেই লাফ দিল টার্নার। কিন্তু তার আগে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রাঙ্ক। দু'হাতে ওর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। তারপর মোচড়াতে শুরু করল নির্মমভাবে।

এতক্ষণ ধরে শত্রুকে কেবল শেষ করে দেয়ার নেশাতেই মেতেছিল টার্নার। বিপদ বুঝতে পারল এবার। আতঙ্কে ওর দু'চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার মত হলো। প্রচণ্ড মোচড়ে হাত ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হতেই গলা চিরে গোঙানি বেরিয়ে এল। কপালে ঘাম জমল, দর দর করে পড়তে শুরু করল গাল বেয়ে। হাতটা ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে পাগলের মত টানাটানি শুরু করল। কিন্তু গায়ের সমস্ত জোর ঢেলে দিয়ে হাত মোচড়ানোর কাজটা করছে ফ্রাঙ্ক। বুঝতে পেরেছে, দানবের মত শক্তিশালী লোকটাকে কুপোকাত করে একই সাথে নিজের প্রাণ বাঁচানো এবং কার্যসিদ্ধি করতে চাইলে এটাই তার একমাত্র সুযোগ।

হাত ছাড়াতে না-পেরে এবার এলোমেলো ভঙ্গিতে লাথি চালাল টার্নার। এদিক ওদিক সরে গিয়ে ওর লাথি কাটাল ফ্রাঙ্ক। আরও জোরে মোচড়াতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত ব্যথা সইতে না-পেরে গলা ছেড়ে চেঁচাতে শুরু করল আস্তাবল মালিক। বারবার

চেষ্টা চালাল ফ্রাঙ্কের কবল থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে। মুক্ত হাতের পাঁচ আঙুলে খামচি মারতে গেল ফ্রাঙ্কের চোখে। কিন্তু তাতে সফল না-হওয়ায় এবার তার ডান কান ধরে টেনে ছিঁড়ে নেয়ার চেষ্টা চালাল।

এবার আরও জোরে মোচড়াতে শুরু করল ফ্রাঙ্ক। শরীরের পুরো শক্তি লাগাল কাজটার পেছনে। ছোট্ট একটা বিস্ফোরণের মত শব্দ শুনল সে। হাড় ভেঙে গেছে। কান ছেড়ে দিয়ে প্রাণঘাতী এক চিৎকার ছাড়ল আস্তাবলরক্ষক। হাতের চাপে ঢিল দিল ফ্রাঙ্ক। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগল। টলছে সে, কাঁপছে থর থর করে। সে-অবস্থায় ছুরিটার ওপর চোখ পড়তেই লাথি মেরে সরিয়ে দিল দূরে। উঠতে চেষ্টা করল টার্নার। কিন্তু ভাঙা বাহুতে চাপ পড়তে গুঙিয়ে উঠে চুপচাপ পড়ে রইল।

ভুরু কুঁচকে এক মুহূর্ত ওকে দেখল ফ্রাঙ্ক। এরপর ডেস্কের কাছে গিয়ে পিস্তলটা তুলে নিল। মারপিটের সময় ওটা হোলস্টার থেকে ছিটকে পড়েছিল ওখানে। পিস্তল হাতে কিছুক্ষণ ডেস্কের সাথে হেলান দিয়ে জিরিয়ে নিল সে। মাথার ঝিম ঝিম ভাবটুকু কাটছে আস্তে আস্তে। একটু পর বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে দরজার দিকে এগোল।

কিন্তু দরজার কাছে গিয়ে থেমে পড়ল আবার। একটা কথা মনে পড়েছে। 'শোনো,' ঘাড় ফিরিয়ে টার্নারের দিকে চাইল। 'ওই ঘোড়ার দাম আমি তোমাকে মিটিয়ে দেব, বুঝেছ, সাই? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তুমি? তোমার গোঁয়ার্তুমির জন্যেই অনর্থক বিপদটা ডেকে আনলে। এখন যদি আমি রোয়ানটা নিয়ে বেরোনোর সময় ফের চেঁচামেচি শুরু কর ঘোড়া চুরি করেছি বলে, তা হলে তোমার বিপদ আরও বাড়বে। কথাটা মনে রাখলেই ভাল করবে।'

দুশ্চিন্তা বোধ করছে ফ্রাঙ্ক। শরীরে ব্যথা-বেদনা আস্তে আস্তে

জানান দিচ্ছে। দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ধাতস্থ হওয়ার চেষ্টা করছে। ওর মনে হচ্ছে সারা শরীরে কেউ হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ভর্তা বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে যাওয়ারও তাগিদ বোধ করছে ও।

আস্তাবলের দিকে চলল ফ্রাঙ্ক। এদিকে আলো কম। হঠাৎ উজ্জ্বল আলো থেকে প্রায় অন্ধকারে এসে পড়ায় পা টিপে টিপে হাঁটতে হচ্ছে, পাছে হোঁচট না খেতে হয়। আন্দাজের ওপর না-হেঁটে এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়াল। কাছে পিঠে খড় কিংবা গোবর আছে কিনা দেখতে চাইল। তেমন কিছু দেখতে পেল না। আবার হাঁটা শুরু করতে ঘোড়ার মৃদু ঘোঁৎ শব্দ কানে এল।

যেখানে দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে মাত্র দশ ফুট দূরে রোয়ানটাকে দেখতে পেল সে। খুশি হতে গিয়েও আচমকা একধরনের অস্বস্তি জেগে উঠল তার মধ্যে। অস্বস্তিটা কেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। কিন্তু মনে হচ্ছে, তার জন্যে সামনে এমন কিছু অপেক্ষা করছে, যার সামান্যতম আশঙ্কাও থাকা উচিত নয়। ওর মনে হচ্ছে সামনে কেউ একজন আছে এবং সে লোক অবশ্যই সাই টার্নার। কিন্তু সাই যত দুর্ধর্ষই হোক, ভাঙা বাহু নিয়ে এত তাড়াতাড়ি ওর সামনে চলে আসতে পারবে না।

পিছিয়ে এল ফ্রাঙ্ক। যেখানে দাঁড়িয়েছে, সেখানে লণ্ঠনের যেটুকু আলো এসে পড়েছে, তা থেকে সরে যেতে চাইল। কিন্তু কাজটা করতে দেরি করে ফেলল ও। অন্ধকার চিরে যেন হঠাৎ আলোর বিস্ফোরণ ঘটল। কিছু একটা আঘাত করল ওকে। ধাক্কার চোটে ঘুরে গেল ও, টাল সামলাতে না-পেরে বেমক্কা ভঙ্গিতে মোচড় খেয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

সেভাবে পড়ে থেকে চোখ মেলে দেখার চেষ্টা করল। আলো-আঁধারির মধ্যে আবছাভাবে লণ্ঠনের পেছন থেকে বাড়ানো হাতটা দেখতে পেল। লণ্ঠনের আলোর সাথে গল গল করে

বেরোচ্ছে ধোঁয়া। বেমক্কা ভঙ্গিতে পড়ে আছে ফ্রাঙ্ক। একটা পা ওর নিজের শরীরের নীচে। পোড়া পাউডারের ঝাঁঝাল গন্ধে নাক কুঁচকে যাচ্ছে ওর।

ওর মুখ পুরোটাই অন্ধকারে। যে-অবস্থায় আছে, সে-অবস্থায় আস্তে আস্তে সামনে এগোনোর কথা ভাবল সে। ওর শরীরের নীচে বেমক্কা মুচড়ে পড়ে থাকা পা-টায় ঝিন ঝিন করতে শুরু করেছে। অনুভূতিটা ক্রমে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। তবু সামনে এগোনোর সাহস হচ্ছে না ওর। অদৃশ্য লোকটা প্রথমবার ওকে ঘায়েল করতে ব্যর্থ হয়েছে বটে, কিন্তু দ্বিতীয়বার ওকে সুযোগ দেয়া ঠিক হবে না।

অফিসরুম থেকে সাই টার্নারের গোঙানির শব্দ শুনল ও। বোঝা গেল, সামনে পিস্তল হাতে যে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে, সে টার্নার নয়—অন্য লোক।

ওর নিজের মুখ দিয়েও গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এল। টার্নারের সঙ্গে মারপিটে নিজেই জখম হয়েছে বেশি। কয়েক জায়গায় কেটেও গেছে। ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত ঝরতে দেখল। এতক্ষণের উত্তেজনায় খেয়াল না-করলেও এখন বুঝতে পারছে, প্রচুর রক্ত হারিয়েছে ও। দুর্বলতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে পুরো শরীর। উত্তেজনা সইতে পারছে না নার্ভ। সন্দেহ হচ্ছে, সামনের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে থাকা লোকটাকে ফাঁকি দিয়ে ছুটে গিয়ে ঘোড়ায় চড়ার মত শক্তি ওর গায়ে আর অবশিষ্ট আছে কিনা।

আচমকা গা গুলিয়ে উঠল ওর। মনে হচ্ছে হড় হড় করে বমি করে দেবে। সমস্ত ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে বমি বন্ধ রাখার চেষ্টা করতে লাগল ও। ঠাণ্ডা ঘামে পিঠের সাথে লেপ্টে আছে শার্ট। ক্লান্তিতে চোখ বন্ধ করল ও। অফিসরুম থেকে টার্নারের গোঙানি ভেসে আসছে। গোঙানির ধরনে মনে হচ্ছে বেজন্মাটা চুপচাপ শুয়ে নেই, উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে।

আড়ালের লোকটাও সম্ভবত তারই মত একই সমস্যায় আছে। লোকটা সামনে আসতে চাইছে না। চাইছে না ফ্রাঙ্কের কাছে নিজের পরিচয় ফাঁস হয়ে যাক। ওদিকে টার্নারের ভয়ও করছে মনে হয়। টার্নার এবং ফ্রাঙ্কের মাঝখানে পড়ে ক্রসফায়ারে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দিতে পারছে না। টার্নারের বর্তমান অবস্থা সম্ভবত লোকটার জানা নেই এখনও। নিজের পরিচয় ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা খুব বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠতে দিচ্ছে না তাকে। ফ্রাঙ্কের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল রাখতে চাইছে টার্নারের পরিচয়ে। তবে ফ্রাঙ্ক অফিসরুমের লণ্ঠনের আলোয় লোকটার কালো বাঁকানো কনুইয়ের অংশবিশেষ দেখতে পেল।

নিজের শরীরে অভূতপূর্ব এক শক্তি অনুভব করল ফ্রাঙ্ক। এক পাশে গড়িয়ে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। জানালার সামনে চলে গেল। ওর হাতে এখনও পিস্তল ধরা। দেশলাই বের করে জ্বালাল। হলুদ আলোয় বো ব্রীনের কালো অবয়ব চোখে পড়ল ওর।

স্বল্প আলোয় ভূতের চোখের মত লাগছে ব্রীনের চোখদুটোকে। ওগুলোয় স্পষ্ট ভয়ের চিহ্ন দেখতে পেল ফ্রাঙ্ক। ওর পিস্তলের নলের ওপর থেকে সরছে না এক মুহূর্তের জন্যেও।

ঠোঁট চাটল ব্রীন। অনেক কষ্টে যেন ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'দ্-দোহাই, ফ্রাঙ্ক। গুলি কোরো না। আ-আমি তোমার কোনও ক্ষতি করতে আসিনি এখানে। সত্যিই বলছি, ম্যান। তুমি নিশ্চয় তোমার পুরানো পার্টনারকে গুলি করবে না, তাই না?'

'তুমি এখানে কী করছ?'

ফ্রাঙ্কের কঠিন চোখের দিকে চেয়ে ভয়ে কিছুটা পিছিয়ে গেল ব্রীন। তবে ওর চোখদুটো নেকড়ের চোখের মত জ্বলছে। ফ্রাঙ্ক জানে, এটাই তার আসল রূপ। যতদিন ওর সঙ্গে ছিল,

ভালভাবেই তা টের পেয়েছে। তবে এখন সে সতর্ক। ব্রীনের ভালমানুষিতে আর ভুলবে না।

ওর ঠোঁটদুটো বাঁকা হয়ে গেল লোকটার প্রতি অবিশ্বাসে। হাত থেকে ম্যাচের কাঠিটি ফেলে দিয়ে আরেকটা জ্বালাল ও। বলল, 'সোজা হয়ে দাঁড়াও তুমি।'

ভয় সম্ভবত কিছুটা কেটেছে ব্রীনের। বুঝতে পারছে, ওকে খুন করার ইচ্ছে থাকলে এতক্ষণে তার শরীরে দু'তিনটা গুলি ঢুকিয়ে দিতে পারত ফ্রাঙ্ক। কিন্তু ও তাকে গুলি করেনি। তার মানে না-ও করতে পারে। আস্তে আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়াল ও।

'এবার ওই দোরগোড়া থেকে আলোতে এসে দাঁড়াও। আমি যেন তোমাকে দেখতে পাই।'

'আমার গায়ে গুলি লেগেছে। তুমি চাও নাকি অতিরিক্ত রক্তপাতে আমি মারা যাই?'

'যা বলেছি, তা না-শুনলে ঠিক তা-ই ঘটবে।'

বিড় বিড় করতে করতে হুকুম তামিল করল ব্রীন।

'এখন বলো, ওই টাকা কোথায়?'

'কীসব আবোল তাবোল বকছ তুমি? কীসের টাকার কথা বলছ? কেন, তুমি যেভাবে বলেছ, সেভাবেই তো...'

'আমি কীসের টাকার কথা বলছি, তা তুমি ঠিকই বুঝেছ, বো।'

'ফ্রাঙ্ক,' গলা ভেঙে এল ব্রীনের। 'খোদায় জানেন, আমি বুঝতে পারছি না তুমি...'

'তাড়াতাড়ি, বো।' লোকটার কথায় কান দিচ্ছে না ফ্রাঙ্ক। পিস্তলের ব্যারেল উঁচাল কিছুটা।

'আমি...আমি...তোমাকে সত্যিই বলছি, ভাই। এই যে, সব টাকা আমার পকেটে...' আবার একটু পিছিয়ে গেল ব্রীন। 'আমি আসলে তোমাকে...ওই টার্নার বেজন্মাটাই...'

'খামোশ! একদম মিথ্যে কথা বলবে না। আমার ভাগের টাকাটা তাড়াতাড়ি বের করে দাও। তারপর দূর হও এখান থেকে!'

ফ্রাঙ্কের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে ইতি উতি তাকাচ্ছে ব্রীন। তবে একটা হাত পকেটে ঢোকাল। ওর মুখ আবার রাগে কুৎসিত হয়ে উঠেছে। এক তাড়া টাকা বের করে গুনছে সে।

'আমার ভাগের তিন হাজার ডলার। এক পয়সাও কম নয়।'

অফিসরূম থেকে টার্নারের গোঙানি শোনা গেল। তবে ওদিকে কান দিল না ফ্রাঙ্ক। নিজের ছায়াময় জায়গা থেকে একই সাথে ব্রীন এবং বার্নের খোলা মুখ দিয়ে রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে। প্যারাডাইসে গানপ্লে অস্বাভাবিক কিছু নয়। খুব একটা পাত্তা দেয় না কেউ। তবে বলা যায় না, কোনও গর্দভ হয়তো হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে উঠতে পারে কী ঘটেছে জানার জন্যে। কিন্তু ফ্রাঙ্ক এ-মুহূর্তে কোনওরকম ঝামেলা চাইছে না।

গোনা শেষ করে বিরক্তভাবে এক তাড়া নোট আলাদা করল ব্রীন।

'মেঝের ওপর রাখো ওটা। তারপর বাকিটাও বের করো।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল ব্রীনের। দুই চোখ বিস্ফারিত হলো। দুই সেকেণ্ডের জন্যে স্রেফ বোকা বনে গেল লোকটা। অবিশ্বাস ও ঘৃণায় দু'চোখ কুঁচকে গেল ওর। আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি তোমাকে তোমার ভাগের টাকা দিয়েছি। কিন্তু তুমি সব টাকা চাইছ কী জন্যে?'

পিস্তলের নল উঁচাল ফ্রাঙ্ক, বুড়ো আঙুলে হ্যামার ঠেলে দিল পেছনে।

ব্রীনের মুখ দেখে মনে হলো, তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়বে ফ্রাঙ্কের ওপর। ঈগল যেমন শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে পাখা মেলে দেয় দু'দিকে, তার দু'হাতও তেমনি প্রসারিত হলো।

বুকের পেশী ফুলে উঠে জামা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার মত হলো। ওর দু'চোখে স্রেফ খুনে দৃষ্টি। ফ্রাঙ্কের বুক চিরে রক্ত পান করতে পারলেই যেন খুশি হতো ও। কিন্তু ফ্রাঙ্কের হাতের উদ্যত পিস্তল ওকে মত পাল্টাতে বাধ্য করল।

শেষ পর্যন্ত নিজের পকেটেই যেন ছোঁ মারল ওর ডান হাত। টাকাটা বের করে ছুঁড়ে দিল মেঝেয়। 'তুমি এটা নিয়ে বাঁচতে পারবে না। তুমি এটা নিয়ে এই পাহাড়টাও পেরোতে পারবে না।'

'বেশ, শুনে খুশি হলাম। এবার গা থেকে কাপড়চোপড় সব খোলো।'

'মানে? তুমি আমাকে ন্যাংটো হতে বলছ?'

'আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না, বো। টাকাগুলো পকেটে ঢোকাও। তারপর শার্টটা খুলে রেখে বেরিয়ে যাও এখান থেকে।'

'তার মা...'

পিস্তল হাতে এবার সামনে এগোল ফ্রাঙ্ক। অবস্থা বেগতিক দেখে আর দেরি করল না ব্রীন। হ্যাঁচকা টানে গা থেকে শার্টটা খুলে ফেলল। তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

যতটা সম্ভব ক্ষতের পরিচর্যা করল ফ্রাঙ্ক। মিনিট তিনেক পরে ব্রীনের জামা পরে নিয়ে টার্নারকে ডাকল ফ্রাঙ্ক, 'সাই, তোমার রোয়ান আর সাজের দাম হিসেবে ছয়শ' ডলার রেখে যাচ্ছি চৌকাঠের ওপর।'

বেরিয়ে পড়ল ও। রোয়ানটাকে খুলে নিল রেইল থেকে। পেছনে তাকাল না আর। রোয়ানের পিঠে চড়ে পশ্চিমে চলল।

# পাঁচ

পশ্চিমে গেলেই যে বাঁচতে পারবে, তা এক মুহূর্তের জন্যেও ভাবছে না ফ্রাঙ্ক। টার্নারের অফিসে যা করেছে, তা যেমন নিজেকে আস্তাবলরক্ষকের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে, তেমনি সাময়িক আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়ে কিছুটা সময় পাওয়ার জন্যেও। এতে কেবল বো ব্রীনই নয়, অন্য যারা তার পিছু ধাওয়া করতে উৎসাহী হয়ে উঠবে, তারাও কিছুটা দ্বিধায় পড়ে যাবে বলে আশা করছে ও। তবে এও জানে যে, তাতে খুব বেশি সুবিধে আদায় করতে পারবে না।

একটা কথা ফ্রাঙ্ক স্পষ্ট বুঝতে পারছে। সে আসলে বেশ গুরুতর সমস্যায় পড়েছে। ম্যাক্সওয়েল লোকটা খুন হয়েছে স্রেফ বিনা কারণে। লোকটা একটা মাথামোটা গর্দভ। নিজের দোষেই এই চরম পরিণতি জুটেছে তার কপালে। কিন্তু সে-হিসেব সাধারণ মানুষ করবে না। তারা খুনটাকেই বড় করে দেখবে। পারকিন্সের কাছ থেকে খবরটা শোনার পর সবাই উঠে পড়ে লাগবে ফ্রাঙ্ক সেলজারের বিরুদ্ধে। আইনের লোক ছুটবে রশি হাতে, ধরতে পারলে স্রেফ ঝুলিয়ে দেবে। কারণ এটাকে তারা আইনের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখবে। কখনও খতিয়ে দেখতে চাইবে না যে, খুনটার পেছনে ফ্রাঙ্কের আদৌ হাত আছে কিনা।

এটা একটা দিক, সাধারণ বা সুশীল নাগরিকদের

প্রতিক্রিয়া। অন্য দিকটা হলো, এ থেকে ফায়দা ওঠাতে চাইবে বো ব্রীন নামের সুযোগসন্ধানী দুষ্ট লোকটা। টার্নার হয়তো ভুলে যেতে পারবে নিজের লাঞ্ছনার কথা। কিন্তু ব্রীন ভুলবে না। সে নিজের পিঠ বাঁচানোর আশায় ফ্রাঙ্ককে আইনের হাতে তুলে দেয় তার পেছনে ইন্ধন হয়ে কাজ করবে।

নিজের সমস্যা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ফ্রাঙ্ক। সে কিছু মূল্যবোধে বিশ্বাসী। ওগুলো মেনেও চলতে চায়। তাই বলে আবার এমন গোঁড়ামিও তার মধ্যে নেই যে, নীতির জন্যে জান দিয়ে ফেলবে। কেউ যদি ওকে স্বেচ্ছায় বিপদে ফেলতে চায়, সেও চেষ্টা করবে সে-বিপদ কাটিয়ে উঠতে। এরপর ওই লোককে বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেয়ার মত ঔদার্য সে দেখাতে যাবে না। তবে এ-মুহূর্তে সে যে-অবস্থায় আছে, তাতে মোকাবেলা করার জন্যে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানোর চেয়ে আপাতত পালানোটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

সুতরাং এখন পালানোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল সে। তা ছাড়া মানুষ খুন না-করার ব্যাপারে ব্যক্তিগত অনীহাও ওর জন্যে পরিস্থিতির মোকাবেলা করাটা দুঃসাধ্য করে তুলতে পারে। এখানে থাকলে ওকে একই সঙ্গে আইন এবং বো ব্রীন দুই পক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। সেখানে নিজের নিরাপত্তার জন্যে খুনোখুনি অনিবার্য হয়ে উঠবে। কিন্তু ফ্রাঙ্ক খুনি হতে চায় না। জানে, খুন করার পরিণতি হলো নিজেও খুন হয়ে যাওয়া।

ওকে এখন গা ঢাকা দিতে হবে। শরীরের এ-অবস্থায় অনবরত ঘোড়ার পিঠে থাকাও সম্ভব নয়।

বো ব্রীনের ছোঁড়া গুলি ওর শরীরের বিঁধেছে। তবে মনে হয় খুব বেশি ভেতরে ঢোকেনি। দূর থেকে ছোঁড়া গুলি টার্গেটে লেগে কমজোর হয়ে পড়েছে। তবে নিজের শরীরের অবস্থা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে ও। বুঝতে পারছে সারা গা কাঁপিয়ে জ্বর

আসছে। আর জ্বর এলে কেবল একটা কাজই করতে তার ভাল লাগবে। সেটা হলো মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়া। কিন্তু এখানে চিৎ হয়ে শুয়ে বিশ্রাম নেয়ার মত অবস্থা এখন ওর নয়।

হতাশায় খিস্তি আওড়াল ফ্রাঙ্ক। এ-তল্লাটে থাকাটাই এখন ওর জন্যে হবে আত্মহত্যা করার শামিল। সে জানে, মাত্র দিন দুয়েকের মধ্যেই পার্বত্য এই এলাকা মানুষ শিকারীদের বিচরণভূমিতে পরিণত হবে। স্টেজকোচে ডাকাতি এবং একজন ইউএস মার্শালকে খুন করার দায় পুরোটাই তার ওপর বর্তাবে। বো ব্রীন অবশ্য আইনের কাছে গিয়ে ওর নামে নালিশ করতে পারবে না। তবে আড্ডামুখর কোনও বাররুমে কৌশলে ইউএস মার্শাল ম্যাক্সওয়েলের খুনের সাথে তার নাম জড়িয়ে গুজব ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে ছাড়বে না। কিছু কিছু লোক সে-গুজবে কানও দেবে।

তবে ফ্রাঙ্ক ব্রীনের চেয়ে বেশি ভয় করছে পারকিন্সকে। খুন যে-ই করুক, স্টেজকোচ ডাকাতিটা যে ফ্রাঙ্ক সেলজারের নেতৃত্বে হয়েছে, তা যথাসময়ে জানিয়ে দিতে কসুর করবে না বুড়ো ড্রাইভার। শোনামাত্র আইন ওর পেছনে লাগবে আঠার মত। ইউএস মার্শাল ম্যাক্সওয়েলকে হত্যার দায়ে সেলজারের কোমরে দড়ি না-পরানো পর্যন্ত থামবে না। সুতরাং এখন ওকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সে কি পালাবে, নাকি আইনের হাতে ধরা পড়ার জন্যে এখানে অপেক্ষা করবে?

স্টেজ ড্রাইভার পারকিন্স ঘটনাটা বলার সময় ডাকাত লোকটা কীধরনের ঘোড়ায় চড়েছিল আর তার পরনে কোন্ ধরনের পোশাক ছিল, তা অনায়াসে মনে করতে পারবে। সুতরাং প্রিয় বাকস্কিনটাকে তার ফেলে যেতেই হবে। আইনের লোকেরা টিম ফলির রেস্তরাঁর পেছনে ঝরনার ভেতর খুঁজে পাবে ঘোড়াটাকে।

একটা জিনিস বুঝতে শিখেছে ফ্রাঙ্ক। দুর্বলমনা মানুষের ঠাঁই দুনিয়াতে নেই। ওর উচিত ছিল বো ব্রীনের নোংরা মাথাটায় একটা গুলি ঢুকিয়ে দেয়া। তারপর নিজের কাপড়চোপড় পরিয়ে দিয়ে বাকস্কিনের লাগামটা ওর হাতে ধরিয়ে দিলেই চলত। ল্যাঠা তা হলে ওখানেই চুকে যেত। এখন আর ওকে নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার হতো না। কিন্তু ফ্রাঙ্ক সেটা পারেনি, সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও।

তার বদলে এখন পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে সে বরং ব্রীনের সুবিধে করে দিয়ে যাচ্ছে। ওর অনুপস্থিতিতে ব্রীন ওর বিরুদ্ধে যা নয়, তাও লাগাবে। আর যেহেতু ফ্রাঙ্ক তল্লাট ছেড়ে পালিয়েছে, মানুষ তাতে বিশ্বাস করতে একটুও দ্বিধা করবে না। ভাববে, দোষী না-হলে লোকটা পালাল কেন?

রোয়ানটার দিকে চাইল ও, থামাল ওটাকে। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল। অবাক হলো কিছুটা। মাত্র দুই কি তিন মিনিট এসেছে সে ঘোড়াটা নিয়ে। এর মধ্যে বেশ অনেকটা দূরে চলে এসেছে শহর থেকে। শহরটা এখন সে যেখানে আছে, সেখান থেকে নীচে। চমৎকার দেখাচ্ছে ছেড়ে আসা শহরটাকে। রাতের আঁধারে মিট মিট করে মুক্তোর মত জ্বলছে আলো। পেছনে শব্দ শোনার জন্যে কান পাতল ফ্রাঙ্ক। কিন্তু নীরব নিথর রাতের পটভূমিকায় কোনও শব্দ পাওয়া গেল না।

আবার পরিস্থিতি পর্যালোচনায় মন দিল ফ্রাঙ্ক। আপাতত কিছুক্ষণ সে নিজেকে নিরাপদ বোধ করতে পারে। ব্রীন লোকটা ন্যাংটো বেরোবে না। আগে কাপড়চোপড় পরে নেবে। এতে কিছুটা সময় নষ্ট হবে ওর। তবু ফ্রাঙ্ক সেলজার পালাবার আগে যে ওর পরন থেকে জামা-কাপড় খুলে নিয়েছে, চাইবে না অধীনস্থ লোকেরা তা জানুক। কাপড় পরা শেষ করে তারপর সম্ভবত নিজের লোকদের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

ওর নিজের লোকেরা ওর সাথে মিলিত হওয়ার পর ওদের স্রেফ একটা গল্প শুনিয়ে দেবে সে। বলবে, ফ্রাঙ্ক তাদের মাটির নীচে লুকিয়ে রাখা টাকা-পয়সা আর সোনাদানা নিয়ে পালিয়েছে। লোকগুলো তা বিশ্বাস করবে। এরপর যদি কখনও ফ্রাঙ্কের সাথে দেখা হয়, কোনও কথাই কানে তুলবে না ওরা। সোজা খুন করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আর ওর লোকেরা এসে পৌঁছার আগে যদি আইনের লোকেরা এসে হাজির হয়, তা হলেও সেটাকে কাজে লাগাবে ব্রীন। ওদের সে এমনভাবে বুঝিয়ে দেবে, যাতে তারা কার্লি ফ্রাঙ্ক নামের ভয়াবহ লোকটার পেছনে পাগলা কুকুরের মত হন্যে হয়ে ছুটতে শুরু করে। কার্লি ফ্রাঙ্কের চেহারার বর্ণনা চাইলেই যে কারও কাছ থেকে পাবে ওরা। জানতে পাবে মার্শালের খুনি লেজ তুলে ভেগেছে পশ্চিমে। আর ওর ঘোড়াটা, তাদের কারও কারও নিশ্চয় মনে পড়ে যাবে যে, দেখতে যেন টার্নারের সাদামুখো রোয়ানটার মত।

ব্রীন হয়তো একটা পথ খুঁজে বের করবে, নইলে নিজেই তৈরি করে নেবে।

এ-মুহূর্তে একটা মাত্র সুযোগই আছে ফ্রাঙ্কের সামনে। ম্যাক্সওয়েলের খুনি ডাকাতদলের সন্ধানে আইনের লোকেরা ছুটে আসার আগে যদি সে এই পাহাড়ি অঞ্চল ছেড়ে পুবে অনেকদূরে চলে যেতে পারে, তা হলে ব্রীন তাদের কাছে লাগাবার পরও খুব একটা সুবিধে করতে পারবে না ওরা। কিংবা সেটা যদি সম্ভব না-ও হয়, তা হলে তাকে এমন কোনও জায়গায় গিয়ে লুকোতে হবে, যেখানে ইতোমধ্যে আইনের লোকেরা খুঁজে এসেছে। কিন্তু মনে মনে অনেক ভেবেও সেরকম জায়গা খুঁজে পেল না। অগত্যা পুব দিকেই যেতে হবে এই পাহাড়ি এলাকা ছেড়ে।

পুবে যেতে হলে ফ্রাঙ্ককে যেতে হবে প্যারাডাইসের পাশ

দিয়েই। কেউ যদি সেটা জানতে পারে, তা হলে পথে স্রেফ ফাঁদ পেতে বসে থাকবে। সেরকম হলে ফ্রাঙ্ক একটা রোস্ট করা রাজহাঁসের মতই ওদের কব্জায় গিয়ে পড়বে।

কিন্তু পশ্চিম দিকে যাওয়ার মত প্রস্তুতিও নেই ওর। ওর কাছে রাইফেল নেই। যেটা আছে, সেটা একটা সিক্সগান। কিন্তু দু'তিন রাউণ্ডের বেশি ছোঁড়ার মত গুলিও নেই তাতে। তা ছাড়া রাইফেলধারী প্রতিপক্ষের সামনে সিক্সগানের গুলি ছোঁড়া পাখি মারার বন্দুক দিয়ে সিংহ শিকারে যাওয়ার মতই হাস্যকর।

খিস্তি আওড়াল ফ্রাঙ্ক। টের পেল মুখে রক্ত জমতে শুরু করেছে। রোয়ানটার পেটে হাঁটুর গুঁতো লাগাল। তারপর যে-পথে এসেছে, সে-পথে ফেলে আসা ক্যাম্পের দিকে ছোটাল ওটাকে। সতর্ক চোখে চারদিকে তাকাচ্ছে সে। মুখভাব কঠিন।

বিনা ঝামেলায় ক্যাম্পের পশ্চিম পাশে চলে গেল ফ্রাঙ্ক। রাস্তার বাম পাশে ঘোড়া থামাল। ওর আর রাস্তার মাঝখানে গোটা তিনেক কুটির। চাঁদের আলোয় ক্যারাডাইনের সামনের অংশটা দেখা যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে চলল ও। একটা ঘরের পেছনে ছাইয়ের গাদার পাশে এসে দাঁড়াল। সামনের রাস্তার ওপাশে টার্নারের আস্তাবলে যাওয়ার পথ।

অন্ধকারে দৃষ্টি ভাল চলে না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে গালশের দেয়াল ঘেঁষে পুবে যাওয়ার পথটা ঠাহর করে নিল। তারপর ওদিকে নিয়ে চলল ঘোড়াটাকে। দুই কান খাড়া করে রেখেছে। যে কোনও অস্বাভাবিক শব্দ শোনার জন্যে তৈরি।

চারদিকে ঝিঁঝি পোকার চিৎকার। গাছের পাতায় বাতাসের ফিসফিস। অস্বস্তি বোধ করছে ফ্রাঙ্ক। তবে একই সঙ্গে এসব শব্দের কারণে ওর ঘোড়ার খুরের মৃদু শব্দও যে খানিকটা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, সেটা ভেবে স্বস্তি পাচ্ছে কিছুটা।

ঘোড়ার গতি আরও কমিয়ে আনল ও। এখন প্রায় হেঁটে চলেছে ঘোড়াটা। সামনে কোথাও বাকস্কিনটাকে বেঁধে রেখেছে ফ্রাঙ্ক। কান খাড়া। রোয়ানের খুরের শব্দে স্বজাতির আগমন টের পেয়ে বাকস্কিনটা আপ্যায়নের সুরে ডেকে উঠতে পারে হয়তো।

তবে ভয়ও হচ্ছে ওর। বাকস্কিন যদি ওদের আভাস পেয়ে ডেকে ওঠে, তা হলে কিন্তু বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে ওর জন্যে। কেউ হয়তো ঘাপটি মেরে থাকতে পারে ওর অপেক্ষায়। বাকস্কিনের আওয়াজকে ওর আগমন সংবাদ হিসেবে ধরে নিয়ে আচমকা হামলা চালিয়ে কাবু করে ফেলতে পারে ওকে।

কিন্তু এই ঝুঁকিটা ওকে নিতেই হচ্ছে। চলাচলের রাস্তা দিয়ে গেলে ওকে এর চেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্য দিয়ে যেতে হতো। ওকে খুঁজছে, এমন কারও চোখে পড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল তাতে। আর পুবে যেতে হলে ওর জন্যে এটাই একমাত্র পথ।

হোলস্টার থেকে সিক্সগানটা বের করে নিল ফ্রাঙ্ক। জানে, ওর যে চলার পথ, সে-পথে বন্ধু বলতে কেউ নেই। একমাত্র নিজের কোমরের অস্ত্রটাই ওর আপন, বিপদে আপদে বন্ধু। ওকে বেঁচে থাকার সাহস জোগাতে পারে কেবল এটাই। যে কোনও জায়গায়, যে কোনও অবস্থায়। আর আউটল যে, তার নিজের কোনও এলাকা নেই, নিজস্ব কোনও শহর নেই।

পিস্তলটা ফের খাপে ঢোকাল ও। রোয়ানের পাঁজরে হাঁটুর মৃদু গুঁতো লাগাল। আগের চেয়ে গতি বাড়াল রোয়ান, এগিয়ে চলল।

বাতাসের গতি বেড়ে গেছে খানিকটা। গাছের পাতায় শির শির ধ্বনি আর দূরে ঝরনার কুল কুল শব্দ। বাকস্কিনের পিঠে রেখে আসা উইনচেস্টারটার কথা ভাবল ও। ওই অস্ত্রটা দরকার ওর। কিন্তু সমস্যা হলো, বাকস্কিনের কাছে যেতে চাইলে ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছাড়াও সময়েরও একটা ব্যাপার আছে। ওর

হাতে সময় একদম নেই। পারকিন্সের মুখে স্টেজ ডাকাতির খবর পেয়ে এতক্ষণে হয়তো পাসিদল কাজে নেমে পড়েছে। প্রথমেই তারা ছুটে আসবে এখানে। এখানকার পাহাড়-জঙ্গল চষে ফেলতে শুরু করবে খুনি ডাকাতদের খোঁজে। দু'মুখো সাপ বো ব্রীন তাদের পথ দেখাবে। নিজে ভালমানুষ সেজে বসে থাকবে। বিভ্রান্ত করে দেবে পাসিদলকে। আর তার আগে যদি তার লোকেরা এসে পড়ে, তা হলে উল্টো সিধে বুঝিয়ে লেলিয়ে দেবে ওদের ওর পেছনে। এতজনের বাধা পেরিয়ে পালিয়ে যাওয়াটা দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে ওর জন্যে।

শহরের সীমানা পেরিয়ে গিয়ে রোয়ানের গতি বাড়িয়ে দিল ফ্রাঙ্ক। এগিয়ে চলল পুবে।

প্রায় পৌনে একঘণ্টা চলার পর ঝরনার পাড়ে পৌঁছল রোয়ান। পানির গন্ধ পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল ওটা। আরও কিছুদূর সামনে গিয়ে একটা ঢালু জায়গা দেখে ঘোড়াটাকে নামিয়ে দিল ফ্রাঙ্ক ঝরনার ভেতরে। তারপরই সামনে তাকাতে দেখতে পেল লোকগুলোকে। সঙ্গে সঙ্গে বাজখাঁই গলায় হুকুম এল, 'কে তুমি? সামনে এগিয়ে এসো। পালাবার চেষ্টা কোরো না যেন। তা হলে গুলি করে দেব।'

থামল না ও। সরাসরি এগিয়ে চলল লোকগুলোর দিকে। জানে, এখন আর পালানো কিংবা লোকগুলোকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তার চেয়ে তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করাই ভাল। লোকগুলো নিশ্চয় তার অপেক্ষায় এখানে দাঁড়িয়ে নেই। কিন্তু ওদের সামনে যখন পড়েই গেছে, তখন আলাপ-পরিচয় করে নেয়ার চেষ্টা করাটাই হবে তাদের সন্দেহ না-জাগিয়ে সময় বুঝে আলগোছে সরে পড়ার সবচেয়ে নিরাপদ উপায়।

# ছয়

লোকগুলোর কাছাকাছি গিয়ে লাগাম টানল ও। ধীরে সুস্থে ঘোড়া থেকে নেমে ওটাকে পানি খাওয়ার সুযোগ করে দিল। লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর শুকনো মুখে সম্ভাষণ জানাল, 'শুভ সন্ধ্যা!'

তারাপরা লোকটা রাইফেল সরাল না। তবে মাথা নেড়ে ওর সম্ভাষণের প্রত্যুত্তর দিল। মোটাসোটা গাঁট্টাগোট্টা চেহারা লোকটার। বেঁটেখাটো। মাথায় ধূসর চুল, অসংখ্য রেখায় ভরা মুখ। দু'কাঁধ ঢালু হয়ে নেমে এসেছে নীচের দিকে। দেখলেই বোঝা যায় খেটে খাওয়া লোক। বছরের পর বছর ধরে তিরিশ ডলার মাইনের চাকরি করে চলেছে। 'শুভ সন্ধ্যা।' মুখেও আওয়াজ দিল। ফ্রাঙ্কের মতই শুকনো স্বরে বলল, 'কোত্থেকে আসা হচ্ছে, মিস্টার? বলতে আপত্তি আছে?'

'না,' খোঁচা মারার লোভ সামলাতে পারল না ফ্রাঙ্ক। 'তোমরা এত বিনীত ভঙ্গিতে জানতে চাইছ যে, জবাব না-দিয়ে পারা যাচ্ছে না। আমি প্যারাডাইস থেকে আসছি।'

নেতা লোকটার পাশের জন বিড় বিড় করে কী যেন আওড়াল। নেতা বলল, 'এত রাতে পাহাড়-পর্বতে লোকজন হাঁটে না। ঘুরে বেড়ানোর জন্যে ঠিক সময় বেছে নিয়েছ বলে মনে হচ্ছে না।'

জবাব দিল না ফ্রাঙ্ক। রোয়ানটাকে টেনে নিল পানি খাওয়া

থেকে। নেতার মুখ আরও কঠিন দেখাচ্ছে এখন। বাজখাঁই গলায় জিজ্ঞেস করল, ‘কোথায় যাচ্ছ তুমি, মিস্টার?’

‘বাড়িতে।’

‘সেটা কোথায়?’

ওরা সবাই কড়া নজর রেখেছে ওর ওপর।

‘রকিং অ্যারো। চেন তো জায়গাটা? না-চিনলে শুনে নাও। পাহাড়ের ওপাশের আউটফিটটাকেই রকিং অ্যারো নামে ডাকে সবাই। প্রচুর ঘাস, গরু চরানোর অনেক সুবিধে...’ থেমে পুরো দলটাকে দেখল। ‘প্রচুর বৃষ্টিও হয় ওখানে। অনেক ঘাস।’

‘প্যারাডাইসে কী করছিলে?’

খাপছাড়া প্রশ্ন করছে লোকটা। বুঝতে পারছে ফ্রাঙ্ক। তবে অবাক হলো না। ভাব দেখাল, এসব প্রশ্নে ভীষণ বিরক্ত হচ্ছে।

লাগামে ঢিল দিয়ে ব্রীনের ভেস্টের পকেট থেকে তামাক আর কাগজ বের করে সিগারেট বানাতে শুরু করল। থুতু ফেলল শব্দ করে। তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘হঠাৎ আমাকে নিয়ে এতটা কৌতূহলী হয়ে পড়ার কারণটা বলবে কি?’

এক মুহূর্ত মৌন রইল নেতা। তারপর গম্ভীর স্বরে বলল, ‘তুমি কৌচিস কাউন্টির শেরিফের সঙ্গে কথা বলছ, ম্যান? আমি...’

‘অ।’ বোঝার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ফ্রাঙ্ক। ‘ধরে নিচ্ছি সদলবলে ভালুক শিকারে বেরিয়েছ। তোমাদের সাথে গোলাবারুদের বহর দেখে সেরকম মনে হচ্ছে। কিংবা হতে পারে...’

‘খুব বেশি কথা বলছ তুমি, মিস্টার!’ রেগে গেল শেরিফ। ‘ভালুক-টালুক নয়, আমরা একটা খুনির খোঁজে বেরিয়েছি।’

‘আরে! সে কথা আগে বলনি কেন!’ অবাক হওয়ার ভান করল ফ্রাঙ্ক। ‘বাকস্কিনের পিঠে চড়া লম্বামতন একটা লোক তো?’

এতক্ষণে আগ্রহ দেখা গেল শেরিফের চোখে। 'দেখেছ? কোথায়? আচ্ছা, লোকটা দেখতে কেমন বলো তো? ও কি কিছু একটা বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল?'

'হ্যাঁ, লোকটার হাতে একটা রাইফেল দেখেছিলাম। ওটাই নিয়ে যাচ্ছিল বহন করে। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিল লোকটা। দেখে মনে হচ্ছিল পেছন থেকে শয়তান নিজেই তাড়া করে আসছে ওকে। বারবার পেছন ফিরে দেখছিল। হ্যাঁ, এ-অঞ্চল থেকেই পালাচ্ছিল মনে হয়েছে।'

'হ্যাঁ, ওই লোক বলেই মনে হচ্ছে,' সঙ্গের একজন বিড়বিড় করল।

নীচের ঠোঁট কামড়াচ্ছে শেরিফ। সামনের দিকে ঝুঁকল উত্তেজিত ভঙ্গিতে। 'আচ্ছা, কী রকম পোশাক পরেছিল লোকটা?'

যতটা সম্ভব সত্যি কথা বলল ফ্রাঙ্ক। ব্রীনের পোশাক পরার আগে যে পোশাক ছিল ওর নিজের পরনে, সেগুলোর বর্ণনাই দিল। পোশাকগুলো এখন আর কারও গায়ে নেই। ওগুলো এখন ফলির রেস্তরাঁর পেছনে ঝরনার তলায়। নিজেই ফেলে এসেছে ও।

সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইয়ের কাঠিটা পানিতে ফেলে দিল ফ্রাঙ্ক। 'লোকটার চোখের রঙটা মনে পড়ছে আমার। হলুদ। বেড়ালের চোখের মত।'

চকিতে একে অপরের দিকে চাইল শেরিফ আর তার লোকেরা। সবচেয়ে কাছের দু'জন সামান্য কাঁধ ঝাঁকাল। দশাসই চেহারার একজন এক কদম সামনে বাড়ল ঘোড়া নিয়ে। 'আর সব বাদ দিয়ে ওর চোখের রঙ কীভাবে মনে রইল তোমার?' খেঁকিয়ে উঠে জানতে চাইল।

'কোনও লোক যদি তোমার দিকে .৪৫ উঁচিয়ে ধরে তখন তোমার চোখ ওর চোখে ছাড়া আর কোন্দিকে তাকাবে বলো

তো?’

‘তার মানে তুমি বলতে চাইছ, লোকটা তোমার দিকে পিস্তল উঁচিয়ে ধরেছিল?’

‘একজন খুনির কাছে,’ বিরক্তি ঝরল ফ্রাঙ্কের গলা থেকে, ‘তুমি আর কিছু আশা করেছিলে নাকি?’

লোকগুলো ফের নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল।

সতর্ক চোখে ওদের দেখছে ফ্রাঙ্ক। আচমকা কেমন একটা অনুভূতি হলো ওর। হঠাৎ মাথাটা যেন ফাঁকা বোধ হলো। চোখের সামনে সব কিছু অস্পষ্ট আর ধোঁয়াটে লাগছে। চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত রাত, ঝরনা, গাছপালা, চারপাশের লোকজন–সব যেন উধাও হয়ে গেল। মাথা ঘুরে স্যাডল থেকে পড়ে যাওয়ার ভয়ে স্যাডল হর্ন আঁকড়ে ধরল দু'হাতে।

একটু পরে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল আবার। আবার সামনের লোকগুলোকে পরিষ্কার দেখতে পেল। তির্যক্ চোখ মেলে তাকিয়ে আছে ওরা। লোকগুলোর চাউনি ভাল লাগল না ফ্রাঙ্কের। ওরা কেন ওভাবে তাকাবে? বিশেষ করে নেতা লোকটা?

‘তা তুমি কী করলে তখন?’ শেরিফ জানতে চাইল।

‘আমিও দু'বার গুলি করলাম। মনে হয়, একটা লেগেছেও । সম্ভবত কনুইতে। ইয়ে...কী করেছে ওই লোক? ব্যাংক ডাকাতি নাকি?’

‘ক্রাউন কিং-এর পে রোল নিয়ে আসা স্টেজে হামলা চালিয়েছে। একটা ঝোপের আড়ালে দলবল নিয়ে লুকিয়েছিল লোকটা। স্টেজের পাহারায় থাকা গার্ডটা ছিল নতুন। এসবের হাল অবস্থা তেমন বুঝত না। ওরা স্টেজ থামিয়ে বাক্সগুলো নামাচ্ছিল। নতুন গার্ড নিজের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে গুলি চালাতে চেয়েছিল। কিন্তু টেরও পায়নি হঠাৎ কোত্থেকে এসে গুলি লেগেছে। মারা গেছে লোকটা।’

BanglaBoi.org

পুরো দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠল ফ্রাঙ্কের। দুই চাকার মাঝখানে পড়ে আছে গার্ডের লাশ। সারা জীবনেও দৃশ্যটা ভুলতে পারবে না সে। চোয়াল জোড়া শক্ত হয়ে উঠল নিজের অজান্তেই। মুখের ভেতরটা তুলোর মত শুকনো ঠেকতে লাগল।

'এই লোকটাই কি খুন করেছে ওকে?'

'ও করুক আর ওদের মধ্যে যে-ই করুক খুনটা,' শেরিফ বলল কাটখোট্টা স্বরে। 'আমি তাতে কোনও পার্থক্য দেখছি না। যে-লোকটাকে খুন করা হয়েছে, সে একজন ডেপুটি মার্শাল। আইন ব্যাপারটাকে সরাসরি নিজের ওপর হামলা হিসেবে দেখছে। আইনের লোকেরা ব্যাপারটাকে নিজেদের অস্তিত্বের ওপর হুমকি হিসেবে নেবে।'

ঘোঁৎ করে উঠল শেরিফের লোকেরা। বোঝা গেল, শেরিফের বক্তব্যের সাথে তাদের দ্বিমত নেই। দু'চোখ জ্বলে উঠল শেরিফের। 'কোন্ পথে যেতে দেখেছ লোকটাকে?'

'উমম...সেটা ঠিক বলতে পারব না। তবে দেখে মনে হয়েছে, ওর গন্তব্য হয়তো প্যারাডাইস।'

'সেটা তুমি কীভাবে বুঝলে?' ঘেউ ঘেউ করে উঠল শেরিফের এক সঙ্গী। 'এমনও তো হতে পারে, সে তোমার চোখে ধুলো দেয়ার জন্যে ভাব দেখিয়েছে যে, প্যারাডাইসে যাচ্ছে। পরে হয়তো চার্লসটনের দিকে গেছে।'

'চার্লসটনে কী আছে? গুটিকয়েক শ্রী-ছাদহীন ঘর-বাড়ি ছাড়া?' বিরক্ত হলো ফ্রাঙ্ক। 'ওখানে গিয়ে শুধু শুধু সময় নষ্ট করবে কেন সে?'

'লুকানোর জন্যে হয়তো অমন জায়গাই খুঁজছে ও,' মন্তব্য করল লোকটা।

প্রতিবাদ করতে গিয়ে থেমে গেল ফ্রাঙ্ক। *কী হয়েছে আমার? ওরা যা খুশি তা ভাবুক না! আমার কী আসে যায়? আমি কেন শুধু*

*শুধু এ নিয়ে কথা বলছি?* ভাবল সে।

ও নিজেই এই লোকগুলোকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। সুযোগ খুঁজছে এ-এলাকা ছেড়ে চলে যেতে। এই বোকার হদ্দগুলো যদি চার্লসটনে গিয়ে দেখতে চায় দেখুক না। সেটা বরং ওর পালানোর জন্যে আরও ভাল।

কিন্তু সমস্যা হলো, এরা যদি লোকটাকে খোঁজার জন্যে ওকেও সাথে নিয়ে যেতে চায়! ষাঁড়ের মত বিশাল অস্ত্রধারী লোকটা যেভাবে সরু চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, তাতে মনে হয় সে-প্রস্তাবই করে বসবে। লোকটা যেন ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ইঞ্চি ইঞ্চি করে মেপে নিচ্ছে। ফ্রাঙ্ক বুঝতে পারছে, সময় যতই গড়াচ্ছে, ততই বিপদের মাত্রা বাড়ছে ওর জন্যে। লোকগুলোর সঙ্গে কৌশলে খেলার সিদ্ধান্ত নিল সে।

ষাঁড়ের মত লোকটার চাউনি উপেক্ষা করে শেরিফের দিকে চাইল। থুতু ফেলল। 'লোকটাকে ধরার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে নিশ্চয়?'

ষাঁড়মার্কা লোকটার মত সরু চোখে ওর দিকে চাইল শেরিফও। স্যাডলের ওপর নড়ে চড়ে বসল। 'কেন, তুমি কি ভাবছ ওকে খুঁজে বের করতে পারবে?'

'আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছি, শেরিফ। লোকটাকে ধরতে পারলে পুরস্কার আছে, না?'

'তা আছে। বাটারফিল্ড বলেছে, ওরা দেবে। ফেডারেল গভর্নমেন্টও দেবে হয়তো। কিন্তু...

'তা বেশ তো। আমি যদি তোমার সাথে আসি তা হলে তুমি আমাকে কত দেবে?'

'ধ্যাৎ!' এবার শেরিফের সঙ্গীদের আরেকজনের বিরক্তি প্রকাশ পেল। 'এখানে বাজে কথায় সময় নষ্ট...'

'কত?' পাত্তা দিল না ফ্রাঙ্ক লোকটাকে।

'এখানে আরও লোক আছে... আমতা আমতা করল শেরিফ। 'ওরা ওদের ভাগেরটা পাবে।'

'আমিও তোমাদের মত খুঁজে বেড়াচ্ছি ওই লোককে।'

শেরিফকে দেখে মনে হচ্ছে ফ্রাঙ্কের কথায় কাজ হচ্ছে। প্রায় এক মাস ধরে ডাকাতদলের খোঁজে এখানকার পাহাড়গুলো চষে বেড়াচ্ছে ও লোকজন নিয়ে। বিরক্তির চরম সীমায় পৌঁছে গেছে এখন। এরই মধ্যে আবার স্টেজ ডাকাতি আর মার্শাল হত্যা। লোকগুলো যদি চলে যেতে চায়, আটকে রাখার কোনও অধিকার নেই ওর। বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্যে ছটফট করছে ওরা। ওরা অবশ্য আইনকে শ্রদ্ধা করে। আইন প্রতিষ্ঠার কাজেই শেরিফের সাথে এসেছে। তবে এও ঠিক যে, আইন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটা এদিকে একটু কঠিন হবে। এখানকার লোকগুলো এখনও ভালভাবে পরিচিত হয়ে উঠতে পারেনি এর সাথে। ব্যক্তিগত মতপার্থক্যের ব্যাপারটা এখনও অস্ত্রের মাধ্যমে ফয়সালা করতে আগ্রহী লোকের সংখ্যাই বেশি। শেরিফ এখন ভয়ে ভয়েই আছে কিছুটা। সাথের লোকগুলো ত্যক্তবিরক্ত হয়ে ওকে ছেড়ে গেলে সমস্যায় পড়ে যাবে ও।

ঢোক গিলল শেরিফ। আমতা আমতা করে বলতে গেল, 'আমি...'

কিন্তু তার আগে বিশালকায় লোকটা আরেকটু সামনে বেড়ে ওর একদম কাছে চলে গেল। 'লেইফ,' দাঁতের ফাঁকে তামাক চিবোতে চিবোতে বলল সে। 'আমার মনে হয়, ও যা বলেছে, তারচে' বেশি জানে। ওর আচরণ খেয়াল করেছ? মনে হয়, যা বলছে, ভেবেচিন্তেই বলছে। খুব বেশি ঠাণ্ডা লোকটা। নিরীহ কোনও কাউহ্যাণ্ডকে আমি এমন পরিস্থিতিতে এতটা ঠাণ্ডা আচরণ করতে আর দেখিনি।'

একই সঙ্গে বিস্ময় এবং সন্দেহ দুটোই দেখা গেল শেরিফের

চোখে। প্রথমে ফ্রাঙ্ক, এরপর লোকটার দিকে চাইল সে। ফের চোখ ফেরাল ফ্রাঙ্কের দিকে। তারপর বিড় বিড় করল, 'কী বলতে চাও, পরিষ্কার করে বলো, সেট।'

'ও বলেছে, লোকটার চোখের রং হলুদ, তাই না? আমার মনে হয়, ও সত্যি কথা বলছে না। ও কী করে লোকটার চোখের রং দেখতে পেল? কই, এত কাছে দাঁড়িয়েও আমি তো তোমার চোখের রং বুঝতে পারছি না। তা হলে ও কী করে...

বিশালকায় লোকটার দিকে স্থির চোখে চাইল ফ্রাঙ্ক। 'তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী বলছ?'

'তোমার কথা শুনে কিন্তু সেরকমই মনে হচ্ছে। তোমার সাথে ওর দেখা হয়েছে ধরো, আরও এক ঘণ্টা আগে। এখন চাঁদ অনেকটা ওপরে উঠে গেছে। এক ঘণ্টা আগের চেয়ে এখন সব কিছু আরও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তবু তোমার চোখের রং বুঝতে পারছি না আমি। অথচ এখানে দাঁড়িয়ে তোমার শার্টে ঘামের চিহ্ন পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।'

শেরিফের ঠোঁটদুটো শক্ত হয়ে বসল। কড়া চোখে চাইল ফ্রাঙ্কের দিকে। 'মিস্টার, সেট যা বলছে, তাতে চিন্তা করার যথেষ্ট খোরাক আছে। তোমার সঙ্গে কি ওই লোকের আগেও দেখা হয়েছিল?'

বিরক্ত বোধ করছে ফ্রাঙ্ক। সেটা গোপন করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না-করে বলল, 'হ্যাঁ, হয়েছিল। আমি যার কথা বলছি, সে-ই যদি তোমাদের সে-লোক হয়ে থাকে, তা হলে এ-মাসে কমসে কম দু'তিনবার দেখা হয়েছিল।'

'কোথায় দেখা হয়েছিল?' শেরিফের গলায় আগ্রহের আভাস।

'প্যারাডাইসে,' অবলীলায় বলল ফ্রাঙ্ক। এখন এই লাইনে এগোনোর চেষ্টা করছে সে। দেখা যাক কতদূর এগোনো যায়।

আসলে বুকের ক্ষতের তীব্র ব্যথায় মত পাল্টাতে বাধ্য হয়েছে। 'বেশির ভাগ সময় সাই টার্নারের লিভারি আস্তাবলের আশপাশে থাকে।'

ফ্রাঙ্ক এখন যা বলছে, একটু আগে এর সম্পূর্ণ বিপরীতটা বলেছিল। তখন তার কথায় মনে হয়েছে, লোকটাকে সে চেনেই না। বেকুবের মত এই উল্টো স্বীকারোক্তি নিশ্চয় ওদের জন্যে যথেষ্ট হাসি-ঠাট্টার খোরাক জোগাবে। কিন্তু বিশালদেহীর মুখ দেখে মনে হলো, ফ্রাঙ্কের কথা যেন তার কানেই ঢোকেনি। কিছু একটা ভাবছে লোকটা–এবং সে-ভাবনাতেই মগ্ন।

ফ্রাঙ্কের দিকে চাইল লোকটা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে। তারপর বলল, 'তুমি বলছ লোকটার চোখের রঙ হলুদ। তার মানে খুব কাছ থেকে গুলি করেছে সে তোমাকে। এত কাছ থেকে গুলি লাগলে তো তোমার বেঁচে থাকার কথা নয়। কিন্তু তুমি দিব্যি বেঁচে আছ। তার মানে লোকটা মিস করেছে। কিন্তু বুঝতে পারছি না সে কী করে মিস করল।'

তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটল ফ্রাঙ্কের চোখে। তাকাল বিশালদেহীর দিকে। চিন্তাধারা সরল পথেই চলে লোকটার। শেষ পর্যন্ত চালাকিটা তা হলে কাজে দিতে শুরু করেছে! হাসল সে। লোকটা আসলে বোকা। ফ্রাঙ্কের প্রতি ওর অহেতুক বিদ্বেষই ফ্রাঙ্ককে নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দিচ্ছে।

সবার দিকে তাকিয়ে আবার হাসল ফ্রাঙ্ক। বলল, 'অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি, ভাইয়েরা। আমার কপাল ভাল বলতে হবে। কী বলো?'

ওর বুকের ক্ষতটা আইনের লোকদের চোখে পড়লে সমস্যা হতে পারে, এরকম ভয় ছিল ফ্রাঙ্কের। সে-ভয় থেকেই বো ব্রীনের কাছ থেকে ওর জামাটা কেড়ে নিয়ে নিজেরটা ফেলে রেখে এসেছে। তবে এখন আর সে-ভয় করছে না। জামার

বোতামগুলো খুলে দিল সে। দু'হাতে সরিয়ে দিল দু'দিকে যেন ওখানে জড়ানো ব্যাণ্ডেজটা স্পষ্ট দেখতে পায় সবাই।

ঘোড়ার পিঠে বসে সেটের মুখের দিকে চেয়ে আছে ও। হাসছে। ব্যাপারটাকে উপভোগ করছে। জানে, মুখে বলার দরকার নেই, যা বলার তার বুকের ব্যাণ্ডেজই বলে দিচ্ছে।

ওর কথা শুনে সেট চমকে উঠবে ভেবেছিল ফ্রাঙ্ক। কিন্তু সেটের মুখ দেখে মনে হলো, ওর কোনও প্রতিক্রিয়াই হয়নি। স্যাডলের ওপর সামনে ঝুঁকল লোকটা। চোখদুটো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ফ্রাঙ্কের বুকের ক্ষতের দিকে। হাতের অস্ত্রটা উঁচাল। চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'লেইফ, একটা রশি নিয়ে এসো তো! লোকটাকে ঝুলিয়ে দিই।'

ফ্রাঙ্ক নিজে তো বটে, এমনকী লোকটার সঙ্গীরা পর্যন্ত হতবাক হয়ে গেল।

সবার আগে নীরবতা ভাঙল শেরিফ। 'সেট, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?'

কুৎসিত শব্দে হেসে উঠল সেট। 'সেরকম মনে হচ্ছে? না, ভয়ের কিছু নেই। আমি পাগল হইনি। তুমি ভাল করে চেয়ে দেখ, ওকে মোটেই গুলি করা হয়নি। লোকটা মিথ্যে কথা বলছে।'

'ওর কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে আমি নিশ্চিত যে, ওকে গুলি করা হয়েছে। কিন্তু তোমার কথা মত যদি ওকে গুলি করা না-হয়ে থাকে, তা হলে ওর জামায় রক্ত এল কোত্থেকে? ওখানে ক্ষতই বা হলো কী করে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল শেরিফ।

# সাত

ফাঁদটা এতক্ষণে বুঝতে পারল ফ্রাঙ্ক। ভয় পেল। সাথে সাথে রাগে প্রায় পাগল হয়ে ওঠার অবস্থা হলো। পর মুহূর্তে মাথা ঠাণ্ডা করে পরিস্থিতি বিচার করতে শুরু করল। ওর মনের কোমল যে-অংশটুকু ওকে মানুষ খুন করা থেকে সব সময় বিরত রাখে, সেটাই এ-মুহূর্তে শান্ত করল ওকে। এখন বেফাঁস কিছু করতে গেলে গোলাগুলি শুরু হয়ে যাবে এবং তাতে মানুষ মারা যেতে পারে। সে নিজে তো বটেই, বিপক্ষেরও কেউ না কেউ মারা যাবে। অস্ত্রের দিকে হাত বাড়ানোর পরিবর্তে আরও শক্ত করে স্যাডল হর্ন আঁকড়ে ধরল সে।

সামনে বাড়িয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল শেরিফের ধূসর মেয়ারটি। শেরিফের চোখ এখন আর আগের মত কোমল নয়। উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে। সেটের মতই কঠিন চোখে চাইল ফ্রাঙ্কের দিকে। 'হ্যাঁ, তুমি। ওর প্রশ্নটা তুমি শুনেছ। জবাব দাও।'

মাথা নেড়ে সায় দিল ফ্রাঙ্ক। জানে, এখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে শেরিফ। এতক্ষণও তাই করছিল। তবে এবারেরটা একটু ভিন্ন মাত্রার হতে যাচ্ছে। কিন্তু কী জবাব দেবে সে?

শেরিফের সঙ্গের লোকগুলো চুপচাপ চেয়ে আছে ওর দিকে। বোঝা যাচ্ছে, ওরা ওর কাছ থেকে সন্তোষজনক জবাব পেতে চায়। ওরা আসলে ছাপোষা নিরীহ লোক। শেরিফের সাথে এসেছে ওকে সাহায্য করার জন্যে। তাতে তাদের স্বার্থও জড়িত

আছে। এ-অঞ্চলে আইনের শাসন চালু হলে অনেক ঝামেলা থেকে বেঁচে যাবে ওরা। ওরা লড়াইবাজ নয়। তবে লড়াই যদি একান্তই ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে, তা হলে ছেড়ে কথা বলার পাত্রও নয়। ওদের চোখে অবশ্য নিজের জন্যে অনুকূল কোনও চিহ্ন দেখছে না ফ্রাঙ্ক। সব ক'টা চোখে স্রেফ বিদ্বেষ।

শেরিফের প্রশ্নের জবাব খুঁজছে সে মনে মনে। কিন্তু কী বলবে বুঝতে পারছে না। এতক্ষণ ধরে যে সে প্রচুর কথা বলেছে, সেটা এখন বুঝতে পারছে। এই লোকগুলো শেরিফ লেইফের সঙ্গে শখ করে ঘুরতে বেরোয়নি। তারা আইন প্রয়োগে শেরিফকে সাহায্য করতে এসেছে। কিন্তু তাদের নিজেদের ঘর-সংসারেও করার মত অঢেল কাজ রয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা ওরা ঘরে ফেরার জন্যে উদ্‌গ্রীব।

কিন্তু এখানে একজন ইউএস মার্শাল খুন হয়েছে ডাকাতদের হাতে। এটা ওদের চোখে অনেক বড় ব্যাপার। ডাকাতদলকে শায়েস্তা করা না-গেলে ভবিষ্যতে আরও অনেক খুনখারাপির ঘটনা ঘটতে পারে। এখন ফ্রাঙ্ককে একা পেয়ে ওকে যদি ডাকাতদলের সদস্য বলে ওদের সন্দেহ হয়ে থাকে, তা হলে বিপদ আছে।

স্যাডল থেকে কিছু একটা তুলে নিল একজন। সতর্ক হয়ে উঠল ফ্রাঙ্ক। আরেকজন বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে প্রশ্ন করল, 'তুমি এখানে কার জন্যে অপেক্ষা করছিলে, মিস্টার?'

রক্তের নেশায় খেপে ওঠা বাঘের গর্জনের মত মনে হলো ফ্রাঙ্কের কাছে প্রশ্নটা।

'লেইফ,' জবাব দেবার আগে সেট ডাকল শেরিফকে। 'বড় একটা গাছ পেছনে ফেলে এসেছি। এখানে ঝোলানোর মত তেমন জুতসই গাছ নেই। নইলে...'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল শেরিফ। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে তাকাল সেটের কাঁধের ওপর দিয়ে। জিভ বের করে চেটে নিল শুকনো

ঠোঁটদুটো। 'দুটো ভুল মিলে তৃতীয় আরেকটা ভুলের সৃষ্টি হয়। সত্যিটা পাওয়া যায় না। ওকেও কিছু বলার সুযোগ দেয়া উচিত। সুযোগটা পাওয়ার অধিকার ওর আছে।'

'ঠিক আছে,' বিশাল কাঁধদুটো ঝাঁকাল সেট। 'পুরো ব্যাপারটা ওকে ব্যাখ্যা করতে বলো। ও যদি ওই স্টেজ ডাকাতির সাথে জড়িত না থাকে...

'বাছা,' ফ্রাঙ্কের দিকে চোখ ফেরাল শেরিফ। নার্ভাস গলায় বলল, 'তুমি বরং কী বলার আছে বলে ফেলো। কিছুই লুকিয়ো না যেন। সেটাই ভাল হবে তোমার জন্যে।'

সেটা ফ্রাঙ্ক নিজেও জানে। কিন্তু সে এর আগে একটা কাহিনি শুনিয়েছে ওদের। এখন সেটা পাল্টে যদি আরেকটা শোনাতে যায়, সেটা হবে নিজেই নিজের কবর খোঁড়ার মত। আর আসল কাহিনিটা বললেও যে তার বিপদ কমবে তা নয়। বরং আগে যা বলেছে, সেটার ওপরই স্থির থাকতে হবে এবং সেটাকে আরও জোর দিয়েই বলতে হবে।

ও বলেছে, ওর সঙ্গে পথে বো ব্রীনের সাক্ষাৎ হয়েছে। এটা সত্যি। এরা তা বিশ্বাসও করেছে। কিন্তু বো ব্রীনের ওপর যে-অপরাধটা চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে, সেটার সাথে ওর নিজেরও যে সম্পৃক্ততা আছে, সেটা লুকিয়ে রাখতে চাইছে। তাতে কতটা সফল হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না।

বিশালদেহী সেটের বুদ্ধি তার শরীরের মত মোটা নয় মোটেই। ফ্রাঙ্ককে হঠাৎ এখানে একলা দেখতে পেয়ে মাথা ঘামাচ্ছে লোকটা। সেটকে চিনতে ভুল করেছে ফ্রাঙ্ক। আরেকটু মনোযোগ দিয়ে দেখা উচিত ছিল। এখানে যে-লোকগুলো ওর চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়েছে, তাদের সবার চাইতে বোঝা যাচ্ছে, ওর মাথাই পরিষ্কার।

ষাঁড়ের মত গাঁক গাঁক করে নীরবতা ভাঙল সেট। 'লোকটা

তোমাকে কোথায় গুলি করেছিল?'

'সিলভার ক্রীক ক্যানিয়নে,' নিরীহ স্বরে জবাব দিল ফ্রাঙ্ক। 'প্যারাডাইস থেকে সামান্য পশ্চিমে।'

'তার মানে তুমি বলছ, লোকটা প্যারাডাইসে যাচ্ছিল?'

'আমাকে যখন গুলি করল, তখন ওদিকেই যাচ্ছিল। মনে হয়...

'তুমি বলেছ, তুমি প্যারাডাইস থেকে আসছিলে।'

'গল্পটা কি তা হলে তুমিই বলতে চাও? তোমার মত করে?' কঠিন শোনাল ফ্রাঙ্কের গলা।

'সেট,' শেরিফ বলল। 'তুমি একই সাথে জুরি এবং জাজের ভূমিকা নিতে পার না।'

ওর গলা ছাপিয়ে দিয়ে আরেকটা গলা ভেসে এল, 'ধুত্তোর! চার্লি, রশিটা নিয়ে এসো তো! ঝুলিয়ে দিলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়!'

নিজের মেয়ারটাকে প্রায় চরকির মত ঘোরাল শেরিফ। 'থামো! নাটক যথেষ্ট হয়েছে। এবার একটু ওর কথা শোনার সুযোগ দাও।' এক মুহূর্ত চুপ করে রইল প্রতিবাদের আশায়। তারপর ফ্রাঙ্কের দিকে ফিরল। 'হ্যাঁ, বলে যাও।'

নিজের বক্তব্য গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে ফ্রাঙ্ক। 'শহর থেকে একটু পশ্চিমে, আমার সাথে দেখা হয়েছিল ওর। ও যেদিক থেকে আসছিল, আমি সেদিকে যাচ্ছিলাম। খুব তাড়া ছিল মনে হয় ওর। হাতে অস্ত্র...'

'শেষবার তুমি ওটাকে .৪৫-৯০ বলেছিলে।'

'কেন ওটা অস্ত্র নয়?

'কখনও বলতে শুনিনি কাউকে।'

'এখন তো শুনলে।' বিরক্ত হলো ফ্রাঙ্ক। 'আমার মনে হলো, লোকটা বুঝি ঘোড়াসহ আমার গায়ে এসে পড়বে। বারবার ঘাড়

ফিরিয়ে পেছনে তাকাচ্ছিল ও। গায়ের ওপর এসে পড়ার ভয়ে আমি চিৎকার করে ওর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করলাম। লোকটা চমকে উঠে রাইফেল তুলেই গুলি করল। ওর প্রথম গুলিটা মিস হলো তাড়াহুড়োর কারণে। আমি একটু পিছিয়ে গেলাম। ও স্থির চোখে তাকাল আমার দিকে। আমিও তাকালাম। আর তাতেই ওর চোখের রঙ স্পষ্ট দেখতে পেলাম।'

থেমে একে একে ওদের সবার দিকে চাইল ফ্রাঙ্ক। তারপর মরিয়া হয়ে বলল, 'পরের গুলিটা লাগল। আমি পড়ে গেলাম ঘোড়া থেকে...'

'আচ্ছা! তারপর?'

থেমে গেল ও। লোকগুলোর চোখ দেখে বুঝতে পারছে, ওর কথা আদপেই বিশ্বাস করছে না ওরা। তবু আবার শুরু করল, 'আমি আবার ঘোড়ায় চড়ে বসলাম।'

'চড়ে বসলে! যেভাবে বলে ফেললে ঠিক সেভাবেই? অনায়াসেই?'

'না, অনেক সময় লেগেছে।'

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো চড়লে, তাই না? তা এরপর কী করলে?'

'এরপর...' একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল ফ্রাঙ্ক। 'আমার এক বন্ধুর ওখানে গিয়ে...'

'কী নাম তোমার বন্ধুর?'

'তা জেনে তোমাদের লাভ হবে না। আমি ওকে বাড়িতে পাইনি। যা হোক ওখানে আমি ক্ষতের পরিচর্যা করে শার্ট পাল্টে...'

'প্যান্ট পাল্টাওনি?'

প্রশ্নটা যেন হাতুড়ির ঘায়ের মত এসে লাগল ফ্রাঙ্কের কানের পর্দায়। এসব প্রশ্ন করে করে ওরা আসলে কী জেনে নিতে চায়,

এক মুহূর্ত ভাবার চেষ্টা করল। ভ্রূ কুঁচকে তাকাল ওদের দিকে। তবে চাঁদের আলোয় ওদের মুখের ভাব তেমন বোঝা গেল না। আচমকা ওর মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। ওর মনে হলো মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। প্রাণপণ চেষ্টা চালাল নিজেকে ঠিক রাখার জন্যে। কিন্তু অন্ধকারের পর্দা এসে ঢেকে দিল ওর চোখের সামনের সব কিছু।

## আট

প্রচণ্ড উত্তাপেই যেন ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল ফ্রাঙ্কের। নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে মনে হলো বুকের ওপর যেন ভারী কিছু চেপে বসে আছে। ব্যথা পাচ্ছে।

মনে হচ্ছে কেউ যেন ওর বুকের ওপর আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আগুনটা হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে চাইল ও। কিন্তু টের পেল হাত নড়ছে না। মরিয়া হয়ে উঠল সে। পাশ ফিরে ফেলে দিতে চাইল আগুনটাকে। কিন্তু ওর শরীরও যেন কাজ করছে না।

তবে মাথা পুরোপুরি কাজ করছে। এখান থেকে সরে যাওয়ার তাড়া বোধ করছে সে। কিন্তু উঠে যাওয়ার ক্ষমতা যেন হারিয়ে ফেলেছে। সব কিছুকে মনে হচ্ছে দুঃস্বপ্নের মত। পুরো শরীর যেন অবশ হয়ে গেছে।

জোর করে চোখ খোলার চেষ্টা করল সে। অবশেষে খুলতে পারল। চারদিকে অন্ধকার। এতক্ষণ ধরে চারপাশে আগুন জ্বলার ফট ফট শব্দ আসছিল ওর কানে। তবে এখন দেখল আগুন নয়,

বাতাসে উইলো পাতা নড়াচড়ার শিরশির শব্দকেই সেরকম মনে হচ্ছিল। আর ওর বুকে আগুন ধরিয়ে দেয়ার যে অনুভূতি হচ্ছিল, সেটাও ভুল। ওর বুকে ক্ষতস্থানের ওপর একটা কম্বল চাপানো। চিৎ হয়ে পড়ে আছে ও। চাঁদের আলোয় চারদিক ফরসা। নিজেকে বড় একটা বাটিতে পানির ভেতর ফেলে রাখা মাছ মনে হচ্ছে।

কিন্তু হা ঈশ্বর! তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে ওর। গলা শুকিয়ে কাঠ। শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরা এক ফোঁটা পানির জন্যে যেন হাহাকার করছে।

এখন কোথায় বোঝার চেষ্টা করল ফ্রাঙ্ক। প্রথমে কিছুই মনে করতে পারল না। সে আসলে কে এবং এখানে কী করছে, তাও যেন ভুলে গেছে। এক মুহূর্ত পরেই ঘোর কেটে গেল। মনে পড়ল সাই টার্নারের কথা। ওর সাথে প্রচণ্ড মারামারি, খুন করার জন্যে বো ব্রীনের ওত পেতে থাকা। তারপর ওখান থেকে পালিয়ে আসার সময় শেরিফ লেইফের পাসির সামনে পড়া।

পাসির সামনে পড়ে ওদের নানারকম প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে জান বেরিয়ে যাওয়ার দশা হয়েছিল ওর। ওরা স্টেজ ডাকাতের খোঁজে বেরিয়েছিল। সেট লোকটা সন্দেহ করে বসেছিল ফ্রাঙ্ককে। আচমকা ওদের সামনে পড়ে গিয়ে ওদের এলোপাতাড়ি প্রশ্নের কী জবাব দেবে বুঝতে না-পেরে হকচকিয়ে গিয়েছিল ও। মিথ্যে পরিচয় দিতে হয়েছিল। তারপর সে-পরিচিতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে আরও মিথ্যে। সেট নামের মোটা লোকটা একটুও বিশ্বাস করেনি ওসব। শেরিফ না-থামালে হয়তো সবাই মিলে ঝুলিয়েই দিত ওকে।

চারদিকে উইলো পাতার শিরশির আর ঝরনার বয়ে চলার কুল কুল শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। কান পাতল ফ্রাঙ্ক। চেষ্টা করছে এর চেয়ে ভিন্নতর কোনও শব্দ শোনা যায়

কিনা।

এখনও সে নড়াচড়া করতে পারছে না। তার মানে বেঁধে রাখা হয়েছে ওকে। ও আহত, তারপরও বিশ্বাস করতে পারেনি ওরা। তা ছাড়া ওর দলের অন্যদের ব্যাপারেও দুশ্চিন্তা ছিল ওদের। ম্যাক্সওয়েল হত্যার সাথে জড়িত দলের অন্য সদস্যরাও যদি ওর খোঁজে এসে পড়ে কিংবা ফ্রাঙ্ক নিজেই যদি জ্ঞান ফিরে পেয়ে ওদের ডেকে নিয়ে আসে, সে ভয়েই হয়তো বেঁধে রেখে গেছে ওকে। এখন নিশ্চয় প্যারাডাইসে গিয়ে পৌঁছেছে ওরা।

এখন যদি ও বাঁধনটা খুলতে পারত! যদি নিজেকে মুক্ত করতে পারত!

রাতের নৈঃশব্দ্যের প্রেক্ষাপটে আবার কান পাতল সে। কিন্তু বাতাস আর পানির শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনা গেল না। ঘন উইলো গাছের ফাঁক দিয়ে অন্ধকারে তাকাল। কোথাও সন্দেহ জাগার মত কোনও কিছুর আভাস পেল না। এখান থেকে অতি সত্বর সরে যাওয়ার তাড়া বোধ করছে ও। তবু হুট করে উঠে বসার সাহস পেল না। অপেক্ষা করছে। জানে, ধৈর্য ধরে অপেক্ষার প্রহর কাটানোর ফল প্রায় সময় ভাল হয়ে থাকে। ক্ষতির সম্ভাবনা তেমন থাকে না।

অনড় হয়ে পড়ে রইল ও কিছুক্ষণ। নড়াচড়া করতে গিয়ে সামান্যতম শব্দ হোক, তাও চায় না।

ওরা নিশ্চয় ওকে বেঁধে গেছে। বাঁধন কতটা শক্ত বোঝার জন্য হাত-পা নাড়তে গেল। তেমন শক্ত কিছু অনুভব করল না। মনে হয় তেমন শক্ত করে বাঁধেনি লোকগুলো। কিন্তু আরও একটু নাড়তে অবাক না-হয়ে পারল না। ওর হাত-পা দুটোই মুক্ত। ওরা ওকে বাঁধেনি তা হলে! কেন?

হাত-পা নাড়তে না-পারার ব্যাপারটা বুঝতে পারল ফ্রাঙ্ক এতক্ষণে। আসলে জ্ঞান ফিরে আসার পরও বেশ কিছুক্ষণ ওর

স্বাভাবিক বোধ ফেরেনি। শরীর নয়, ওর চেতনাই অসাড় হয়ে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে। তাই বোধ হয়, বুকের ওপর কম্বলের ওমকে আগুনের উত্তাপের মত লেগেছিল।

বুকের ওপর থেকে কম্বলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ফ্রাঙ্ক। এক কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো। তেমন কিছু ঘটল না। তবে মাথা প্রচণ্ড ভারী আর বুকের মধ্যে যেন ছুরির খোঁচা অনুভব করছে। ফের আগের মত শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। পাত্তা দিল না তাতে। দুর্বলতায় শরীর ভেঙে পড়তে চাইলেও মনের ভেতর থেকে তাগিদ আসছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে সরে পড়তে।

একটু ধাতস্থ হতে আস্তে আস্তে হাত ও হাঁটুতে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করল সে। বারকয়েকের চেষ্টায়, মাথা ঘুরে প্রায় পড়ে যেতে যেতে, ককাতে ককাতে উঠে দাঁড়াল। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল ফের জ্ঞান না-হারানোর জন্যে। ধীরে ধীরে হাঁটার চেষ্টা করল। কয়েক পা ফেলল। কিন্তু আবার কিছুটা অস্বস্তি বোধ হলো। প্রচুর রক্ত হারানোর পর শরীরের তাপমাত্রার ওঠানামা হচ্ছে।

ওর পায়ের নীচে এবড়োখেবড়ো পথ। পাথুরে অন্ধকারে হাঁটতে গিয়ে এর মধ্যেই বারকয়েক হোঁচট খেয়ে উল্টে পড়ার দশা হয়েছে। তবে অন্ধকার আস্তে আস্তে চোখে সয়ে আসতে হাঁটার মধ্যে একধরনের ছন্দ ফিরে আসতে শুরু করল। বেশ কয়েক ফুট হাঁটল ফ্রাঙ্ক।

অল্প কিছুদূর গিয়ে থামল। তেষ্টায় গলা বুক ফেটে যাওয়ার দশা হয়েছে। ভয় হচ্ছে হয়তো মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। প্রবল চেষ্টায় নিজেকে স্থির রাখল।

মরুভূমিতে পানির প্রবল তৃষ্ণায় মানুষকে দিগ্বিদিক্ ছুটে বেড়াতে দেখেছে ফ্রাঙ্ক। মরীচিকার নেশায় পাগলের মত হাঁটতে

হাঁটতে বালিতে মুখ থুবড়ে পড়ে মারা যেতেও দেখেছে।

ফ্রাঙ্ক জানে, ওর নিজের অবস্থা অতটা খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেনি এখনও। তবে শরীরের এ-অবস্থায়ও পানি খুঁজে নিয়ে খাওয়ার মত শক্তি এবং সাহস কোনওটাই মনে হয় না তার আছে।

কিন্তু তার জন্যে কিছু করার এখনই সময়। শেরিফ লেইফ এবং তার লোকেরা চলে গেছে। কিন্তু তারা যে ফিরে আসবে না–সেটা হলফ করে বলা যায় না। সুতরাং দ্বিতীয়বার তাদের সামনে পড়তে না-চাইলে তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে সরে যেতে হবে। অবশ্য ওরা যে ফিরে আসবে এটাও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। তবে সমস্যা হলো, ওরা যদি ব্রীনের সামনে পড়ে এবং তার সঙ্গে কথা বলে, তা হলে কিন্তু খবর আছে। মড়ার খঁবর পাওয়া নেকড়ের মত ছুটে আসবে ফের–এবং তাকে পাওয়ামাত্র সোজা নিয়ে লটকে দেবে।

ফ্রাঙ্ক নিজের ঘোড়াটা দেখতে পাচ্ছে না। ঘোড়াটা ওর জন্যে রেখে গেছে কিনা খুঁজল অন্ধকারে। অবশ্য লেইফ ও তার দলবলকে অতটা গাধা ভাবছে না যে রেখে যাবে। তবু অভ্যাসবশে চারদিকে বারকয়েক চোখ বুলাল। কিছুই দেখতে পেল না। পাওয়ার কথাও নয়। শেরিফ লেইফ ও তার লোকেরা জানে, ঘোড়া ছাড়া এখান থেকে খুব বেশি দূরে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তারা ওকে এখানে একা ফেলে রেখে গেছে। এমনকী বেঁধে রেখে যাওয়ার গরজও বোধ করেনি।

ওর শরীর প্রচণ্ড দুর্বল। ও দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু পুরো শরীর কাঁপছে থর থর করে। ওদিকে একটু দূরে ঝরনার মৃদু কুল কুল শব্দ ওকে অস্থির করে তুলছে। মনে হচ্ছে, মাত্র এক ঢোক পানি পেলেই ওর শরীর থেকে সব দুর্বলতা ঝরে যেত। কিন্তু পানি খেতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তৃষ্ণা নিবারণের

আশা বাদ দিয়ে সামনের উইলো ঝোপের দিকে এগোল। আশা করছে, ঘোড়াটা হয়তো ওখানে পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য ওরা যদি রেখে যায়।

আস্তে আস্তে জঙ্গল সরিয়ে সামনে এগোল ফ্রাঙ্ক। কিছুদূর গেল অতি কষ্টে—এবং এর পরই দেখতে পেল রোয়ানটাকে। এ-ঘোড়াটাকেই টার্নারের কাছ থেকে আনতে মারামারি করতে হয়েছে। লোকগুলো ওকে অজ্ঞান অবস্থায় ঝরনার কাছ থেকে একটু দূরে ঘন জঙ্গলের ভেতর ফেলে গিয়েছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ হাঁ করে শ্বাস টানল ফ্রাঙ্ক। নিঃশ্বাস নিতে গেলে বুকের ভেতর একধরনের ব্যথা হচ্ছে। আর নিঃশ্বাস নেয়ার কষ্টটাই ওর দুর্বলতা বাড়িয়ে দিচ্ছে আরও। হাতের কাছে নেমে আসা একটা উইলোর ডাল ধরে ফেলল ও। ঢুলতে লাগল মাতালের মত।

ঘোড়াটাকে দেখেছে ও, তবু কেন যেন মনে হচ্ছে, ওটা ঠিক ঘোড়া নয়, ঘোড়ার ছায়া। আবার ওটাকে ছায়া ভাবতেও ইচ্ছে হচ্ছে না। আসলে ওর জ্ঞান ফিরে আসার পর বুকের ওপর যেরকম আগুনের উত্তাপ অনুভব করেছিল, সেটাই এখন ওকে বিশ্বাস করতে বাধা দিচ্ছে যে, জঙ্গলের ফাঁকে ওটা আসলে ঘোড়াই দাঁড়িয়ে আছে। ওর মধ্যে হ্যালুসিনেশন হচ্ছে, এটা বুঝতে পারছে ও। নইলে বুকের ওপর কম্বলের উত্তাপকে কেন আগুনের তাপ বলে মনে হবে?

বিরক্ত বোধ করছে ফ্রাঙ্ক। কী হচ্ছে এসব? আচ্ছা, ও কি পাগল হয়ে যাচ্ছে? হারিয়ে ফেলছে স্বাভাবিক বোধ-বুদ্ধি?

না। সিদ্ধান্ত নিল ও। দূরে থেকে আবোলতাবোল না ভেবে কাছে গিয়ে দেখবে ওটা ঘোড়া না ঘোড়ার ছায়া।

সামনে এগোনোর জন্যে মাত্র পা তুলেছে, এমন সময় ডেকে উঠল ওই ঘোড়া কিংবা তার ছায়াটা। সঙ্গে সঙ্গে ধক করে উঠল

ওর ভেতরটা। জায়গায় জমে গেল সে।

ফ্রাঙ্ক আস্তাবল থেকে বেরিয়ে আসার পরও ব্রীন থেকে গিয়েছিল ওখানে। রাগে ওর সারা শরীর জ্বলছিল। মনে হচ্ছিল কেউ যেন বিছুটি পাতা ঘষে দিয়েছে শরীরে।

পরাজয় মেনে নিতে পারে না ব্রীন। হার মানাকে ঘৃণা করে। ফ্রাঙ্কের কাছ থেকে দলের নেতৃত্ব কেড়ে নিয়েছে ও। কোন্দলে না-গিয়ে পিছিয়ে এসেছে ফ্রাঙ্ক। ধরতে গেলে ব্রীনেরই জিত হয়েছে। তবু তাতে এখন সে আনন্দ পাচ্ছে না। মনে হচ্ছে যা পেয়েছে, তার চেয়ে বেশি হারিয়েছে। ফ্রাঙ্ক সেলজার ওর কাছে নেতৃত্ব হারিয়েছে বটে, তবে ও হারিয়েছে সম্মান। ফ্রাঙ্ক সেলজার চরম বেইজ্জতি করেছে ওর পোশাক খুলে নিয়ে। আর এ-গল্পটা যে লোকটা যেখানে যাবে সেখানেই ছড়িয়ে যাবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই ব্রীনের। সেলজার এমন একটা কৃতিত্বের কথা কাউকে না-বলে মুখ বুজে থাকতে পারবে, এটা অবিশ্বাস্য।

ব্রীন অহঙ্কারী মানুষ। সেলজারের কাছে ক্ষমতার বিনিময়ে অহঙ্কার বিলিয়ে দিতে হয়েছে তাকে। প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষায় তাই পাগল হয়ে আছে এখন। ইচ্ছে করছে ফের ছুটে গিয়ে লোকটার টুঁটি ছিঁড়ে নিতে। তবে ব্যাপারটা যে অন্তত তার একার পক্ষে সম্ভব নয়, সেটা খুব ভাল করেই জানে।

যা-ই হোক, এখন সে দুটো কাজ করতে পারে। প্রথমত ফ্রাঙ্কের পেছনে আইনকে লেলিয়ে দিতে। আইন যদি ওর পেছনে ছোটে, তা হলে ব্রীনকে আর কিছু করতে হবে না। সে নিশ্চিন্তে ওর দলবল নিয়ে নিজের কাজে মন দিতে পারে। তবে এতে অসুবিধে হলো একটাই। আইন তাকেও ছেড়ে কথা কইবে না। সেলজার আইনের হাতে ধরা পড়লে ব্রীনের নিজের নিরাপত্তাও থাকবে না। বেজন্মাটা ওকেও ফাঁসিয়ে দেবে ডাকাতির দায়ে।

সুতরাং পরিকল্পনাটা বাদ দিতে হচ্ছে ভবিষ্যতের কথা ভেবে। দ্বিতীয় উপায়টা নিয়েও ভাবছে ও। নিজের লোকদের নিয়ে সে এখন বেরিয়ে পড়তে পারে সেলজারের পেছনে ধাওয়া করে। কিন্তু তাতে নিজের বেইজ্জতির কথা লুকানো থাকবে না। সেটা আরও খারাপ হয়ে দেখা দিতে পারে। ওর নিজের লোকেরাই ব্যাপারটাকে হয়তো হাসির খোরাক হিসেবে নেবে।

অফিসের খোলা দরজা দিয়ে বারের আলো এসে পড়েছে আস্তাবলে। টার্নারের ককানি শুনতে পেল ব্রীন। জ্ঞান ফিরে পেয়েছে লোকটা। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

একটা জিনিস ব্রীনের চোখে পড়ল। কিছু ব্যাংকনোট। দরজাপথে পড়ে আছে ওগুলো। সেলজার ফেলে গেছে। দু'চোখ সরু হয়ে গেল ব্রীনের। ভাবল একটু। তারপর মুখে হাসি ফুটল। এতক্ষণ ধরে দুটো উপায় নিয়ে ভাবছিল সে। দুটোর একটাও মনে ধরছিল না। এবার মনে হয় একটা পথ পাওয়া গেল। আগের দুটোর চেয়ে অনেক ভাল পথ।

ব্যাংকনোটগুলোকে ডিঙিয়ে টার্নারের অফিসে ঢুকল ও। খালি পায়ে কোনও শব্দ হচ্ছে না। লণ্ঠনের হলুদ আলোয় টার্নারকে দেখল ডেস্কে মাথা নিচু করে বসে আছে। বিশালদেহী লোকটাকে সামান্য আলোয় আহত ভালুকের মত দেখাচ্ছে। ভাঙা হাতটা ঝুলছে ল্যাগব্যাগ করে, ভাল হাতটা ড্রয়ারে।

'টার্নার,' ব্রীন ডাকল। 'আমার কিছু কাপড়চোপড় আর একটা অস্ত্র দরকার।'

আচমকা ভূতের গলা শুনে যেন চমকে উঠল টার্নার। ভাঙা হাতটা ডেস্কের কোনায় লাগতে আর্তনাদ করে উঠল।

'আমি সারারাত দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না,' অসহিষ্ণু স্বরে বলল ব্রীন। 'তুমি বাইরে থেকে আমার জন্যে কিছু কাপড়চোপড় কিনে নিয়ে এসো।'

এতক্ষণে যেন ব্রীনের উপস্থিতির ব্যাপারে সচকিত হয়ে উঠল টার্নার। লাল চোখদুটো মেলে দেখল ওকে। তারপর আচমকা ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খেতে শুরু করল। ওর অপেক্ষা না-করে একটা ক্লজিটের কাছে এগিয়ে গেল ব্রীন। তারপর হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলল ওটার দরজা। ভেতরে এক জোড়া বুটজুতো, এক জোড়া প্যান্ট আর একটা শিল্ড-ফ্রন্টেড শার্ট। ক্রীম কালারের হ্যাটও আছে একটা। ওটাই প্রথমে মাথায় চড়াতে গেল। এ-সময় কথা বলে উঠল টার্নার, 'তুমি ওগুলো পোরো না, ব্রীন। খোদার কসম, ওগুলো...'

একটা শেলবেল্ট আর হোলস্টার নিয়ে ক্লজিটের কাছ থেকে সরে এল ব্রীন। শেলবেল্টটা চমৎকার হাতে সেলাই। আর পিস্তলটা মুক্তোর বাঁটঅলা, গুলিভরা। হোলস্টার থেকে বের করে ওটার ওজন আন্দাজ করার চেষ্টা করল ব্রীন। বলল, 'এসবের দাম পাবে তুমি।' পিস্তলটা নাচাল ওর চোখের সামনে। 'এটার জন্যে গুলি আছে তো?'

ড্রয়ার থেকে বের করে আনা বোতলটা ধরে আছে এখনও টার্নার। বিদ্বেষভরা চোখে চেয়ে আছে ব্রীনের দিকে। নিজের কোমর থেকে খালি পিস্তলটা বের করে টার্নারের ড্রয়ারে রাখল। তারপর চোখ রাখল ওর চোখে। 'শোনো, তোমার এ-অবস্থার জন্যে দায়ী ওই সেলজার। আমি ওকে গুলি করেছিলাম। কিন্তু দূর থেকে লাগাতে পারিনি ঠিকমত। সামান্য আহত হয়েছে কেবল। কিন্তু আমার পিস্তলে আর গুলি ছিল না। ফলে বেঁচে গেছে হারামীটা। এখন...'

গুলির শব্দ, ঝন ঝন শব্দে লণ্ঠনের চিমনী ভাঙার আওয়াজ আর টার্নারের বুকফাটা আর্তনাদ–তিনটিই যেন এক সাথে শোনা গেল। ঝাঁকি খেয়ে ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ল টার্নারের বিশাল শরীর। বাতাসে খামচি মারল ওর অক্ষত হাতটা, তারপর ধপ

করে পড়ল ডেস্কের ওপর। হাত থেকে বোতলটা ছিটকে পড়ল টেবিলের ওপর, সেখান থেকে নীচে পড়ে গড়িয়ে একদম দেয়ালের কাছে চলে গেল।

দ্রুত কাজ শুরু করল ব্রীন। কঠিন চোখে রুমের ভেতরটা দেখল। তারপর ক্লজিট থেকে বের করা জিনিসগুলো দ্রুত পরে নিল। ওর মাথা কাজ করছে মেশিনের মত। এখানে এই ঘটনার দায়ভার সে সেলজারের ওপর চাপাতে চায়। সুতরাং সেভাবে সাজাতে হবে ঘটনা।

কাপড়চোপড় পরা শেষ করে পিস্তলটা চেক করল। এই পিস্তলটা দিয়েই টার্নারকে গুলি করেছে ও। গুলি ভরল ওটায়। তারপর হোলস্টারে ঢোকাল।

অফিসের দোরগোড়ায় টার্নারের জন্যে ঘোড়া ও সাজের দাম হিসেবে রেখে যাওয়া টাকাগুলোও পকেটে ভরল। শয়তান আস্তাবলরক্ষকের আর কোনও কাজে আসবে না এ-টাকা। সাই-এর অফিসে দেয়াল থেকে ক্যালেণ্ডার ঝুলছে অনেকগুলো। ওখান থেকে একটা টেনে নামাল ব্রীন। তারপর ডেস্কের কাছে গিয়ে ড্রয়ার থেকে সমস্ত কাগজপত্র বের করে নিল। ডেস্কের ওপর এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখল যেন দেখলে মনে হয়, কোনও কিছুর খোঁজে পাগলের মত সব কাগজপত্র হাতড়ে দেখা হয়েছে। ডেস্ক থেকে অন্যান্য জিনিসও বের করে এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখল।

এরপর টার্নারের কাছে গেল ও। সাবধানে ওর মাথাটা সরিয়ে দিল রক্ত থেকে। খেয়াল রাখল নিজের জামাকাপড়ে যেন রক্তের দাগ না-লাগে। একটা কাচের টুকরো নিয়ে মেঝেয় সেলজারের নাম লিখল। তারপর টার্নারের ডান হাতে ধরিয়ে দিল ওটা। উদ্দেশ্য, যারা ওর লাশ আবিষ্কার করবে, তারা যেন ভেবে নেয় যে, মৃত্যুর আগে টার্নার তার খুনির নাম লিখে যেতে পেরেছে।

# নয়

ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ফ্রাঙ্কের শরীর। ওর ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলে দিচ্ছে সামনে বিপদ। কিন্তু বিপদটা ঠিক কী ধরনের বুঝতে পারছে না। মন চাইছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই জায়গা থেকে সরে পড়তে। তার বদলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ও।

মিনিটখানেক চলে গেল। কিছুই ঘটল না। বাগলার কান খাড়া করে নিথর দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে জীবন্ত নয়, কাগজে আঁকা ছবির ঘোড়া। কেবল ঝরনার একঘেয়ে কুলু কুলু ধ্বনি ছাড়া চারদিকে আর কোনও শব্দ শুনতে পাচ্ছে না এখন ফ্রাঙ্ক। বাতাসের তাড়নায় বনের ভেতর ঝোপঝাড়ের আওয়াজ পর্যন্ত নেই।

ঘামছে ফ্রাঙ্ক। বুক-পিঠ বেয়ে ধারা নেমে আসার অনুভূতি টের পেল। প্রায় রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে ও। পেটের ভেতর চেপে বসেছে মানুষের আদিম অনুভূতি ভয়। কিন্তু ভয়-টয় ওসবকে পাত্তা দেয়ার মত অবস্থা নেই ওর। ওর মাথায় কেবল একটাই চিন্তা। তাকে এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। আর সেটার জন্যে এখন ওর কেবল পা-ই ভরসা। কিন্তু পায়ে হেঁটে চলার কথা মনে হতেই মেজাজ বিগড়ে যেতে শুরু করেছে। ও আহত, তাতে প্রচুর ধকল পোহাতে হচ্ছে। ওর পেছনে লেগে আছে আইন। এদিকে ওর জীবনীশক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। এ-অবস্থায় পায়ে হেঁটে শত্রুর নাগালের বাইরে চলে

যাওয়া সম্ভব হবে না। তাই বাঁচতে হলে একটা ঘোড়া ওর চাই-ই।

কিন্তু ওর সামনে এটা কি ঘোড়া? এটা নিশ্চয় রক্ত-মাংসের সে রোয়ানটা নয়। এটা একটা ছবির ঘোড়া। ঘোড়ার ছবিটা ওর আতঙ্কই বাড়াচ্ছে কেবল।

ওকে অত সহজে ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছে ছিল না সেটের। শেরিফকে তা বলেছিলও। শেরিফ নিশ্চয় গাধা নয়। তাকে এমনিতে চলে যেতে দেবে না। ওই হলুদচোখো বন্দুকবাজের গল্পটা যাচাই করার জন্যে প্যারাডাইসে ধরে নিয়ে যাবে। তবে এর আগে সম্ভবত জরুরি কোনও কাজে তাদের চলে যেতে হয়েছে। ফ্রাঙ্ককে সঙ্গে না-নিয়ে যাওয়ার মানে এই নয় যে, ওকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। বরং ঘোড়া ছাড়া শরীরের এই অবস্থায় পায়ে হেঁটে কোথাও চলে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব হবে না ভেবেই হয়তো এভাবে রেখে গেছে।

চারদিকের নিথর ছায়াগুলো দেখছে ফ্রাঙ্ক। তাকে পাহারা দেয়া হচ্ছে এমন কোনও লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে না। ঘোড়াটাকেও বাঁধা বলে মনে হচ্ছে না। বাঁধা হলে অন্তত লাগামটা ঝুলতে দেখা যেত।

জ্ঞান হারিয়ে ও যখন স্যাডল থেকে পড়ে যায়, তখন বাগলার ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল কিনা ভাবল সে। ব্যাপারটা অসম্ভব নয়। বাগলার পালিয়ে যেতেই পারে। কারণ ঘোড়াটা ওর নিজের নয় যে, প্রভুকে ছেড়ে যেতে চাইবে না। তবে শেরিফের লোকেরা ওটাকে ধরে নিয়ে গেল না কেন এটাও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ফ্রাঙ্ক জ্ঞান ফিরে পেয়ে ঘোড়াটাকে খুঁজে নিয়ে চম্পট দিতে পারে, এটা না-বোঝার মত বেকুব তো তারা নয়। আর যদি ঘোড়াটাকে ধরতে না-পারে, তা হলে ফ্রাঙ্ক যাতে পালিয়ে যেতে না-পারে, সে জন্যে তাকে বেঁধে রেখে যাওয়াটাই

হতো বুদ্ধিমানের কাজ। এটা আসলে এমনও হতে পারে যে, ওরা আশপাশে কোথাও লুকিয়ে থেকে তাকে পরখ করে দেখছে। বেচাল দেখলেই সামনে এসে দাঁড়াবে। অস্বস্তি বোধ করছে ফ্রাঙ্ক। তবে সেটা বাগলারের উপস্থিতির জন্যে নাকি পাসিদলের অনুপস্থিতির জন্যে বুঝতে পারছে না।

ব্যাপারটা ভাবতে নিজের ভেতরে রাগ টের পাচ্ছে ফ্রাঙ্ক। এই লোকগুলো তাকে অনর্থক না-আটকালে এতক্ষণে সে অনেকদূর চলে যেতে পারত। কিন্তু লোকগুলো ওকে আটকেছে, তারপর আবোলতাবোল প্রশ্ন করে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। তারপর অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেছে।

কিন্তু লোকগুলো আদৌ চলে গেছে নাকি কোথাও ঘাপটি মেরে আছে কে জানে? আর ও কতক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে ছিল, তাও বুঝতে পারছে না। তবে সময়টা যে নেহাত কম নয়, চাঁদের আলোয় গাছপালার ছায়ার দৈর্ঘ্য দেখে কিছুটা আঁচ করা যাচ্ছে।

বুকের কাছে ব্যাণ্ডেজটা ওকে জানান দিচ্ছে আহত হওয়ার কথা। তবে অবাক হচ্ছে ও। ব্যাণ্ডেজটা বোধ হয় কেউ নতুন করে বেঁধে দিয়েছে। কাজটা কি শেরিফের? চিন্তাটাই অবিশ্বাস্য। ঠিক ওর জন্যে একটা ঘোড়া রেখে যাওয়ার মতই। পুরো ব্যাপারটাকে ওর কাছে একটা ফাঁদের মত মনে হচ্ছে। ওর মন চাইছে, এখান থেকে এক্ষুনি পালিয়ে যেতে।

কিন্তু সে জন্যে আগে ওর একটা ঘোড়া দরকার।

বাতাসের বেগ বেড়ে গেছে হুট করে। গাছের ছায়াগুলো আগের চেয়ে দ্রুত নড়াচড়া করতে শুরু করেছে। অন্ধকার থেকে একটা প্যাঁচার তীক্ষ্ণ ডাক ভেসে এল। কোনও কারণ ছাড়াই ফ্রাঙ্কের মনে হলো এটা একটা অশুভ সঙ্কেত। ওর সামনে হয়তো আরও বিপদ ওত পেতে আছে। হোলস্টারে হাত চলে গেল ওর। ঠাণ্ডা ইস্পাতের নলের ছোঁয়া মনে কিছুটা স্বস্তি আর বিশ্বাস

ফিরিয়ে আনল।

সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে পড়ল যে, টার্নারের আস্তাবলে ব্রীনের সাথে গোলাগুলির পর এখনও পিস্তলে গুলি ভরা হয়নি। হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে খোসাগুলো ফেলে দিয়ে তাজা বুলেট ভরতে গেল।

ও জানে, ওর এক্ষুণি এখান থেকে সরে পড়া উচিত।

চাঁদের আলোয় চারদিক মোটামুটি ফরসা এখন। আবার চোখ বুলাল সে। আগে যা দেখেছে, তা ছাড়া নতুন কিছু আর চোখে পড়ল না।

বাতাসে দুলছে উইলো গাছের ছায়া। ফ্রাঙ্কের মনে হচ্ছে অশরীরী ছায়াগুলো মিটিমিটি হাসছে ওর দিকে চেয়ে। হতাশ বোধ করছে ও। ওর কোমরে গোঁজা কার্তুজের বেল্টটা নেই। তারপর ফের শান্ত হলো। ভাবল, আর কিছু নয়–ও একটা ভুল করেছে, এটা সে ভুলের মাশুল। ও এখন বুকের ক্ষতে চিনচিনে ব্যথা ছাড়া আর কিছু অনুভব করছে না।

ব্যাপারটা সম্ভবত বুঝতে পারছে ও এখন। শেরিফ লেইফ তার পাসিসহ শহরে ফিরে গেছে। ও যা বলেছে, তা পরখ করে দেখাই তাদের উদ্দেশ্য। ওকেও সঙ্গে নিয়ে যেত। কিন্তু অজ্ঞান হয়ে পড়ার পর ওর ক্ষতটা পরীক্ষা করে অবস্থা বুঝতে পেরেছে। ওকে নিয়ে শহরে যাওয়াটা ঝামেলা হবে মনে করে এখানে ফেলে রেখে গেছে। তা ছাড়া নিশ্চয় ভেবেছে, ফ্রাঙ্কের কাছে যেহেতু ঘোড়া নেই, পালাতে চাইলেও পায়ে হেঁটে বেশি দূর যেতে পারবে না।

ও যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়, রোয়ান সম্ভবত তখনই ভয়ে পালিয়েছে। শেরিফ অবশ্য ওর গল্প বিশ্বাস করেছে, কিন্তু সেটের অবিশ্বাস ও আপত্তির কারণে ওর কাছে পিস্তল রেখে গেলেও ওটার চেম্বার খালি করে গেছে।

এখন ঘোড়াটা ফিরে এসেছে। ফ্রাঙ্ক চেয়ে আছে ওটার

দিকে। কিন্তু জলজ্যান্ত ঘোড়াটা দেখেও ব্যাপারটা বিশ্বাস হতে চাইছে না ওর। রোয়ানের ফিরে আসার ব্যাপারটা যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে না। এটা ওর ঘোড়া নয়—সাই টার্নারের। ফ্রাঙ্ক নিয়ে এলেও ছাড়া পেয়ে ফের নিজের আস্তাবলেই ফিরে যাওয়া উচিত ছিল ওটার। ঘোড়ার মত প্রভুভক্ত প্রাণীর জন্যে সেটাই স্বাভাবিক। একবার পালিয়ে গিয়ে ফের ওর কাছে আসবে কেন?

ঘোঁৎ করে নিঃশ্বাস ফেলল ফ্রাঙ্ক। ব্যাপারটা একটুও পছন্দ হচ্ছে না ওর। প্যারাডাইসে পৌঁছে ওর কথার সত্যাসত্য প্রমাণ করতে শেরিফের লোকদের বেশিক্ষণ লাগবে না। ও বলেছে, টার্নারের আস্তাবলে ব্রীনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। এটা বলা ঠিক হয়নি। ওরা প্রথমে টার্নারের কাছে গিয়ে জানতে চাইবে। আর টার্নারও বলতে একটুও দেরি করবে না যে, ফ্রাঙ্ক সেলজার ওকে মারধর এবং আহত করে আস্তাবল থেকে ঘোড়া চুরি করে পালিয়েছে।

দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে রোয়ানটার দিকে এগোল ফ্রাঙ্ক।

ঝোপের ফাঁকফোকরে চাঁদের আলো পড়ে বিচিত্র দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যে রোয়ানটাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন আকাশ থেকে ঝুপ করে পড়া কিংবা মাটি ফুঁড়ে ওঠা অলৌকিক কোনও ঘোড়া। যতই কাছে যাচ্ছে, ততই নার্ভাস বোধ করছে ফ্রাঙ্ক। শিস দিয়ে ঘোড়াটার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইল ও। পরক্ষণে মত পাল্টাল। সে এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না যে, শেরিফের লোকদের কেউ ওকে পাহারা দিচ্ছে না।

সে ঘোড়াটাকে ইশারা দেয়ার চেষ্টা করল। শরীর বাঁকা করে নিচু হলো বালতিতে পানি ভরার মত করে। ব্যাপারটা লক্ষ করল রোয়ান। ডেকে উঠল মৃদু স্বরে। তবে ঝোপ ছেড়ে বেরিয়ে আসার আগ্রহ দেখাল না।

কপাল বেয়ে বৃষ্টির ফোঁটার মত টপ টপ করে ঘাম ঝরছে

ফ্রাঙ্কের। রোয়ানের আরও কাছে গেল। এখন প্রতিটি পা ফেলছে প্রায় জোর করে। জিনিসটা যখন চোখে পড়ল, তখন ঝোপের ছায়ার ভেতর ঢুকে পড়েছে ও।

রোয়ানের পিঠে স্যাডল আর স্যাডল ব্যাগে একটা উইনচেস্টার।

থমকে দাঁড়াল ফ্রাঙ্ক। আবার ফাঁদের ভয় করতে শুরু করেছে। ওর মনে পড়ছে, রোয়ানের স্যাডলে কোনও উইনচেস্টার ছিল না। বুকের ভেতর ভয়ের আভাস টের পাচ্ছে ও। কিন্তু এটাও বুঝতে পারছে যে, এতদূর এগিয়ে এসে এখন আর পিছিয়ে যাওয়ারও কোনও মানে নেই।

খালি পিস্তলটা এখনও ওর হাতে ধরা। আরও সামনে এগোল সে। ঝোপঝাড়ের ভেতর কালিগোলা অন্ধকার। প্রতিটি পা ফেলতে গিয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে ওর। মনে হচ্ছে মৃত্যু বুঝি এই ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ছে। মরার আগে মরা কাকে বলে অক্ষরে অক্ষরে যেন বুঝতে পারছে ও। বাতাসের তাড়নায় ঝোপের ভেতর অস্পষ্ট শব্দ হতেই লাফিয়ে উঠছে ভেতরটা। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে এই বুঝি পিস্তল বা রাইফেলের হ্যামার টেনে দেয়ার শব্দ শুনতে পাবে।

প্রতিটি পদক্ষেপকে মনে হচ্ছে এটাই বুঝি জীবনের শেষ পদক্ষেপ।

তবে যা-ই হোক, ফ্রাঙ্ক এখন মরিয়া। সামনের ওটা ঘোড়া হোক আর ঘোড়ার ছায়া হোক, কিছুই আসে যায় না। যেভাবেই হোক, ওটার কাছে তাকে পৌঁছাতেই হবে। এরপর কী হবে, তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না।

তবে কিছু ঘটল না। ছায়া থেকে কেউ লাফিয়ে বেরিয়ে এসে ওর ঘাড়ে পড়ল না। কেউ তাকে থামতেও আদেশ করল না। সোজা রোয়ানের কাছে পৌঁছে গেল ও। লাগাম ধরল। তারপর

ওটার পিঠে চড়তে গেল। কিন্তু আহত শরীরে টের পেল ব্যাপারটা অত সহজ নয়। দাঁতে দাঁত চেপে বারকয়েকের প্রাণান্তকর চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত রোয়ানের পিঠে উঠে বসল।

ঝোপের ভেতর থেকে বাগলারকে বের করে আনল। থামল ঝোপের ধারে। আচমকা স্টেজে কালোচুলের মেয়েটার কাছ থেকে নেয়া তার নাম লেখা কাগজটার কথা মনে পড়ল ওর। কাগজটা ড্রামার তার অর্ডার বুকের পাতা ছিঁড়ে দিয়েছিল। কাগজটার কথা কেন মনে পড়ল কে জানে? এমন নয় যে, কাগজটা ওর বর্তমান অবস্থায় কোনও কাজে আসবে। তবু ব্যস্তভাবে খুঁজল ওটা পকেটে হাত ঢুকিয়ে।

কিছুই পাওয়া গেল না। এবার বাম হাত ঢোকাল বাম পকেটে। নেই। কোথায় রেখেছে মনে করতে পারল না। সম্ভবত টিম ফলির রেস্তরাঁর পেছনে বাকস্কিনটাকে রেখে আসার সময় কাপড়চোপড়ের সাথে ফেলে এসেছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। তবু কী মনে করে মাথা থেকে হ্যাটটা সরিয়ে হাত দিল এর সুয়িটব্যাণ্ডে। দারুণ সন্তুষ্টির সঙ্গে আবিষ্কার করল, কাগজটা ওখানে। কিন্তু ওখানে কখন রেখেছে, অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারল না। অত কাণ্ড করে নেয়া ওই কাগজটার অস্তিত্বই যেন সে কিছু সময়ের জন্যে ভুলে গিয়েছিল।

কাগজটার ভাঁজ খুলে সমান করল ফ্রাঙ্ক। তারপর মেয়েটার নাম পড়তে চেষ্টা করল। কিন্তু এখানে এই খোলা জায়গাতেও পড়ার মত পর্যাপ্ত আলো নেই। প্রথম অক্ষরটা অবশ্য 'এম' দিয়ে শুরু। তবে পুরো নামটা 'মেরী' নয়। মণ্টি হতে পারে। নামটা লিখতে পাঁচটি অক্ষর লাগে। পাঁচটি অক্ষরই আছে। তবে মেয়েদের নাম মণ্টি শুনতে যেন কেমন লাগে। ভুরু কুঁচকে ভাবল ও।

কাগজটা আবার ভাঁজ করল। ভুরু কুঁচকে আছে এখনও।

কাগজটা যদি শেরিফ বা পাসিদলের কেউ পেয়ে যেত, তা হলে কী হতে পারত, আন্দাজ করার চেষ্টা করছে। ড্রামার বলেছিল, মেয়েটা নাকি শিক্ষিত, টাকাঅলা। শেরিফ নাম দেখে মেয়েটাকে কিংবা ওর বাবাকে চিনতে পারলে অনেক সমস্যা হয়ে যেতে পারত। তখন সম্ভবত আর এভাবে ফেলে রেখে যেত না–গেলেও হাত-পা বেঁধে রেখে যেত, একজন হলেও পাহারাদার থাকত।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ফ্রাঙ্ক। বড় বাঁচা বেঁচে গেছে সে। কিন্তু এখন ওর যা দরকার সেটা হলো যত শীঘ্র সম্ভব এখান থেকে সরে পড়া। আর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো পেছনে ট্রেইলের চিহ্ন ফেলে না যাওয়া।

বাগলারকে ঝরনার ভেতর নামিয়ে দিল ফ্রাঙ্ক। নিউ মেক্সিকান সীমান্ত এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। এই ঝরনা ধরে দক্ষিণ কিংবা পুব দিকে চললে মেক্সিকো সীমান্তে গিয়ে পৌঁছা যাবে। তারপর সেখানে গিয়ে...

'হাতদুটো মাথার ওপরে তোলো!' চমকে উঠল ফ্রাঙ্ক। ওর চিন্তা ব্যাহত হলো। 'বেরিয়ে এসো ওখান থেকে,' দ্বিতীয় আদেশ শুনল।

কখনও কখনও বিপন্ন হতে হতে মানুষ ধৈর্যের চরম সীমায় পৌঁছে যায়। তারপর মরিয়া হয়ে ওঠে। প্রতিরোধ করতে দাঁড়িয়ে যায়। ফ্রাঙ্কের ক্ষেত্রেও তা হওয়াটা অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু তা হলো না। অন্ধকার থেকে বাজখাঁই গম্ভীর ওই আদেশ শুনে সে স্রেফ একটা নিঃশ্বাস ফেলল। আসলে এতক্ষণ ধরে এরকম কিছুই আশা করছিল সে। আদেশটা শুনতে পেয়েই বরং তার কাছে ব্যাপারটা স্বাভাবিক লাগছে।

'তোমরা বরং বেরিয়ে এসো,' দু'হাত কানের গোড়ায় নিয়ে ঠেকাতে ঠেকাতে ডাকল সে। 'তোমাদের সঙ্গে ঝামেলা পাকানোর

কোনও ইচ্ছে আমার নেই।'

মুখে বলল বটে, তবে শেষ মুহূর্তে আবার আরেক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে ভাল লাগছে না ওর। এ যেন তীরে এসে তরী ডোবার মত হলো।

উইলোর অন্ধকার ঝোপ থেকে পিস্তল হাতে বেরিয়ে এল একজন। পিস্তলের নলে চাঁদের আলো পড়ে চক চক করছে। লোকটাকে চিনতে পারল ফ্রাঙ্ক। শেরিফ লেইফের দলেই ছিল। ওর গলা শুনে মনে হলো, উত্তেজনার চরম সীমায় পৌঁছে গেছে লোকটা।

'নেমে পড়ো তোমার ওই গাধামার্কা ঘোড়াটার পিঠ থেকে।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল ফ্রাঙ্ক। 'নামতে পারব বলে মনে হচ্ছে না...'

'নামতে বলছি। তোমার ওসব চালাকি আমার জানা হয়ে গেছে। কই, নামো!'

একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছে ফ্রাঙ্ক। এই লোকটার বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কম, স্রেফ মাথা গরম। যেন খুব কষ্ট হচ্ছে, এমনভাবে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল ও। এখানে পানি কিছুটা গভীর। প্রায় কোমর সমান। ঠাণ্ডা পানির স্পর্শে ওর গা শিউরে উঠল। গলা দিয়ে বেরিয়ে এল অস্পষ্ট কাতরোক্তি। টলমল করতে করতে কয়েক পা এগোল। তারপর ফের স্যাডলটা খামচে ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল।

তীরে দাঁড়ানো লোকটা এবার খিস্তি আওড়াল, 'এরপর কিন্তু আর মুখে বলব না। তাড়াতাড়ি উঠে এসো ওপরে।'

'এ-এক সেকেণ্ড।' ঠাণ্ডায় দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেল ফ্রাঙ্কের। স্যাডল থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে রোয়ানের লাগাম ধরে ওটাকে তীরের দিকে ঘোরাল। তারপর আস্তে আস্তে উঠে এল তীরে। কাদা মাটিতে পিছলে যেতে যেতে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

ফ্রাঙ্ক দেখল, লেইফের ডেপুটিকে নার্ভাস দেখাচ্ছে। উত্তেজনায় একদম কিনারে এসেছে দাঁড়িয়েছে। ফ্রাঙ্ককে দেখল ভিজে কাপড়ে থির থির করে কাঁপছে। বিদ্রূপের হাসি খেলে গেল ওর মুখে। 'তোমরা ডাকাতের দল যখন স্টেজ লুট করতে যাও, একদম বীরপুরুষ বনে যাও। আর যখন ধরা পড়ো, তখন তোমাদের বীরত্ব উবে যায়। এখন তোমাকে দেখে আমার ঠাণ্ডা পানিতে চুবিয়ে তোলা মুরগির বাচ্চার কথা মনে পড়ছে।' বাতাসে খোঁচা মারার ভঙ্গিতে ঘোড়াটাকে দেখাল। 'ছেড়ে দাও ওটাকে। ওটা তোমার চেয়ে শক্ত। টেনে আনার নামে ওটার রশি ধরে ঝুলছ কেন, অ্যাঁ?'

লাগাম ছেড়ে দিল ফ্রাঙ্ক। কয়েক পা এগোল। ডেপুটি নিজের অস্ত্র বাগিয়ে ধরল ওর দিকে। 'হাতদুটো তোলো মাথার ওপরে। নড়াচড়া করবে না।'

আদেশ পালন করল ফ্রাঙ্ক। ক্লান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কী চাও তুমি? শেলবেল্ট আর পিস্তলটাই তো?'

'ধ্যাৎ!' তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটল ডেপুটির মুখে। 'তোমার ওই বুলেটবিহীন পিস্তল দিয়ে করবটা কী? তুমি তো এখন খাওয়ার জন্যে পাতে তুলে দেয়া রোস্ট করা একটা রাজহাঁসের চেয়ে বেশি কিছু নও।'

চুপ করে রইল ফ্রাঙ্ক। 'আসলে তোমার কপালটাই খারাপ, তা না-হলে শেরিফ লেইফের পাসিতে সেট আসবে কেন? সেট প্রথম দেখাতেই তোমার রগ চিনে গেছে। তাই ঝুলিয়ে দেয়ার ইচ্ছে ছিল ওর। কিন্তু শেরিফের জন্য পারেনি।'

'আমি কিন্তু তোমার আর সেটের মাঝে কোনও পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি না। শুধু বুঝতে পারছি না যে, এসব কেন?'

'সেট তোমাকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল। শুধু শেরিফের জন্য পারেনি। লেইফ আসলে সব সময় বুড়ো মেয়েমানুষের মত

ভীতু। নইলে...'

থেমে গেল ডেপুটি। চোখ বড় বড় করে দেখল ফ্রাঙ্ককে। আচমকা থর থর করে কেঁপে উঠল ওর শরীর, প্রায় ভেঙে পড়ার মত হলো। ব্যাপারটা ছোট্ট কিন্তু নিখুঁত একটা অভিনয়। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ার ভান করল ফ্রাঙ্ক। গায়ের ওপর এসে পড়বে ভেবে আঁতকে উঠে পিছু হটল লোকটা। খিস্তি আওড়াল। ফ্রাঙ্কের বাহু ওকে ধরার আগেই পিস্তল উঁচাল ও। গুলি করল।

তবে লেইফের ডেপুটি লোকটা আদতেই নার্ভাস। পিছু হটতে হটতে গুলি করতে গিয়ে নিজের ভারসাম্য হারাল। টাল সামলাতে গিয়ে গুলির লাইন মিস করল। ফ্রাঙ্কের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল বুলেট। তবে টলমল করতে করতে শেষ পর্যন্ত কোনওমতে নিজের পতনটা রোধ করতে পারল।

ফ্রাঙ্ক ক্লান্ত, বিপর্যস্ত। প্রচুর রক্ত হারিয়ে প্রচণ্ড দুর্বলতায় ভুগছে। চোখে ঝাপসা দেখছে সব কিছু। তবু ওইটুকু সুযোগই যথেষ্ট হলো ওর জন্যে। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সোজা হলো সে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ডেপুটির ওপর। বুলেটবিহীন পিস্তলের ব্যারেলটা নামিয়ে আনল ওর মাথায়। হাঁটু ভেঙে পড়ল ডেপুটি ঝোপঝাড় আর কাদায় মুখ ডুবিয়ে।

পিছিয়ে এল ফ্রাঙ্ক। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুকুরের মত জিভ বের করে হাঁফাতে লাগল। কাজটা করতে গিয়ে ওর শরীরের যেটুকু শক্তি ছিল, তাও যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। ফুটতিনেক দূরে ওর ঘোড়া, বাগলার। পশ্চিম দিকে তাকিয়ে আছে কান খাড়া করে।

সতর্কঘণ্টী বাজল ফ্রাঙ্কের ভেতরে। সোজা হয়ে দাঁড়াল। অজ্ঞান ডেপুটির বেল্ট থেকে কার্তুজ বের করে নিয়ে নিজের পিস্তলে লোড করল। বাড়তি কিছু কার্তুজ ভরে নিল লুপে। তারপর গুটি গুটি পা ফেলে ঘোড়ার কাছে এসে ওটার পিঠে চড়ে

বসল। এগিয়ে চলল সামনে।

মেয়েটাই ওকে প্রথমে দেখতে পেল। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ঋজু ভঙ্গিতে। কথা বলছে জরাজীর্ণ পোর্চে দাঁড়ানো বিরলকেশ এক বুড়োর সাথে। লোকটার অবশ্য অন্য কোনও দিকে মন নেই। হাতে একটা মদের বোতল, কিছু একটা বোঝানোর চেষ্টা করছে মেয়েটাকে। মাঝে মধ্যে বোতল উঁচিয়ে মুখের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। ঠোঁট চাটছে একটু পরপর। মুখে কম পক্ষে মাসখানেকের না-কামানো দাড়ি। ছোটখাট লোকটা। এমন কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে, কম পক্ষে দুইবার না-দেখলে বোঝা যায় না যে, ও আসলে একজন মানুষ।

কিন্তু ও যে একটা মানুষই বটে, সেটা একটু পরই বোঝা গেল। ফ্রাঙ্কের ওপর চোখ পড়তেই আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল মেয়েটার গলা চিরে। অস্পষ্ট স্বরে কিছু একটা বলে আঙুল তুলে দেখাল ওর দিকে।

ত্বরিত প্রতিক্রিয়া দেখাল লোকটা। ওই বোতল হাতেই স্প্রিং-এর মত লাফিয়ে বেরিয়ে এল রকার থেকে। অন্য হাতে পিস্তল বের করে আনল খাপ থেকে। কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী চাও তুমি?'

ঢোক গিলল ফ্রাঙ্ক। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ওর। শব্দ বেরোতে চাইছে না। গত চার দিন ধরে ঘোড়ার পিঠে এক শ' মাইল পেরিয়ে এসেছে ও। এর মধ্যে অর্ধেক পথ জ্বরে ভুগেছে। কেবল পানি ছাড়া খাবার বলতে কিছুই পেটে পড়েনি। কোনওমতে স্যাডল হর্ন আঁকড়ে ধরে টিকে আছে ও। শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে গন্তব্যে।

'লোকটা আহত!' আবার চেঁচাল মেয়েটা। আগের মত ভয়ে বা বিস্ময়ে নয়, এবার তার গলায় নিখাদ উদ্বেগ। সামনে বাড়ল

সে, ফ্রাঙ্কের কাছে আসবে। বোতল ধরা হাতটা নেড়ে ওকে থামাল বুড়ো। খেঁকিয়ে উঠল, 'তুমি এর মধ্যে নাক গলাতে এসো না! ব্যাপারটা আমি দেখছি। এটা মনে হয় আরেকটা শয়তান। খোদার দোহাই আমি ওদের উচিত শিক্ষা দেব!'

আচমকা সারা শরীর কেঁপে উঠল ফ্রাঙ্কের। মাথা ঘুরে উঠল। জ্ঞান হারাবার আগে দেখল, বুড়োর হাতের পিস্তলের নলটা উঠে আসছে ওর বুক সই করে।

# দশ

ঘরের এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছে জো রোজালিন। ওরিয়েন্টের মালিক। হাতের কলমটা টেবিলের ওপর রেখে তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে চাইল সুজানা ক্লিনটন।

সুজানার বয়স এখন উনিশ চলছে। এই পর্যন্ত জীবনের বেশির ভাগ সময় ওর কেটেছে পুরুষদের সাথে। ও মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হয়ে যায়, এত ঘনিষ্ঠভাবে পুরুষের সাথে চলার পরও সে এখনও মেয়ে থাকে কী করে! ওর চালচলন, আচার-আচরণ সবই প্রায় পুরুষের মত। পোশাক আশাকও পুরুষের। আর এখন সে পুরুষদের মতই রুক্ষ গলায় কথা বলছে রোজালিনের সঙ্গে, 'এটা একটা স্বাধীন দেশ, বুঝলে? যে যা ইচ্ছে, তা করতে পারে না। নাকি তুমি এরই মধ্যে ভেবে বসে আছ যে...'

জো রোজালিনের প্রাজ্ঞ দু'চোখে দুঃখী দুঃখী ভাব।

এবড়োখেবড়ো দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে দেশলাইয়ের কাঠির গুঁতোয় ময়লা পরিষ্কার করার চেষ্টা চালাচ্ছে লোকটা। থুঃ থুঃ করে থুতু ফেলল। তারপর বলল, ‘সে আর বলে লাভ কী? তুমি তো ওকে চেনই। তোমার কি মনে হয় না, আগের চেয়ে সে এখন আরও বেশি করছে?’

চুপ করে রইল সুজানা। আগের সেসব দিনের স্মৃতি এখনও ওর মনে জ্বলজ্বল করছে। সেই কাউহ্যাণ্ড, পিস্তলবাজ, জুয়াড়ী আর ভবঘুরের দল। এরা সবাই ওর বাবাকে সমীহ করে চলত। ছোট বেলায় দেখেছে সে এসব।

*বক্সড ওয়াই* আজকের র‍্যাঞ্চ নয়। অনেক আগে এখানকার পাথুরে বেসিন ছিল জেরেনিমো অ্যাপাচিদের প্রিয় শিকার ক্ষেত্র। এখানে ছিল সবচে' উৎকৃষ্ট পানি, ভাল ঘাস। গ্যালিউরাস পর্বতমালার উঁচু চুড়ো উত্তর থেকে আসা হিমশীতল বাতাস ঠেকাত। ঠিক তখনই এই র‍্যাঞ্চটা গড়ে উঠেছিল ওর বাবার স্বপ্নের জগৎ হিসেবে। ওরই মত দুর্ধর্ষ চল্লিশ জন কাউবয়ের পাহারায় দুর্ভেদ্যপ্রায়।

কিন্তু সেসব বহুদিন আগের কথা। তখন মাত্র সুজানার জন্ম হয়েছে। এই উপত্যকা তখন এখনকার মত এমন শ্রীহীন ছিল না। অবশ্য এখনও এখানে অনেক গবাদিপশু চরে বেড়ায়। তবে চারণভূমির আয়তনের তুলনায় তাদের সংখ্যা বেশি হয়ে যাওয়ায় ঘাস গেছে কমে। ওদিকে গাছের সংখ্যাও আর আগের মত নেই। অনেকগুলো ঝরনা শুকিয়ে গেছে। আর কয়েক বছর ধরে বৃষ্টি কম হওয়ায় অবস্থা আরও খারাপ। এদিকে *ডেভিল আয়রন* কাঁটাতারের বেড়া দিতে শুরু করার পর থেকে অবাধ গোচারণের সুযোগও গেছে সঙ্কুচিত হয়ে।

*বক্সড ওয়াই*-এর সুদিন ফুরোতে শুরু করেছিল সুজানার মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই। প্রভাব-প্রতিপত্তি কমতে থাকে। যে-

রাতে মা মারা যায়, সে-রাত থেকেই যেন বাবার ভেতর দেখা দেয় বিশাল এক পরিবর্তন। উচ্ছৃঙ্খল জীবনের শুরু তার তখন থেকেই। মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় আর মদে উচ্ছন্নে যেতে শুরু করে রডহ্যাম রোনাল্ড আর তার র‍্যাঞ্চ। ওর বন্ধুর সংখ্যা কমতে শুরু করে। মাসে পঞ্চাশ ডলারের বেতনভোগীরা সময় থাকতে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে যায়।

পয়েন্ট ফরটি ফাইভে রড রোনাল্ডের চালু হাতের কথা এখন কেবল পুরানো মানুষদেরই অবসরের আড্ডার খোরাক মাত্র। *বক্সড ওয়াই*-এর সেরা গোচারণভূমিগুলো এখন লামট্রিলদের দখলে।

'তোমার কি মনে হয় না আগের চেয়ে লামট্রিল এখন আরও বেশি করছে?' আগের কথাটা পুনরাবৃত্তি করল জো।

'সম্ভবত তা-ই।' মাথা নাড়ল সুজানা।

'তা হলে দেখো,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রোজালিন। 'কিন্তু এর কোনও বিচার তুমি পাচ্ছ না। কার কাছে পাবে? সত্য এবং ন্যায়ের বিজয় সম্পর্কে আমরা যত কথা শুনি, সেসব কেবল বইয়ের পাতায়। বাস্তবে এর উল্টোটাই। তুমি জান সিম্ডসন কেমন বিচারক। একটা মেরুদণ্ডহীন গর্দভ, লোভী শেয়াল...'

'কিন্তু ও তো শপথ করে বিচারক হয়েছে। সব সময় সবার প্রতি...'

'ওরা সবাই এরকম শপথ নেয়। ওগুলো কেবল শপথই। ওর কাছে তুমি কী আশা করবে? ও তো স্রেফ পোষা কুকুর। সে যে হাত থেকে মাংসের টুকরো খায়, সে হাতে কি কখনও কামড় দেবে?'

'ওর বেতন দিই আমরাই। আমাদের ট্যাক্সের পয়সায় ওর সংসার চলে। সুতরাং ওর কাছে এটা আমাদের পাওনা।'

'ওটা কাগজে কলমে। এখানে তা আশা কোরো না। ন্যাট

লামট্রিলের হুকুম ছাড়া সিব তার প্যান্টের বোতামও লাগায় না।'

'তা হলে সিবের আশা করে লাভ নেই। আমাদের অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা সিবের ওপরঅলার কাছে যাব। আমরা বরং কমিশনারদের কাছে যাব।'

'সেটা হবে আরেক পাগলামি,' শুকনো স্বরে বলল জো। 'যে তিনজন নিয়ে কাউন্টি সুপারভাইজার বোর্ড, তারা হলো জুলেস অ্যাকটেইন, অ্যাবে ক্রানজ আর ন্যাট লামট্রিল। জুলেস অ্যাকটেইন আর অ্যাবে ক্র্যানজ ন্যাটের কথার বাইরে যাবে না। বিভিন্নভাবে এদের স্বার্থ জড়িত ন্যাটের সাথে।'

মুখটা একটু উঁচাল জো। শুকনো হাসি হাসল। 'ওদের কেউ ন্যাটকে ঘাঁটাতে চাইবে না। এমনকী তোমার জন্যে হলেও না। নিজের স্বার্থ সবাই বোঝে।'

রাগের ঝিলিক দেখা গেল সুজানার চোখে। 'নিশ্চয় কিছু না কিছু পথ আছে। সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।'

মেয়েটির মুখে সব কিছু ভেঙে চুরে তছনছ করে দেয়ার মত আগ্রাসী ভাব দেখল জো রোজালিন। উদ্বেগ বোধ করল। মৃদু স্বরে জানতে চাইল, 'সিব ডসনকে কী বলতে চাও এখন?'

'অভিযোগ করব ন্যাটের বিরুদ্ধে। বলব আমাদের পূর্ব-দক্ষিণ সীমান্তে *ডেভিল আয়রন* কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে।'

ভ্রূজোড়া হ্যাটব্রীমের কাছে উঠে গেল রোজালিনের। 'বীয়ার ফ্ল্যাটস রেঞ্জে?'

'হ্যাঁ, লেকসহ।'

মাথা নাড়ল জো। 'আমি সব সময় তোমার বাবাকে বলতাম, পানির কাছে র‍্যাঞ্চহাউস না-বানিয়ে বিরাট ভুল করেছে সে।' কাউন্টারের ওপর একটা হাত রেখে মৃদু স্বরে তবলা বাজাল। আনমনে চিন্তা করছে। দেখে মনে হচ্ছে, সুজানা যা বলেছে, মনে মনে তা বিচার করে দেখছে। 'তা তোমার বাবা এখন কী করবে

BanglaBoi.org

বলে ভাবছে?'

ওর দিকে এক নজরে তাকিয়ে আছে সুজানা। লোকটা কী বলেছে বোঝার চেষ্টা করছে। তারপর কিছুটা আশাহত স্বরে বলল, চল্লিশ সেকশন জমি লামট্রিল চুরি করে নেয়ার পর যা করেছিল, সম্ভবত তা-ই করতে যাচ্ছে।'

'পিকলের নিজেরও চল্লিশ রড গেছে,' রুক্ষস্বরে বলল ওরিয়েন্ট প্রোপ্রাইটার। 'তবে ও এখন ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছে যে, ওই পানিটা ওর ছিল।'

'গরুগুলো ভুলবে?'

'না, ভুলবে না।' একমত হলো রোজালিন।

'আমিও ভুলব না।'

রেগে গেল রোজালিন। 'তোমার বাবার ওসব দামী দামী কাউহ্যাণ্ডগুলো কোথায় এখন?'

'ওরা আর আমাদের হয়ে কাজ করছে না।'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ, তোমার বাবার হুঁশ ফিরেছে তা হলে? ওদের বিদেয় করে দিয়েছে?'

বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল সুজানার। ম্লান স্বরে বলল, 'না, ওদের বেতন দেয়ার মত টাকা নেই আমাদের।'

'তা হলে তোমাদের কাজের লোক বলতে একটিও নেই আর। লামট্রিল জানতে পারলে আর দেরি করবে না। হামলে পড়বে এসে। তুমি, মেয়ে, বরং শহরে থাকো। আমি ন্যাটকে বেশি নয়, মাসদুয়েক সময় দিচ্ছি, এরপর তোমাদের আর *বক্সড ওয়াই* নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। ও সবখানে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে দেবে।'

আবার ঝলসে উঠল সুজানার চোখ। 'তুমি সম্ভবত একটা কথা ভুলে যাচ্ছ!'

'কী?'

'আমার কথা। আমি এখানে আছি। আমি বাবার মত হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে পড়িনি।'

'তুমি,' বিরক্তি ফুটল রোজালিনের চোখে। 'তুমি, মেয়ে, নিজেকে এসবের বাইরে রেখো। রেঞ্জ ওয়ারে জড়িয়ে পড়া মেয়েদের কাজ নয়।'

'বাবা যদি রাজি হয়,' ওরিয়েন্ট প্রোপ্রাইটারের কথায় কান দিচ্ছে না সুজানা, 'আমি ঠিক করেছি, ওক রিজ লাইন ক্যাম্পের কাছের দশ সেকশন জমি বন্ধক দেব। তাতে আমরা প্রচুর নগদ টাকা হাতে পেয়ে যাব...

'আরও বেশি মদ কেনার জন্যে?'

'ওই টাকা আমি নিজে খরচ করব, জো।'

'বেশ। কিন্তু তাতে লাভটা কী হবে শুনি? বড়জোর দু'হাজার ডলার? ওই টাকা দিয়ে লামট্রিলকে কেনার আশা কোরো না।'

'আমি তাকে কেনার কথা ভাবছি না।'

'আচ্ছা, বেশ,' ধৈর্য ধরে মেয়েটাকে বোঝাতে লেগে গেল রোজালিন। 'তুমি যদি ওক রিজ বন্ধক দাও, তা হলে বীয়ার ফ্ল্যাটসের পানিটা পাচ্ছ না। তাতে তোমার গরু চরানোর জায়গা অনেক কমে যাবে। বাস্তব অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করো আগে...'

'আমি বুঝে শুনেই এ সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি।' সরাসরি জো-র চোখের দিকে তাকাল সুজানা। 'নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্যে এর বিকল্প আর কিছু দেখছি না।'

আরও চিন্তাকুল দেখাল জোকে। এই মেয়ে, যে এখন ওর চোখে চোখে তাকিয়ে একটা চরম সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে, সে ধরতে গেলে ওর চোখের সামনেই বড় হয়ে উঠেছে। এতটা বয়স পর্যন্ত এক কঠোর বাস্তবতার ভেতর দিয়ে এসেছে সে। মা মারা যাওয়ার পর ওর যে-কোমল আশ্রয়টুকু ছিল, সেটুকুও গেছে নস্যাৎ হয়ে। অধিকাংশ যুবতী মেয়ে যে-স্বপ্নের ভেতর দিয়ে ভবিষ্যৎ

জীবনটাকে দেখার সুযোগ পায়, সুজানার জীবনে তার অনুপস্থিতি বড় প্রকট। ওর কানে সঙ্গীত বলতে সিক্সগানের গুলির শব্দ, বিনোদন ঘোড়া ও গরুর কর্কশ খুরধ্বনি। ওর জন্যে এখন খুব খারাপ একটা সময় যাচ্ছে। প্রখর বাস্তববাদী সুজানা তার সামর্থ্যানুযায়ী ঘটনার মোকাবিলা করতে তৈরি হয়েছে।

ঘোড়ার পিঠে চড়ার বয়স হওয়ার পর থেকে স্যাডলেই জীবন কাটাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে সুজানা। নিজের সততা থেকেই জো ওকে বাঁচাতে চায়, চায় ওর প্রয়োজনে নিজ থেকে সাহায্য করতে। কিন্তু ওকে সাহায্য করতে যাওয়া মানে এমন এক ব্যক্তির বিপক্ষে দাঁড়ানো, যে সান পেদ্রো ও পাইনলেনোর মাঝের প্রতি ইঞ্চি জায়গা নিজের করে পেতে চায়। সে উদ্দেশ্যে কাজও করে যাচ্ছে। প্রতিটি পরিকল্পনা দাঁড় করানো হচ্ছে সে উদ্দেশ্য সামনে রেখেই। সুজানা রোনাল্ডের সামনে ন্যাট লামট্রিলের লোভের আগুনে পুড়ে ছাই যাওয়া ছাড়া আর কোনও পথ দেখছে না জো।

'তোমার মনের ভেতর কী হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি, সু,' অবশেষে বলল। 'আমি জানি, এই র‍্যাঞ্চটা তোমার কাছে কী। কিন্তু এও জানি, ন্যাট লামট্রিল এখন কত বড় প্রতিপক্ষ। এই বেসিনে কারও সাধ্য নেই ওর কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তুমি নিজেই জান কতগুলো আউটফিট ও এরই মধ্যে গ্রাস করে নিয়েছে। *স্পার, থ্রী ক্রস, ব্রাড অ্যান্ড কমপাস*...। গতকাল শহরের দক্ষিণে *সার্কেল সি*র মালিক বেন ক্রিসপিনের সঙ্গেও চুক্তি হয়ে গেছে ওর।' একটু থামল জো। 'শোনো, মেয়ে। তোমার বয়স কম। জীবনে অনেক কিছুই এখনও উপভোগের রয়ে গেছে তোমার জন্যে। তুমি চাইলে...'

'তুমি শুধু শুধু বক বক করছ, জো। আমি *বক্সড ওয়াই* ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না।'

অস্বস্তিভরে ওর দিকে চাইল জো। 'তুমি ঠিক কী করতে চাইছ, সুজানা? তুমি কী করে ঠেকাবে ওকে?'

'আমি সিব ডসনকে আরেকবার সুযোগ দেব। সে রাসলিং বন্ধ করার জন্যে কিছুই করেনি। কিন্তু এবার যদি লামট্রিলের লোকদের বীয়ার ফ্ল্যাটস থেকে তাড়ানোর ব্যবস্থা না-নেয়, তা হলে ওর ওষুধেই ওর চিকিৎসা করব।'

'তার মানে প্রথম চালটা তুমি দিতে যাচ্ছ?'

'ঠিক ধরেছ।'

পরিষ্কার অসম্মতির চিহ্ন ফুটল জো-র চোখে। 'কিন্তু...হা ঈশ্বর! তুমি কী বলছ, মেয়ে? তোমার তো লোকজন বলতে কিছুই নেই। এখানে লোকবল আর অস্ত্রের জোর ছাড়া আর কিছুতেই কাজ হবে না।'

'কে বলেছে তোমাকে যে আমার কোনও জোর নেই?'

'কীসের জোর? এ-অঞ্চলে লামট্রিলের কথায় ঝাঁপিয়ে পড়ার মত লোকের অভাব হবে না। তারা বোঝে রুটির কোন্ পিঠে মাখন। এ-অঞ্চলের প্রতিটি আউটফিট লামট্রিলের ধামাধরা...'

'এখন অবশ্যই তাই। তারা তোমার মতই ভয়ে বিহ্বল। লামট্রিল হাত তোলার আগেই লেজ গুটিয়ে ভাগার জন্যে তৈরি। তবে আমার বিশ্বাস, আমি সে-অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারব। আমি যদি ওদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত দাঁড় করিয়ে দিতে পারি, তা হলে তারাও এগিয়ে আসবে সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে।'

BanglaBoi.org

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, মেয়ে। ওই লোকটা নেকড়ের চেয়ে ভয়ঙ্কর। এতটা পথ হেঁটে এসে তোমার মত একটা বালিকার ভয়ে সে লেজ নামিয়ে নেবে, স্বপ্নেও কল্পনা করতে যেয়ো না। ওর সামনে একটা লোভনীয় গরম বিস্কুটের মত...'

সুজানা হাসল। 'ওই লোভনীয় গরম বিস্কুট খেতে গিয়ে যাতে গালে ছ্যাঁকা লাগে, আমি সে-ব্যবস্থাই করব। সিব যদি লামট্রিলকে আমাদের পানি থেকে সরাতে ব্যর্থ হয়, তা হলে আমি জমি বন্ধক দেয়া টাকা দিয়ে বন্দুকবাজ ভাড়া করব।'

'বন্দুকবাজ!' আচমকা এক পা পিছিয়ে গেল জো রোজালিন। দু'চোখ ডিমের মত গোল বানিয়ে ফেলল। 'তুমি কি বুঝতে পারছ যে, তুমি কী বলছ?'

'ঠিকই বুঝতে পারছি, জো,' শান্ত কিন্তু দৃঢ়স্বরে বলল সুজানা। 'যা বলছি, তা বুঝে শুনেই বলছি।'

ওর দিকে চেয়ে আছে রোজালিন। বিশ্বাস হতে চাইছে না, যার মুখ থেকে কথাগুলো শুনছে, সে নেহাত একটা বাচ্চা মেয়ে। ওকে একজন পরিপূর্ণ পুরুষের মতই লাগছে এখন। কিন্তু সে জানে, সুজানা পুরুষ নয়, স্রেফ একজন মেয়ে। ন্যাট লামট্রিলের এক ফুঁয়েই উড়ে যাবে।

কিন্তু যাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা, সে যেন পাত্তাই দিতে চাচ্ছে না এসব। আবার ওর কোমল কিন্তু দৃঢ় গলা শুনতে পেল ও। '*বক্সড ওয়াই*তে একজন বন্দুকবাজ আছে, এটা লামট্রিলের জন্যে সোনার মতই একটা খবর হবে বটে। কারণ এখন আর সে কোনওরকম বাধার কথাই ভাবছে না। খবরটা শুনে সে একটু থমকে যাবে। নিজের কাজগুলো নিয়ে একটু ভাবতে চাইবে। এটা এর আগে ও আর কখনও করেনি।

'এ পর্যন্ত যতগুলো দখলের কাজ করেছে, একটি নিয়েও খুব একটা ভেবে দেখার প্রয়োজন মনে করেনি ও। আমি ওকে ভাবতে বাধ্য করব। ও জানবে, আগের মত বেসামালভাবে এগোলে সে প্রতিপক্ষের গুলির টার্গেট হবে। এই যে ভয়, এটাই তাকে হিসেব করে কাজ করতে বাধ্য করবে।'

এক মুহূর্তের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল জো-র চোখদুটো।

কিন্তু পর মুহূর্তে ফের ম্লান হয়ে গেল। 'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল ও। 'কোনও সুযোগ নেই। তুমি যেভাবে বলছ, শুনতে ভালই লাগছে। কিন্তু এটাকে কাজে পরিণত করা সম্ভব হবে না। প্রথমে তোমাকে ওই ধরনের একজন পেতে হবে। তারপর...'

'আমার নিজেরই একটা অস্ত্র আছে, জো। আমি নিজেও গুলি চালাতে পারি।'

আবার ওর চোখের দিকে তাকাল জো। মেয়েটার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সে যা বলছে, তা করবেই। কোনও কিছুতেই পিছু হটবে না। এবার ব্যঙ্গ ঝরল ওরিয়েন্টাল প্রোপ্রাইটারের কণ্ঠ থেকে, 'কী মনে হয় তোমার? তোমার হাতে অস্ত্র দেখলেই লেজ গুটিয়ে পালাবে লামট্রিল আর তার লোকেরা?'

'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী?'

ঘোঁৎ করে উঠল জো রোজালিন। 'এটা বোকামি হবে, মেয়ে, স্রেফ বোকামি। তুমি...'

'লামট্রিলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোটা?'

'না, এমন একটা র‍্যাঞ্চের পক্ষে দাঁড়ানো যেটার বস একটা প্রায়-বাচ্চা মেয়ে আর একজন মাতাল বুড়ো। *ডেভিল আয়রন* তাদের সব লোক লেলিয়ে দেবে তোমার পেছনে। সুজানা, তুমি এমনকী, কাজটা শুরুও করতে পারবে না। তার আগেই স্রেফ ধুয়ে মুছে যাবে।'

'পাহাড়ের ওপাশে প্রচুর ছোটখাট র‍্যাঞ্চ আছে, যারা এরকম একটা সুযোগ আছে জানলে কোমর বেঁধে চলে আসবে।'

'তোমার বাবার পঞ্চাশ ডলার বেতনের কাউবয়দের কাছে যা পেতে, এদের কাছেও নিশ্চয় তা আশা করছ না? এটা একটা বিপজ্জনক খেলা, সু...'

'আমিও বিপজ্জনক লোক ভাড়া করব, জো। কিড ব্যাজার, স্যাম হ্যাকবেরি, ফ্লাশ ড্রিঙ্গোর মত লোকদের...'

'খোদা!' বিস্ময়ে প্রায় গুঙিয়ে উঠল জো রোজালিন। 'তুমি এমন কিছু করতে যেয়ো না, সুজানা। তুমি বরং বুনো ইণ্ডিয়ানদের ছেড়ে দাও, তবু ওই ধরনের লোককে সানসেট ভ্যালিতে নিয়ে এসো না।'

'কিন্তু আমি তা-ই করব, জো,' গম্ভীর স্বরে বলল সুজানা। 'আমরা ওর গরুর পাল খেদিয়ে দেব, ওর ঘর-বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেব, ওর ব্যাংকে যাতে লালবাতি জ্বলে সে-ব্যবস্থা করব। তারপর ওর লোকেরা যখন বেতন পাবে না, তখন ওকে ছেড়ে চলে যাবে। ও তখন একা হয়ে পড়বে। কেবল একটা মাত্র অস্ত্র হাতে...'

'তুমি...তুমি পাগল হয়ে গেছ!' হতাশায় গলা বুজে এল রোজালিনের। 'বদ্ধ পাগল!'

'কিন্তু আমি এটা করবই।' আনমনে মাথা দোলাল সুজানা। 'সিব যদি আমার পানি থেকে *ডেভিল আয়রন*কে সরে যেতে বাধ্য করতে না-পারে, তা হলে আমি ব্যবস্থা নেব। প্রয়োজনে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেব।'

# এগারো

ধীরে ধীরে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠছে ফ্রাঙ্ক। বুড়ো পিস্তলধারীর গলা শুনল। মেয়েটাকে ফিস ফিস করে কী যেন বলছে। সাবধান করে দিচ্ছে সম্ভবত। আরেকটু পরে পরিষ্কার হলো বুড়োর কথা। বুড়ো লোকটা বলছে, ওর পেছনে হয়তো আইন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ধরতে পারলেই কোমরে দড়ি পরাবে। সুতরাং ওর ব্যাপারে কৌতূহল না-দেখানোই ভাল। এতে এখন তারা যে ঝামেলায় ভুগছে, তারচে' বড় ঝামেলা এসে ঘাড়ে চাপবে হয়তো। বুড়োটার হাতে অবশ্য এখন অস্ত্র নেই। কিন্তু মেয়েটার ভাব দেখে মনে হচ্ছে খুব একটা কান দিচ্ছে না বুড়োর কথায়।

আরেকটু সচেতন হতেই পরিষ্কার ধবধবে একটা বিছানায় নিজেকে আবিষ্কার করল ফ্রাঙ্ক। ব্যাপারটা বুঝতে পারল। বুড়ো ওকে দেখে গুলি করার জন্যে অস্ত্র উঁচিয়েছিল। কিন্তু অজ্ঞান হয়ে স্যাডল থেকে পড়ে যেতে দেখে গুলি না-করে বাসায় এনে তুলেছে। তবে ব্যাপারটায় ওর চেয়ে মেয়েটার অবদানই বেশি। এই মাত্র বুড়োর কথা শুনে মনে হলো, খুব একটা খুশি মনে কাজটা করেনি সে। হয়তো মেয়েটার পীড়াপীড়িতে না-করে পারেনি। এখনও মেয়েটা ওর কথার জবাব দিল না। চোখ খুলতে গিয়ে মত পাল্টাল ও। আপাতত নিশ্চিন্ত মনে নিঃসাড় পড়ে রইল।

প্রথম দুই সপ্তাহ প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া একবারও বিছানা থেকে নামেনি সে। তাও মেয়েটি সাহায্য না-করলে একা ওর পক্ষে বিছানা থেকে নামা সম্ভব হতো না। মেয়েটির সাহায্য না-নিয়ে উপায়ও ছিল না। তাই ইচ্ছে থাকলেও আপত্তি করতে পারেনি। তবে জ্বর চলে যাওয়ার পর দুর্বলতা সত্ত্বেও ওর সাহায্য ছাড়াই বিছানা থেকে ওঠানামা করতে শুরু করেছে। খাবারটা অবশ্য ওকে নিজের হাতে চামচে করে খাইয়ে দিত মেয়েটা। খেতে না-চাইলে জোর করে খাওয়াত। ফলে পর্যাপ্ত খাবার পেয়ে দ্রুত শক্তি ফিরে পেতে লাগল ওর শরীর। কিন্তু বিপত্তি দেখা দিল জ্বর চলে যাওয়ার পর মেয়েটি তার গা ধুইয়ে দেয়ার সময়। মেয়েটির শরীর একহারা, ওকের খুঁটির মত সাদা আর শক্ত। দৃঢ়হাতে গরম পানি দিয়ে ওর শরীরের ওপরের অংশ রগড়ে ধুয়ে

যখন নীচের দিকে হাত বাড়াল, দুর্বল দু'হাতে বাধা দিতে গেল ফ্রাঙ্ক। 'আরে, কী করছ তুমি?'

'চুপচাপ বসে থাকো!' ছোট একটা ধমক দিল মেয়েটা। 'ছাগলের মত তিড়িং বিড়িং লাফাচ্ছ কেন? আমার কাছে তুমি এখন রোগী বই আর কিছু নও।'

'কিন্তু আমার কাছে তোমাকে রোগী মনে হচ্ছে না,' গোমড়া মুখে পাল্টা যুক্তি দিল ফ্রাঙ্ক। 'তুমি একজন সুস্থ সবল মানুষ।'

'তার মানে তুমি সারাক্ষণ এসব নোংরা কাপড়চোপড় পরে থাকবে নাকি? তোমার কি একবারও মনে হয় না যে, ওগুলো ধোয়া দরকার?'

'ঠিক আছে। তোমার মন চাইলে ওগুলো নিয়ে ধুয়ে দিতে পার। তবে আগে ওগুলো ছাড়াবার সুযোগ আমাকে দাও। তুমি সরে যাও এখান থেকে। আমি ওগুলো ছাড়ছি।'

কথাগুলো এমনভাবে বলল যে, আলোচনা ওখানে শেষ হয়ে গেল।

একটা ব্যাপার নিয়ে ভাবছে ফ্রাঙ্ক। মেয়েটির জেদের কারণে সে এখানে আছে। একজন অসুস্থ মানুষের জন্যে যতটা সেবা-যত্ন দরকার, তার প্রায় সব কিছুই পাচ্ছে সে। এর অর্থমূল্য কম নয়। তবে মেয়েটি মনে হয় না টাকা-পয়সার আশায় এসব করছে। ওর প্রতিটি কাজে আন্তরিকতার ছোঁয়া ঠিকই টের পাচ্ছে সে। আর এমনও মনে হচ্ছে, ওর এখানে আসাটা যেন ঈশ্বরেরই ইচ্ছে ছিল। নইলে কখনও হয়তো এদিকে আসা হতো না।

তবে বুড়োর অবস্থা ভিন্ন। লোকটা ওকে দেখামাত্রই ঝামেলা পাকানোর জন্যে মুখিয়ে উঠেছিল। গুলিই করে দিত হয়তো ফ্রাঙ্ক অজ্ঞান হয়ে পড়ে না-গেলে। এখনও লোকটা ওর ওপর বিরূপ। চোখে-মুখে সারাক্ষণ তারই স্পষ্ট আভাস।

এটা একটা র‍্যাঞ্চ। কিন্তু এরকম অদ্ভুত জায়গা ও আর

দেখেনি। এখানে কাউকে সে প্রাণ খুলে হাসতে শোনেনি। কর্মচারীরা দিনের অর্ধেকেরও বেশি সময় তাস খেলে কাটায়। ও যে ঘরে শোয়, তার ডানদিকে বাঙ্কহাউস। সারাক্ষণই তার জানালাগুলো ঢাকা থাকে কাপড়ের পর্দায়। আর তারা কখনও দিনের বেলায় র‍্যাঞ্চের বাইরে যায় না। যদি কোথাও যেতে হয়, সে রাতের বেলায়। ফ্রাঙ্ক রাতের আঁধারেই তাদের ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপাতে দেখেছে।

এর অর্থ অন্তত ফ্রাঙ্ক বোঝে। বোঝে বলেই দুশ্চিন্তায় ভোগে সে। ও ওর অতীত পেছনে ফেলে এসেছে। জীবনটা এখন অন্য রূপে কাটাতে চায়। বাঙ্কহাউসটাতে জনাছয়েক লোক থাকে। ফ্রাঙ্ক যতটুকু বুঝেছে, তাতে এদের চল্লিশ ডলার মাস মাইনের সাধারণ কাউহ্যাণ্ড মনে হয়নি। মনে হয়েছে এদের জাত ভিন্ন।

ফ্রাঙ্কের ধারণা, এধরনের র‍্যাঞ্চকে সাধারণ লোক কখনও ভাল চোখে দেখবে না। রাসলারদের আস্তানা হিসেবেই গণ্য করবে। ও নিজে অবশ্য এখনও কোনও সিদ্ধান্তে পৌছেনি। তবে ওর ধারণা, যেভাবেই হোক, এখানে একটা লড়াইয়ের প্রস্তুতি চলছে। এখানকার আবহাওয়ায় যেন ওই ধরনের একটা চাপা উত্তেজনার ভাব।

দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ দিকে স্নায়ুর ওপর একধরনের চাপ অনুভব করতে লাগল সে। বিশেষ করে মেয়েটার ব্যাপারে। মেয়েটা বেশি কথা বলে না। তবে ফ্রাঙ্ক খেয়াল করেছে, প্রায় সময় ওর দিকে তাকিয়ে ওর হাবভাব লক্ষ করে মেয়েটা। কেন বুঝতে পারে না ফ্রাঙ্ক। তবে সে তাকানোয় যে সস্তা রোমাণ্টিকতা নেই, তা বোঝে। ওর মনে হয়, এতদিন ধরে যা করেছে, এবার তার প্রতিদান চেয়ে বসবে মেয়েটা।

আরেকটা মজার ব্যাপারও লক্ষ করেছে ও। বুড়ো লোকটা বেশির ভাগ সময় কাটায় পোর্চে বসেই। হাতে থাকে সম্ভবত

মদের বোতল। কখনও কোনও কাজ করতে দেখেনি ও লোকটাকে। বাঙ্কহাউসে যারা থাকে, তাদের সঙ্গে কথা বলতেও না। ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা ছাড়া মেয়েটির সাথেও ওকে কোনও কথা বলতে শোনেনি ফ্রাঙ্ক। মেয়েটিকেও ওর কথায় তেমন পাত্তা দিতে দেখেনি। বুড়ো লোকটাও তাতে মনঃক্ষুণ্ন হয় বলে মনে হয়নি ওর।

মেয়েটির নাম সুজানা। সুজানা রোনাল্ড। চোখ দেখে মেয়েটিকে মোটেই কঠোর মনে হয় না। বরং তাতে রয়েছে অদ্ভুত এক রহস্যময়তা। সোনালী রঙের চুল। কণ্ঠস্বর ভরাট, কিন্তু অদ্ভুত রকমের মিষ্টি। কড়া কথা বললেও কানকে পীড়িত করে না। লাল দু'ঠোঁটে যে কোনও মুহূর্তে ফুটে উঠতে পারে স্মিত হাসি। ফ্রাঙ্কের মুগ্ধ দৃষ্টি ওর সুগঠিত বুকের ওপর অনেকবার আছড়ে পড়েছে।

*বক্সড ওয়াই*-এ ওর অবস্থানের দশম দিন। বিকেল বেলা। দুপুর থেকে সুজানা র‍্যাঞ্চে নেই। বুড়ো লোকটাই কেবল রয়েছে তার সে রকারে। তবে তাকে তেমন পাত্তা দেয়ার দরকার মনে করছে না ফ্রাঙ্ক। ঘরের এক পাশের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা ওর কাপড়চোপড়। ওখান থেকে নিজের পিস্তলটা নিল সে। ওটার ব্যারেলের ভেতর লুকিয়ে রাখা কাগজটা বের করল। ভাঁজ খুলে চোখের সামনে মেলে ধরল ওটা। পড়ল নামটা:

*মার্টা মে লামট্রিল*

এরকম নাম হয় অভিজাত পরিবারের মেয়েদের। নীল চোখের সে-মেয়েটির কথা ভাবল ফ্রাঙ্ক। টকটকে লাল দু'ঠোঁট। সে গম্ভীর অভিব্যক্তি, ধীর স্থির হাঁটাচলা। সব মিলিয়ে একজন পরিপূর্ণ মহিলা—একই সঙ্গে ভাল লাগার এবং সমীহ করার মত।

মার্টা মে লামট্রিল!

চিন্তাটা তটস্থ করে তুলল ওকে। ও যদি অতটা ওপরে

দেখতে চায়, তা হলে প্রথমে খুঁজে পেতে হবে ওকে। সেটাই শেষ নয়, এরপর মেয়েটার কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। ওর নিজের যে-বর্তমান অবস্থা, তাতে সেটাই হবে সবচেয়ে কঠিন কাজ। কারণ খোঁজ নিলে হয়তো দেখা যাবে পুবের অর্ধেকের বেশি ধনকুবের ওর পেছনে লাইন লাগিয়ে বসে আছে। তবে সেটা নিয়ে খুব একটা ভাবছে না ফ্রাঙ্ক। ওর কাছে মেয়েটাকে বাধা মনে হচ্ছে না। বাধা যদি কিছু হয়, সেটা ওর বাবাই। রাস্তার ভিখিরির চেয়ে বেশি কিছু ভাববে না লোকটা ওকে। ড্রামারের কথা যদি মাত্রা ছাড়িয়ে না-যায়, তা হলে মেয়েটির বাবা বিরাট বড়লোক। আর বড়লোক বাবা নিশ্চয় মেয়ের জামাই হিসেবে আরেকজন বড়লোককেই পছন্দ করবে। ওর মেয়ের পছন্দের হলেও কোনও ভবঘুরে তার কাছে পাত্তা পাবে না। কে জানে, লোকটা হয়তো ওয়াল স্ট্রীট জার্নালের রেটিং অনুযায়ী সবচেয়ে ধনী লোকটাকেই জামাই হিসেবে মনে মনে পছন্দ করে বসে আছে। কারণ মেয়ের সৌন্দর্যের চাহিদা তার মত ব্যবসায়ীর (নিশ্চয় ব্যবসায়ী, বড়লোক যখন) অজানা থাকার কথা নয়।

নামটির দিকে আবার তাকাল ফ্রাঙ্ক। ও যতটা ভাবছে, বাস্তবে মেয়েটাকে পাওয়া আরও কঠিন হবে হয়তো।

চিন্তাটাই বিরক্তিকর ঠেকল ওর কাছে। ভুরু কুঁচকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। প্রথমে ঘোড়াটাকে দেখতে পেল। তারপর ঘোড়সওয়ারকে। উঠানে এসে দাঁড়াল ঘোড়া। লাফ দিয়ে ওটার পিঠ থেকে নামল সুজানা রোনাল্ড। ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছে আগুনের মত গরম হয়ে আছে মেজাজ।

হঠাৎ কৌতূহল বোধ করল ফ্রাঙ্ক। একদৃষ্টে চেয়ে রইল মেয়েটার দিকে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে সোজা পোর্চের দিকে এগোল সুজানা। ওর ঘর থেকে পোর্চের সামান্যই দেখা যায়।

চোখের আড়াল হয়ে যাওয়ায় এবার ওদিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। সমস্ত মনোযোগ একত্রিত করে কান পাতল। ওর মনে হলো বাপ-মেয়ের মধ্যে একটা ঝগড়া বা কথা কাটাকাটি শুরু হতে যাচ্ছে। তাদের ঝগড়ার মধ্যে এই র‍্যাঞ্চ সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যাবে বলে ফ্রাঙ্কের ধারণা।

ব্যাপারটা আড়িপাতা। কাজটাকে অনৈতিক বলে ভাবছে ফ্রাঙ্ক। তবে সে জন্যে খুব একটা লজ্জা পাচ্ছে না।

সুজানার মিষ্টি কিন্তু ভরাট গলায় কর্কশ স্বর ফুটল, 'কর্মচারীরা সব পালিয়েছে। সব মালামাল আর অস্ত্রপাতি নিয়ে স্রেফ চম্পট দিয়েছে।'

'পালাবে না!' মুখ বাঁকাল বুড়ো। 'আমি তো বলেছিলাম শনিবারের মধ্যে ওদের বেতন দিয়ে দিতে যেন ওরা...'

'কিন্তু বেতনটা কী দিয়ে মিটিয়ে দিতাম, সেটাও বলে দাওনি কেন? গাছের পাতা কিংবা মাটির ডেলা দিয়ে তো কারও বেতন হয় না। কেন তুমি কি জান না, ব্যাংকে আমাদের আর কত টাকা আছে? এক শ' চুয়ান্ন ডলার ছত্রিশ সেন্ট। এরপর আমাদের খাওয়া জুটবে কোত্থেকে বলো তো?'

'তোমাকে আরও কিছু জমি বেচে দিতে হবে তা হলে,' নিশ্চিন্তে উপায় বাতলাল বুড়ো। 'সানসেটের উত্তরের দশ সেকশন জমি বেচে দিলেই তো হয়।'

'ওরা বেতন না-পেয়ে পালায়নি,' একটু থেমে বলল সুজানা। 'লামা ট্রিল ওদের কিনে নিয়েছে বেশি বেতনের লোভ দেখিয়ে। *ডেভিল আয়রন* বীয়ার ফ্ল্যাটস দখল করে নিয়েছে। ওদের একজন লোক এখন ওখানে বেড়া দিচ্ছে, যাতে আমাদের গরুবাছুর ওই পানি খেতে না-পারে।'

কথা খুঁজে না-পেয়ে এবার স্রেফ হাঁ হয়ে গেল বুড়ো।

'ওভাবে বসে থেকে লাভ নেই!' ঝাঁজিয়ে উঠল মেয়ে। 'ওই

পানি আমাদের পেতে হবে। তুমি বরং সেখানে গিয়ে দেখো, ঠিক কী হয়েছে...'

'তুমি খুব ভাল করেই জান যে, আমি ঘোড়ায় চড়তে পারি না!' জবাবে এবার বাবাও চেঁচাল। 'আমার পিঠের ব্যথাটা আবার চাগিয়ে উঠেছে। ওদিকে পায়ের বুড়ো আঙুলদুটোয় ফ্রস্টব্রাইটের যন্ত্রণা...ঘোড়ায় চড়তে গেলে জান বেরিয়ে যায়।'

'তোমার তো আর অজুহাতের অভাব নেই। কোনও কাজের কথা বললে এটা না হয় ওটা...একটা না একটা তোমার লেগেই আছে!'

'নিজের বাবার সাথে এটা তোমার কোন্ ধরনের ব্যবহার বলো তো, মেয়ে? হায়, মা মেরী! আমার অসুস্থতায় তোমার কি একটুও সহানুভূতি আসা উচিত নয়? কেন আমি কি তোমাকে আদর-যত্ন দিয়ে বড় করে তুলিনি!'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' বাবাকে থামিয়ে দিল মেয়ে। 'আমি বরং শেরিফের সাথে কথা বলব।'

'এই তো এতক্ষণে একটা বুদ্ধিমানের মত কথা বলেছ।' খুশি হয়ে উঠল বাবা। 'তুমি সিব ডসনকে গিয়ে বলো, ও যেন ওই হারামজাদাকে আমাদের এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেয়। তুমি ওকে গিয়ে বলো, ও যদি কাজটা না-করে, তা হলে আমি আমার লোকজন নিয়ে আসব শহরে। ওর অফিস-টফিস সব উড়িয়ে দেব...'

'লোকজন তুমি কোথায় পাচ্ছ?' ছোবল দেয়ার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে বসল সুজানা।

জবাবে ভীষণাকৃতির মুখ করে কাঁধ ঝাঁকাল বুড়ো। আমি সবচেয়ে চালু বন্দুকবাজ ভাড়া করব। সবচেয়ে...'

'টাকা কোথায় পাবে, টাকা? লোক ভাড়া করবে, টাকা লাগবে না? কেউ কি তোমার জন্যে এমনি এমনি এসে লড়াই

করে দেবে নাকি? তুমি ভাবছ জমি বন্ধক দেবে। বেশ। কিন্তু সানসেটের উত্তরের ওই জমি তো একরপ্রতি দশ সেন্টেও বিকোবে না। ওখানে পানি নেই, শুকনো খটখটে এবড়োখেবড়ো গালশ পুরোটা। তা ছাড়া গ্যালিউরাস পর্বতমালার কাছে গরু চরাতে গেলে কেবল পাহাড়ী সিংহের পেট ভরানোই হবে।'

'তা হলে আর কিছু বেচো,' নির্বিকারে বলল বুড়ো। 'যেভাবে হোক আমাকে টাকা এনে দাও।'

'সমস্যা হলো,' শান্তস্বরে বলল সুজানা। 'আমাদের এই হেডকোয়ার্টার ছাড়া পানি আছে এমন জায়গা আমাদের আর একটাই আছে। সেটা বীয়ার ফ্ল্যাটস।'

'কেন, ওক রিজ? ওটা বেচে দাও। যারা কিনবে, ওদের বলে দিয়ো যে, পশ্চিম পাশের লেকটা ওরা ব্যবহার করতে পারবে।'

'তুমি বোধ হয় ভুলে গেছ লামট্রিল ওদিকে বেড়া দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, ওদিকে পাহারাও বসিয়েছে সে।'

'সেটা ওদের আগ বাড়িয়ে বলতে যাওয়ার দরকার কী?' ঘোঁৎ করে উঠল বুড়ো। 'যারা কিনবে, সেটা ওদের সমস্যা। কেন, ওদের ব্যাপারে আমার চিন্তা করার দরকার কী? ওরা কি কেউ আমার দুরবস্থা দেখে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসেছে? ওরা কুকুরে কুকুরে কামড়াকামড়ি করে মরুক, আমার তাতে কী?'

কিছুক্ষণের জন্যে নীরবতা নেমে এল বাপ-বেটির মাঝে। মিনিটখানেক পরে সুজানা চিন্তিত স্বরে বলল, 'আমাদের ওপরের র‍্যাঞ্চ *ডায়মণ্ড এক্স* ভুগছে পানির অভাবে। মনে হয় ওরা ওক রিজ কেনার আগ্রহ দেখাতে পারে।'

'বেশ, তুমি তাদের স্রেফ বলে দিয়ো যে, লেকের পাড়টা বেড়া দেয়া।'

'আমরা লামট্রিলকে ওখানে থাকতে দেব না,' একগুঁয়ে কণ্ঠে বলল সুজানা। 'ওর বেড়া উপড়ে ফেলব। বীয়ার ফ্ল্যাটস থেকেও

দূর দূর করে তাড়াব ওকে।'

এবার বিস্ময়ে অবাক হওয়ার পালা বাপের। হাঁ করে একটুক্ষণ দেখল মেয়েকে। তারপর বলল, 'কাজটা কীভাবে করবে? প্রমিসরি নোট পাঠাবে নাকি?'

'না। ওই বন্ধকী টাকা দিয়ে একজন বুনোধরনের লোক ভাড়া করব। তারপর বসিয়ে দেব ওখানে। সেই সামলাবে লামট্রিলকে। লামট্রিলের নিজের ওষুধেই ওর ব্যারাম ছাড়াব।' ঘুরে দাঁড়াল সুজানা। 'ওর সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি।'

মাটিতে ওর বুটের শব্দ শুনল ফ্রাঙ্ক। তেমন ত্বরিত প্রতিক্রিয়া দেখাল না। ওদের বাবা-মেয়ের কথাগুলো ঘুরতে শুরু করেছে ওর মাথায়। বিশেষ করে লামট্রিলের উল্লেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে সে। ফ্লোরবোর্ডে সুজানার বুটের শব্দ শুনতেই সচেতন হলো। ওর হাতে স্টেজের মেয়েটার নাম লেখা কাগজটা। ওটা আগের জায়গায় লুকোনোর সময় আর পেল না। চট করে কাগজটা বালিশের নীচে ঠেলে দিল। তারপর শুয়ে পড়ল।

চোখ পুরোপুরি বোজার আগেই ঘরে ঢুকল সুজানা। একই সঙ্গে ওর ঠাণ্ডা গলা শুনতে পেল, 'ঘুমের ভান করতে এক মুহূর্ত দেরি করে ফেলেছ তুমি। পরের বার জানালা দিয়ে উঁকি মারার আগে নিশ্চিত হয়ে নিয়ো, তোমাকেও বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে কিনা।'

মুখ লাল হয়ে উঠল ফ্রাঙ্কের। চোখ খুলল। 'তোমাকেও কেউ বলেনি ওই পোর্চে গিয়ে দাঁড়াতে। এতই যখন গোপন কথা, তখন...

ঠাট্টায় কান দিল না সুজানা। 'তুমি আমাদের কথাবার্তা শুনেছ। আমার ধারণা, তুমিও জড়িয়ে গেছ এর সাথে। সুতরাং এখন পুরো ব্যাপারটাই তোমার জানা উচিত।'

চোখের ওপর এসে পড়া এক গোছা সোনালী চুল মাথা

ঝাঁকিয়ে পেছনে সরিয়ে দিল ও। তারপর পূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল ফ্রাঙ্কের দিকে। ঘরের একমাত্র চেয়ারটি টেনে নিয়ে বসল মুখোমুখি। 'র‍্যাঞ্চ ব্যবসার আসল সত্যটা কী, তুমি জান। দেখতেই পাচ্ছ আমাদের কোনও লোকজন নেই। আসলে লোকজন রাখার মত টাকা-পয়সাও নেই আমাদের। কিন্তু লড়তে হচ্ছে একটা ভালুকের বিরুদ্ধে, যে গ্যালিউরাস পর্বতমালার পাদদেশ থেকে নিউ মেক্সিকো লাইন পর্যন্ত প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা নিজের জন্যে ছিনিয়ে নিতে চায়।'

'আর তোমরা চাইছ তাকে বাধা দিতে?'

'এ ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই আমাদের সামনে। ও চায় আমাদের অস্তিত্বের ওপর আঘাত হানতে। নইলে আমাদের কাছ থেকে বীয়ার ফ্ল্যাটসটা ছিনিয়ে নিত না। ওটাই ছিল আমাদের সবচে' সেরা চারণভূমি এবং পুরো র‍্যাঞ্চে পানি সরবরাহের সেরা উৎস।'

'লামট্রিল, না? কে এই লোক?'

'ধনকুবের বলা যায়। উইলকক্স আর ড্রাই বটমে দুটো ব্যাংক আর পিটসবার্ক ক্যাটল অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড কোম্পানির মালিক। ওটাকে সবাই *ডেভিল আয়রন* বলে জানে।

'এখন থেকে বছর দশেক আগে উইলকক্সের দক্ষিণে এক জায়গায় বিশ সেকশন জমি আর গুটিকয়েক গরু ছিল ওর। রোগা, মরাটে। ওখান থেকে শুরু। বছর দু'তিনেক না-যেতেই ড্রাই বটমে ব্যাংক খোলার মত ক্যাশ টাকা এসে যায় লোকটার হাতে। এরপর উত্তর ও পশ্চিম দিকের র‍্যাঞ্চগুলোর দিকে হাত বাড়ায়। ক্রয় ও বন্ধকীসূত্রে মালিক বনে বসে অনেকগুলো ছোটখাট র‍্যাঞ্চের। চার বছর আগে উইলকক্সেও স্টকম্যান'স ব্যাংক অ্যাণ্ড ট্রাস্ট নামের একটা ব্যাংক খুলে বসে।

'এরপর সে শুরু করে শখের রাজনীতি। পাশাপাশি চলতে

থাকে ভূমিগ্রাসের ব্যাপারটা। উত্তরে *বার হুইল*, দক্ষিণে *পাইনলেনোস*। স্যাফোর্ডের দশ মাইলের মধ্যে চলে যায় ওর দখলদারি। গত বসন্তে সে বীয়ার ফ্ল্যাটসের উত্তর-পূর্বাংশে *বক্সড ওয়াই*-এর চল্লিশ সেকশন জমি দখলে পেয়ে যায়। এখন সে বীয়ার লেকের পানি থেকে আমাদের গরু-বাছুরগুলোকে বঞ্চিত করার জন্যে কাঁটাতারের বেড়া দিতে শুরু করেছে। দেখে মনে হচ্ছে আগামী ক্রিসমাসের মধ্যে লোকটা অ্যারাভাইপা উপত্যকার সবটুকুই নিজের দখলে পেতে চাইবে। আমাদের হয়তো এখন তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে নয়তো সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে চলে যেতে হবে।'

'তোমরা তো বিক্রি করে দিতে পারতে, তাই না?'

'ও *বক্সড ওয়াই* কিনতে চায় না,' তিক্তস্বরে বলল সুজানা। 'ও চায় দখল করতে।'

'এখানে তো আরও র‍্যাঞ্চ আছে।'

'আছে। দুটো। *ডায়মণ্ড এক্স* আর *বার হুইল*। কিন্তু তারা কেউ ওর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না। ডায়মণ্ড এক্স-এর মালিক একটা সিণ্ডিকেট। তাদের টাকা-পয়সা আছে। তবে লামট্রিলের কাছে তা কিছু নয়। আর বার হুইল পারলে কালকেই বেচে দেয়। কিন্তু ন্যাট লামট্রিল সেয়ানা পাবলিক। ও লেজে খেলাচ্ছে। ও কেন কিনতে যাবে? এভাবে চললে তো কিছুদিন পরে এদের এমনিতেই চলে যেতে হবে। অনর্থক কেন পয়সা খরচ করে কিনতে যাবে?'

'আচ্ছা, ওই সব জমি ও কীভাবে দখল করেছে?'

'ওর চাতুরির সীমা নেই। আগুন ধরিয়ে দেয়া, রাতে হানা দেয়া, রাসলিং–সব ধরনের উপায় প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে কেউ তা প্রমাণ করতে পারেনি। কোর্টে গেলে উল্টো তুমিই হাস্যাস্পদ হবে। ওর কাছে টাকা আছে–ও একজন ব্যাংকার। কোর্ট কাছারী ওর পকেটে। জনাতিনেক দুর্ধর্ষ লোক আছে ওর।

সব ধরনের শয়তানি কাজকর্ম ওর পক্ষে ওরাই করে থাকে।'

'তা হলে তো,' কাধ ঝাঁকাল ফ্রাঙ্ক। 'তোমাদেরও বরং সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আর কোথাও চলে যাওয়া উচিত।'

জবাব দিল না সুজানা। অসহিষ্ণু চোখে ওর দিকে চেয়ে রইল।

'ওর আছে আউটল বাহিনী। ওদের সঙ্গে পাল্লা দেয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওদের নিজের পক্ষে নিয়ে আসার মত সামর্থ্যও তোমার নেই। তাই না?'

'তার দরকারও নেই। আমার কাছে যারা আসবে, তারা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আসবে। আমি তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর একটা ভিত্তি করে দেব।'

'লামট্রিলের যে-বর্ণনা তুমি দিলে, ও যদি সত্যিই সেরকম হয়, তা হলে তুমি শুরু করার সুযোগও পাবে না। তার আগেই স্রেফ খড়কুটোর মত উড়ে যাবে ওর সামনে থেকে। সে-চেষ্টা না-করাই ভাল হবে তোমার জন্যে। তুমি যখন আউটল'দের মোকাবিলা করতে যাবে...'

'লামট্রিলের বিরুদ্ধে স্বয়ং শয়তানও যদি আমাকে সাহায্য করতে আসে, আমি সানন্দে তার সাহায্য নেব। আমি সর্বান্তঃকরণে বলছি, ফ্রাঙ্ক। দেখো,' চেয়ার থেকে উঠে বিছানার ওপর বসল সে। আঙুলের খোঁচায় বিছানায় বিলি কেটে দেখাল। 'দেখো, পুরো এলাকাটার একটা বর্ণনা তোমাকে দিচ্ছি। এটা হলো আমাদের রেঞ্জ, *বক্সড ওয়াই*, এই ওপরের দিকেরটা *ডায়মণ্ড এক্স*, আর নীচের দিকে দেখো *বার হুইল*। আর বাকি পুরোটা *ডেভিল আয়রন*, ঠিক আছে?'

মাথা নাড়ল ফ্রাঙ্ক, চুপ করে রইল।

'আমি ওকে গুঁড়িয়ে দেব,' বিড় বিড় করল সুজানা। 'ওর শয়তানি আড্ডাখানা ভেঙে দেব। ও কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে

নিজের ভাগ্য ফিরিয়েছে, আমি ওসব বেড়া কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলব। ওর সব বিল্ডিং-এ আগুন ধরিয়ে দেব, ব্যাংক লুট করব। সে জন্যে আমার দরকার কিছু ভাল ও দক্ষ লোক।'

'এটা করা যায়,' মাথা দোলাল ফ্রাঙ্ক। 'তবে কাজটা পুরুষের, মেয়েদের নয়। এসব কাজ করবে যেসব লোক, তারা কোনও মেয়ের মুখ থেকে হুকুম নিতে চাইবে না।'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল সুজানা। 'এবং সে জন্যে আমি তোমার কথাই ভাবছি।'

'আমার কথা! নাহ্!'

'কেন?' চিবুক উঁচিয়ে চাইল সুজানা। 'তুমি নিশ্চয় ভয় পাচ্ছ না?'

সামান্য কৌতুকের ছটা দেখা গেল ফ্রাঙ্কের চোখে। 'না। আমি ভয় পাচ্ছি না।'

ঠোঁট কামড়াল সুজানা। মেয়ে হিসেবে আকর্ষণীয় সে। লম্বা, মেদহীন শরীরের প্রতিটি বাঁক-উপবাঁক সুদৃশ্য। প্রথম দেখায় যে কোনও পুরুষের দৃষ্টিতে যে ভাব ফুটে ওঠে, সেটা কামনার নয়, সমীহের। এই মুহূর্তে ফ্রাঙ্কের মুখে অসহযোগিতার কথা শুনে ওকে কিছুটা হতাশ দেখালেও দিশেহারা মনে হলো না। বরং ওকে দেখে মনে হচ্ছে, কথা এখানেই শেষ হয়ে যায়নি, ফ্রাঙ্ক হয়তো এর পরও কিছু বলবে। অপেক্ষা করছে সে।

কিন্তু ফ্রাঙ্ক কিছু বলছে না। স্রেফ চুপ হয়ে আছে।

অসহিষ্ণুভাবে কাঁধ উঁচাল সুজানা। তারপর শান্তস্বরে বলল, 'সত্যি তুমি ভয় পাচ্ছ না, না? কিন্তু তুমি কাজটি করবেও না। একটা মেয়ে তোমার জীবন বাঁচাবে, কোনওরকম ঝুঁকি আছে কিনা না-জেনে শুনেই তোমাকে আশ্রয় দেবে। এটা একটা ঋণ। কিন্তু ঋণ শোধের পালা এলে চট করে সবচেয়ে চালু ঘোড়াটার পিঠে করে দেশ ছেড়ে পালাবে। এতে কি তোমার আত্মসম্মান

থাকছে বলে ভাবছ তুমি, মি. সেলজার?'

লাল হয়ে উঠল ফ্রাঙ্কের মুখ। ভ্রূকুটি করল সে। এই চোখা মুখের মেয়েটি দেখা যাচ্ছে মানুষের মনের একদম গোপন ভাবটুকুও বুঝে নিতে পারে। কিন্তু, কাঁধ ঝাঁকাল ও মনে মনে, তাতে কী? স্রেফ কথা বই তো নয়। উপেক্ষা করার চেষ্টা করল সে মেয়েটাকে। কথা দিয়েই ঘায়েল করার চেষ্টা চালাল। 'ঠিক আছে। কিন্তু আমি মানুষটা আদতেই ওসব কিছু নিয়ে ভাবি-টাবি না,' বলল সে। 'কিন্তু তুমিই বা কেমন মেয়ে যে উপকার করে তার প্রতিদান চাও। না-পেলে খোঁটা দিয়ে বস?'

'মরিয়া ধরনের মেয়ে বললেও আপত্তি করব না,' সাথে সাথে স্বীকার করল সুজানা। 'একই সাথে স্মৃতিকাতর আর ব্যথাভারাতুর। এমন এক মেয়ে, যার সামনে একটা রেঞ্জ ওয়ারের হুমকি, অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রতিদিন ইঞ্চি ইঞ্চি করে তাকে সেদিকে এগোতে হচ্ছে। খোঁটাটা কি খুব বেশি অন্যায্য মনে হচ্ছে তোমার? শোনো, সেলজার, আমি আমার বাসভূমিটাকে খুব ভালবাসি, ওটাকে বুক দিয়ে আগলে রাখতে চাই। তুমি কি এই চাওয়াটাকে অকারণ বলতে পারবে?'

'ঠিক আছে। কিন্তু কথা হলো, আমাকে কেন একটা রেঞ্জ ওয়ারে জড়িয়ে পড়তে হবে? এরও কি কোনও ন্যায্য কারণ আছে? এটা এমন এক কাজ, যেখানে আমার ন্যূনতম উৎসাহও নেই।'

ম্লান হয়ে গেল মেয়েটির উদ্যমী চেহারা। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'অবাক এক দুনিয়ায় বাস করছি আমরা,' বিড় বিড় করে বলল। 'এখানে কেউই নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কারও দিকে চাইতে জানে না।'

'তুমি খুব সুন্দর কথা বলতে পার, ম্যাম। তবে আমার কথা নয় নিশ্চয়। আমার ব্যাপারটা আগেই ফয়সালা হয়ে গেছে।'

এক দৃষ্টিতে ফ্রাঙ্কের দিকে চেয়ে রইল মেয়েটি। যেন ওর বুকের ভেতরটা পর্যন্ত পড়ে নিতে চাইছে। ওর চোখে এখন আর রাগের ঝিলিক নেই। এক ধরনের বিষণ্নতা আর উদাসীনতায় ভরা। 'একটা কথা বলবে?' ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করল। 'তুমি কি জীবনে নিজের ছাড়া অন্য কারও জন্যে কখনও কিছু করেছিলে? কারও জন্যে সামান্যতম কিছু করা...'

'হিতোপদেশ দিতে চাইছ মনে হয়? কিন্তু তাতে আমার জবাব কিন্তু পাল্টাবে না,' বলে দিল ফ্রাঙ্ক। 'তুমি তোমার সম্পত্তি বাঁচাবার চেষ্টা করছ। আমি তোমার প্রশংসা করি। কিন্তু তাই বলে তোমার সমস্যায় আমার নাক গলানোর দরকার নেই।'

মলিন হাসি দেখা গেল সুজানার মুখে। ফ্রাঙ্ককে আশ্বস্ত করতে চাইল যেন। যেন বোঝাতে চাইল, ওর নির্মম স্বার্থপরতায়ও সে কিছু মনে করছে না। ব্যাপারটা ভাল লাগল না ফ্রাঙ্কের। ওর কথা শুনে মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেল। সুজানা বলল, 'সাহায্যের জন্যে কতটা চাও, বলো। অর্ধেকটা পেলে রাজি হবে তো?'

হতবুদ্ধি হয়ে গেল ফ্রাঙ্ক মেয়েটির প্রস্তাব শুনে। ওর মনে হলো, মেয়েটির মাথার ঠিক নেই। মেয়েটি এই আউটফিটটি বাঁচানোর জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। আবার একটিকে বাঁচানোর জন্যে এর অর্ধেকটাই ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব দিচ্ছে। নাহ্, আদতেই মাথাটা গেছে এই মেয়ের। 'কী বলতে চাইছ তুমি?' আচমকা ধমকে উঠল সে।

'আমি বুঝতে পারছি না তুমি আসলে আমার কথা বুঝতে পেরেছ কিনা,' বলল মেয়েটি। 'আমি এখানে লড়াই করার জন্যে মুখিয়ে নেই। আমি চাই না এখানে বন্দুকবাজ এনে ঝড় বইয়ে দিই। রক্তপাত আর সন্ত্রাস আমার একটুও পছন্দ নয়। আমি সব সময় এক গালে চড় খেয়ে আরেক গাল এগিয়ে দেয়ার নীতিতে

বিশ্বাস করতাম। কিন্তু গত দু'বছরে আমি কিছু জিনিস খুব ভালভাবে শিখেছি। আমি বুঝে গেছি, আগুনের বিরুদ্ধে আগুন নিয়েই খেলতে হয়। অস্ত্রের বিরুদ্ধে নামতে হয় অস্ত্র হাতেই। এটা কিন্তু বর্বরতা। আমার পছন্দ নয়। কিন্তু লামট্রিলকে তুমি এসব বলে থামাতে পারবে না। আমি চাই না ও বিনা আয়াসে *বক্সড ওয়াই* র‍্যাঞ্চটা দখল করে নিক। ওর বিরুদ্ধে আমি সাধ্যের ভেতর সব কিছুই করতে রাজি। কারণ এটা আমার সম্পত্তি। ওর কোনও অধিকার নেই আমার কাছ থেকে তা কেড়ে নেবে।'

'তাই বলে এটা বাঁচানোর জন্যে তুমি এর অর্ধেকটাই দিয়ে ফেলতে রাজি?'

'হ্যাঁ,' নির্বিকার মুখে মাথা দোলাল মেয়েটি। 'রাজি।' ফ্রাঙ্কের বুকের দিকে আঙুল তুলে খোঁচা মারার ভঙ্গিতে দেখাল। 'তোমার বুকের ওই বুলেটের আঘাত এখানে হয়নি। এই অঞ্চলে কেউ তোমাকে চেনে না। তুমি চাইলে *বক্সড ওয়াই*কে সাহায্য করতে পারবে।' একটু ইতস্তত করল। তারপর বলেই ফেলল, 'তুমি এখান থেকে বাইরে পা বাড়ানো মাত্র লামট্রিল তোমাকে কিনে ফেলবে...'

'দেখো, আমি ভবঘুরে হতে পারি। তাই বলে অতটা সস্তা নই যে, যে কেউ চাইলেই আমাকে কিনে নিতে পারবে।'

নিঃশ্বাস ফেলল সুজানা। তারপর ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, 'ঠিক আছে, বাদ দাও।' একটা হাত রাখল ওর বাহুতে। '*বক্সড ওয়াই*-এর ফোরম্যানের দায়িত্বটা তুমি নাও। তারপর আমাকে কিছু কাজের লোক জোগাড় করে দাও। এমন লোক, যাদের সাহায্যে ওই হারামীটাকে ত্রিসীমানা থেকে ঝেঁটিয়ে তাড়াতে পারি।'

'বাহ্! চমৎকার! কিন্তু তুমি আমাকে এখনও আসল উদ্দেশ্যটা খুলে বলোনি। সেটা কী?'

'বললাম তো। আমি আমার র‍্যাঞ্চটা বাঁচাতে চাইছি।'

'অবশ্যই। সেটা আমিও বুঝেছি। কিন্তু কেন?' চতুর চোখে চাইল ফ্রাঙ্ক মেয়েটির দিকে। 'তুমি যদি পুরুষ হতে, তা হলে বুঝতাম লামট্রিল কোনও কারণে তোমার ওপর খেপে গেছে। তাই ক্ষতি করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু তুমি তো একজন মহিলা। আর তুমি এখনও আমাকে আসল কথাটা বলোনি।'

'বললামই তো। র‍্যাঞ্চটা বাঁচাতে চাইছি আমি...'

'সেটা আমি শুনেছিও। কিন্তু সেটাই যে আসল উদ্দেশ্য নয়, ওইটুকু বোঝার মত বুদ্ধি আমার আছে। তুমি আমাকে কালকের ছেলে ভেবে বসে আছ নাকি? একজন মহিলা কখনও বিধবা কিংবা এতিম হতে চাইবে না, যদি না সে এর বিনিময়ে আরও ভাল কিছু পায়। আর তোমার মত বুদ্ধিমান মেয়ের পক্ষে সেটা আরও সত্যি। ঠিক কি না?'

'ঠিক বলেছ তুমি,' স্বীকার করল সুজানা। 'র‍্যাঞ্চ বাঁচানোর কথাটাও অবশ্য মিথ্যে নয়। তবে সেটা ছাড়াও আরও উদ্দেশ্য আছে, সেটা তুমি থাকলে বলব...'

'ওটা তুমি নিজেকে শুনিয়ো। আমি থাকব না। তুমি যদি করতে চাও, করো। চাইলে কিড ব্যাজারের মত লোকদের সাথে পাবে। আমাকে এসবের মধ্যে টানতে যেয়ো না।'

অপলক তাকিয়ে রইল সুজানা ওর দিকে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিছানা থেকে নামল। মৃদু স্বরে বলল, 'তুমি মৃতপ্রায় অবস্থায় এই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলে। তুমি নিজেই সেটা জানতে। তোমার সাহায্যের দরকার ছিল। আমরা তোমাকে সাহায্য করার জন্যে র‍্যাঞ্চহাউসে নিয়ে এসেছি। কোনও প্রশ্ন তুলিনি। কিন্তু এখন তুমি আমার সাথে রুক্ষ আচরণ করছ। ঠিক আছে, তুমি দেখবে, আমিও তোমার মত রুক্ষ হতে পারি।' বলতে বলতে

ডান হাত বাড়িয়ে ছোঁ মেরে ফ্রাঙ্কের পিস্তলটা তুলে নিল। ওর বুক সই করে বলল, 'তুমি আমাদের কাছে অনেক ঋণী, তোমাকে সে-ঋণ শোধ করে যেতে হবে এখন।'

ফ্রাঙ্ক হেসে উঠল মেয়েটির দিকে চেয়ে। 'নাহ্, তুমি আসলেই বেকুব। যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি।'

গা থেকে চাদরটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ও, পর মুহূর্তে লাফ দিয়ে একেবারে মেঝেয় নামল। বুটজোড়া হাতে নিয়ে একটার ওপর আরেকটা বাড়ি দিয়ে ধুলো ঝেড়ে পরে নিল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চাইল মেয়েটির দিকে। সুজানার চোখদুটো জ্বলছে রাগে। হ্যাটটাও ঝেড়ে মাথায় পরল ফ্রাঙ্ক। তারপর শেলবেল্টের জন্যে এগোতে কথা বলল সুজানা। 'তুমিও পারলে! তুমিও পারলে আর সবার মত? যেমন কাজ শেষ হলে পারলার থেকে বেরিয়ে যায় মানুষ। কিন্তু আমি কেন যেন ভেবেছিলাম, তুমি তাদের থেকে হয়তো ভিন্ন। আর এখন ভাবছি, আইন হয়তো জানতে চাইবে *বক্সড ওয়াই* থেকে বেরিয়ে কার্লি ফ্রাঙ্ক কোথায় গেল?'

যেন জায়গায় জমে গেল ফ্রাঙ্ক। দু'চোখ সরু করে চাইল মেয়েটির দিকে। অসহিষ্ণু রাগে জ্বলছে যেন মেয়েটির চোখ ধিকি ধিকি করে। ধীরে ধীরে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল ফ্রাঙ্ক। ওর চোখে কৌতুকের ছটা দেখা গেল। 'কার্লি ফ্রাঙ্ক! বেশ তো। তুমি তো চেন তাকে। আর এখন তো তোমার সামনেই আছে। ধরিয়ে দাও ওকে আইনের হাতে। চাই কি পুরস্কার-টুরস্কারও জুটে যেতে পারে তোমার কপালে। ওই টাকা দিয়ে পিস্তলবাজ ভাড়া করবে...'

'অত হেসো না তো। গলার চারদিকে যখন ফাঁসির দড়ি জড়ানো দেখতে পাবে, তখন আর অতটা স্মার্ট মনে হবে না নিজেকে।'

'সেটা ঠিক। তবে ব্যাপারটা তুমি এক দিক থেকে দেখছ।

এর যে আরেকটা দিক আছে, সেটা তোমার নজর এড়িয়ে যাচ্ছে। এটা আসলে...তোমার অভিজ্ঞতার অভাব।'

'তাই!' ব্যঙ্গের স্বরে বলল সুজানা। উঠে দাঁড়িয়ে ফ্রাঙ্কের মুখোমুখি হলো।

সুজানার গায়ে শার্ট। পরনে রাইডিং পোশাক। রাগের চোটে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে মেয়েটি। বুক ওঠানামা করছে। দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো ফ্রাঙ্কের। অসহ্য সুন্দর। হাত বাড়িয়ে মেয়েটিকে টেনে এনে বুকের ওপর আছড়ে ফেলার দুরন্ত লোভটা সামলাল অতি কষ্টে। সে এখানে একটা বাস্তব সমস্যার মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে। এখন ভাবালুতার সময় নয়। তা ছাড়া মেয়েটাই বা কীভাবে নেয় কে জানে? ও নিশ্চয় এমন কিছু অন্তত এ-মুহূর্তে আশা করছে না।

এক মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা তীক্ষ্ণ চোখে। আচমকা যেন কিছু একটা বুঝতে পেরেছে, এমনভাবে সচকিত হয়ে উঠল সুজানা। তীব্র স্বরে বলল, 'কী বললে?'

মেয়েটাকে নাকচ করে দেয়ার ভঙ্গিতে হাসল ফ্রাঙ্ক। 'তুমি আমাকে চিনে গেছ, তাই না? এখন নিজের কাজে ব্যবহার করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছ। আমি রাজি হচ্ছি না বলে হুমকি দিচ্ছ আইনের হাতে তুলে দেবে বলে। বেশ, ভাল কথা। কিন্তু তুমি আমাকে চিনতে পারলে আরও কেউ যে চিনবে না এমন ভাবছ কেন?

'এখন ব্যাপারটা কেমন হবে ভেবে দেখো। কার্লি ফ্রাঙ্ক তোমার ফোরম্যান হয়ে কাজ করছে, তোমার হয়ে লড়াই করছে লামট্রিলের বিপক্ষে। তা তুমি লামট্রিলকে কী মনে কর? গর্দভ? সে কিংবা তার লোকেরা কেউ যদি কার্লি ফ্রাঙ্ককে চিনে যায়, সোজা শেরিফের কাছে গিয়ে লাগাবে। তখন ওকে তো আইন এসে ধরবেই, সাথে তোমাকেও ছাড়বে না জেনে শুনেও তাকে

আইনের হাতে তুলে না-দিয়ে সেবা-শুশ্রূষা করে সারিয়ে তুলে নিজের কাজে লাগানোর জন্যে।'

বেল্ট পরে নিল ও। তারপর হাত বাড়াল মেয়েটির দিকে নিজের পিস্তলের জন্যে। বিনা বাক্যব্যয়ে পিস্তলটা দিয়ে দিল সুজানা। ওটা খাপে ঢোকাতে ঢোকাতে মেয়েটির দিকে চাইল ফ্রাঙ্ক। করুণা হচ্ছে এখন ওর জন্যে। বাবার অক্ষমতার কারণেই ওকে নিজের অস্তিত্বের প্রয়োজনে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। ওকে দোষ দিতে পারছে না ফ্রাঙ্ক। ও চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি।

'ঠিক আছে,' কাঁধ ঝাঁকাল মেয়েটি। 'আমি তোমাকে পীড়াপীড়ি করতে যাচ্ছি না। তুমি বরং আরও ভাবনা-চিন্তা করে দেখো। আর,' বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে দরজার দিকে ফিরল। আবার ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'তোমাকে খোঁটা দেয়ার জন্যে আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আসলে তোমাকে নিয়ে একটা প্ল্যান দাঁড় করিয়ে ফেলেছিলাম তো। ঠিক আছে, তুমি বিশ্রাম নাও।'

নিঃশ্বাস ফেলে ওর গমন পথের দিকে চেয়ে রইল ফ্রাঙ্ক।

# বারো

পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরোল ফ্রাঙ্ক। খেয়াল করল, শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। এই ক'দিনের বিশ্রাম, খাবার দাবার আর সেবা-শুশ্রূষায় সব ব্যথা-বেদনা আর ক্লান্তি যেন কোথাও উধাও হয়ে গেছে। নিঃশব্দে বার্নে ঢুকে স্যাডলটা নিয়ে চাপাল রোয়ানের পিঠে। তারপর এগিয়ে চলল ধীরে সুস্থে। রাতের প্রেক্ষাপটে

জোরাল শব্দ হবে ভেবে প্রথম আধ ঘণ্টা প্রায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ছোটাল ঘোড়াটাকে। এক সময় দিগন্তে স্পষ্ট হয়ে উঠল পর্বতমালার ঢেউখেলানো পিঠ। এবার গতি বাড়াল ফ্রাঙ্ক। ওর উদ্দেশ্য ড্রাই বটম শহর এক পাশে রেখে লর্ডসবার্গের পথে কৌচির দিকে চলে যাওয়া। ওখানে পিয়ার্সের আস্তাবল থেকে ঘোড়া পাল্টে ফের নতুন করে যাত্রা শুরু করবে দক্ষিণে। এলফ্রিদা আর ম্যাকনিল ফেলে আরও দূরে, একদম ডগলাসে চলে যাওয়ার ইচ্ছে ওর। ওখানে সে একটা নতুন আউটফিট গড়ে তুলতে পারবে। তারপর এক সময় সুযোগ বুঝে ব্যাংকে রাখা ওর টাকাগুলো তুলে নেবে।

ওর পকেটে এখন নগদ চব্বিশ শ' ডলার রয়েছে। যে তিন হাজার ডলার বো ব্রীনের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, সেখান থেকে ছয় শ' ডলার টার্নারের জন্যে রেখে এসেছে ঘোড়া ও সাজের দাম হিসেবে। সুজানা যদি ওর পকেট হাতড়ে দেখে থাকে, তা হলে টাকাগুলো ওর চোখে পড়েছে। সম্ভবত ওই জন্যে হঠাৎ তাকে দলে ভেড়ানোর জন্যে অমন অস্থির হয়ে পড়েছিল মেয়েটা। নগদ টাকার অভাবে বেতন দিতে না-পারায় ক্রুরা *বক্স ওয়াই* ছেড়ে গেছে। সুতরাং এরকম ফতুর হয়ে যাওয়া একটা র‍্যাঞ্চের জন্যে প্রায় আড়াই হাজার ডলারও অনেক টাকা। ফ্রাঙ্ক যদি ওটার অর্ধেক শেয়ার কিনে নিত, তা হলে টাকাগুলো র‍্যাঞ্চের কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করত মেয়েটা।

মেয়েটা অবশ্য সুন্দরী, মনে মনে স্বীকার করল ফ্রাঙ্ক। যে কোনও পুরুষকেই প্রেমের ফাঁদে ফেলা সম্ভব হবে ওর পক্ষে। আর মেয়ে হিসেবেও অসাধারণ। ফ্রাঙ্ক বুঝতে পারে, ও যদি আগে থেকে মার্টা নামের ওই কালো চুলের মেয়েটির দেখা না-পেত, তা হলে হয়তো সুজানার আকর্ষণ কাটানো দায় হয়ে পড়ত। এখন এত অনুরোধ-উপরোধ, কাকুতি-মিনতিতে যে-

কাজে ওকে রাজি করাতে পারেনি, সেটা হয়তো কেবল মুখ দিয়ে বের করলেই হতো। সানন্দে ওকে সাহায্য করার জন্যে এক পায়ে দাঁড়িয়ে পড়ত ফ্রাঙ্ক।

কিন্তু ওর আর তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে মার্টা মে। মার্টাকে মন থেকে সরিয়ে দেয়া এখন আর সম্ভব নয় ওর পক্ষে। অসাধারণ মেয়ে মার্টা। অভিজাত, ধনাঢ্য...এবং পরিশীলিতও। ধনাঢ্য না-হলেও তেমন আফসোস হতো না ওর। মার্টার মত মেয়ে তো নিজেই এক অমূল্য সম্পদ!

এমন এক মেয়ের জন্যে লামট্রিলের নিশ্চয় সুনির্দিষ্ট কোনও পরিকল্পনা আছে। তাতে তেমন কোনও দুশ্চিন্তায় ভুগছে না ফ্রাঙ্ক। মার্টার অটোগ্রাফ রয়েছে ওর কাছে। এটা দিয়ে সে চাইলে অনেক কিছু বোঝাতে পারবে বুড়োকে।

মার্টা আর তার অটোগ্রাফের কথা ভাবতে ভাবতে মাইল দশেক পেরিয়ে গেল ও।

আচমকা বুকের ভেতর ধবক্ করে উঠল ওর। ড্র করার ভঙ্গিতে খাপ থেকে পিস্তলটা বের করে নিল। লক্ষ করল হাত কাঁপছে ওর। পিস্তলটার মাঝখানের ভাঁজ খুলে দেখল। একবার দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল। ঈশ্বর! মার্টার নাম লেখা কাগজটা ফেলে এসেছে সে। বালিশের তলায় রয়ে গেছে ওটা। এখন যদি ফের গিয়ে ওটা নিয়ে না-আসে, তা হলে সকালে সুজানার হাতে গিয়ে পড়বে।

ওই কাগজ নিয়ে মেয়েটা কী করতে পারে, সেটা বোঝার জন্যে খুব বেশি মাথা ঘামানোর দরকার মনে করল না ও। সুজানা আর যা-ই হোক, ওটাকে কাজে লাগাতে না-পারার মত বোকা নয়।

*বক্সড ওয়াই* থেকে বেরিয়ে ঘুরপথে এসেছে ফ্রাঙ্ক। সকালে উঠে কেউ যেন ওকে সহজে ট্রেইল করতে না-পারে সে জন্যে

চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি। প্রথমে সোজা পাইনলেনোর দিকে এগিয়েছে। তারপর একটা খোলা বিস্তীর্ণ পাথুরে জায়গায় এসে ট্রেইল থেকে সরে গেছে। পাথুরে ভূমিতে যেহেতু ঘোড়ার পায়ের ছাপ থাকবে না, সেহেতু সেখান থেকে গন্তব্য বদল করেছে ও। পাথুরে ভূমির ওপর দিয়ে প্রথমে সোজা পুব দিকে এগিয়েছে। তারপর তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে দক্ষিণে।

এতে অনেক বেশি সময় লেগেছে। কিন্তু সময়টাকে তখন খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। তবে এখন এই সময়টাই ওর কাছে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ও যদি কাগজটার জন্যে ফিরে যায়, তা হলে ওটা নিয়ে ফের রাতের আঁধারে আঁধারে ফিরে আসা সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না। সকাল হয়ে যাবে এবং নির্ঘাত সুজানার হাতে ধরা পড়ে যাবে। সে সুজানাকে খুব ভোরেই ঘুম থেকে উঠতে দেখেছে। মেয়েটা তখন বলেছিল, ওর সাথে পরে আবার কথা বলবে। কিন্তু ফ্রাঙ্কের এ নিয়ে দ্বিতীয়বার কথা বলার ইচ্ছে নেই। যা বলার, একবারেই বলে দিয়েছে। কোনও কারণেই আর মত পাল্টাবে না।

কিন্তু ওই কাগজটা যে তার চাই-ই। ওই কাগজে মার্টার নিজের হাতে তার নাম লেখা। মার্টাকেও তার চাই। ওকে পেতে হলে ওর বাবার মুখোমুখি হতেই হবে ওকে। তখন ওই কাগজটাই হবে তার দাবির পক্ষে জোরাল যুক্তি। এমন একটা জিনিস সে সুজানার কাছে ফেলে যেতে পারে না। এই মুহূর্তে লামট্রিলের চেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছে সুজানাকে। বালিশের নীচে কাগজটা পেলে মেয়েটা কী করে বসে কে জানে? প্রত্যাখ্যাত সুজানা যদি বুঝতে পারে, লামট্রিলের মেয়ের জন্যেই ওকে উপেক্ষা করা হয়েছে, তা হলে প্রতিহিংসায় জ্বলতে জ্বলতে আইনের কাছে গিয়ে হাজির হবে। ওর পেছনে লেলিয়ে দেবে ওদের। এদিকে লামট্রিলের কানে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবে যেভাবেই হোক। লামট্রিল

আগে ভাগে ব্যাপারটা জেনে গেলে নিজেও ছুটবে আইনের আশ্রয় নিতে।

কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে সাত-পাঁচ ভাবার সময় নেই আর। কাগজটা ওকে উদ্ধার করতেই হবে। মরিয়া হয়ে পশ্চিমে ড্রাই বটমের দিকে ঘোড়া ছোটাল ও। *বক্সড ওয়াই*-এর যাওয়ার পথ সংক্ষিপ্ত করতে হলে এখন ঠিক ওখান দিয়েই যেতে হবে। মিনিট দশেকের মধ্যে ড্রাই বটম পেরিয়ে গেল ও, একই গতিতে এগিয়ে চলল সামনে। রোয়ানটা শক্তিশালী, অনবরত ছোটাতেও ক্লান্তি নেই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে *বক্সড ওয়াই*-এর কাছে এসে পড়ল। ওক এবং জুনিপার ঝোপের ফাঁক দিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসটা চোখে পড়ল ওর। র‍্যাঞ্চহাউস থেকে ওয়্যাগন টানা এবড়োখেবড়ো রাস্তার এক পাশে একটা প্রাচীন ওক গাছ। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে ভূতের মত। গাছটা দেখে জায়গাটার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হলো ও। না, নতুন হলেও র‍্যাঞ্চে ফিরে আসতে পথ ভুল করেনি ও। তবে আরেকটু নিশ্চিত হওয়ার জন্যে র‍্যাঞ্চহাউসের আরও কাছে আসার কথা ভাবল। আরেকটু কাছে এসে হাতের তালুতে আড়াল করে ম্যাচ জ্বালাল। তারপর তাকাল চোখ তীক্ষ্ণ করে।

গাছের গায়ে আটকানো একটা হ্যাণ্ডবিল চোখে পড়ল ওর। শিরোনামটা পড়ল: **৫০০ ডলার পুরস্কার!**

পরের লাইনটায় গিয়ে থমকে গেল: *সাই টার্নারকে খুন ও ডাকাতির জন্যে ফ্রাঙ্ক সেলজারকে ধরিয়ে দিন।*

ম্যাচের কাঠি জ্বলতে জ্বলতে একদম গোড়ায় না-আসা পর্যন্ত লেখাটার দিকে চেয়ে রইল ফ্রাঙ্ক। আঙুলে ছ্যাঁকা লাগতেই ছুঁড়ে ফেলে দিল।

কাগজের লেখাটার মানে বুঝতে পারছে না ও। সাই টার্নারের জায়গায় যদি ম্যাক্সওয়েলের নাম হতো, অবাক হতো না। কিন্তু টার্নারকে তো গুলি করে হত্যা করা হয়নি। ফ্রাঙ্ক তো

কেবল ওকে বাহুতে আঘাত করেই আহত করেছে।

এগিয়ে গিয়ে গাছের গা থেকে কাগজটা ছিঁড়ে নিতে যাচ্ছে, এ-সময় একটা কণ্ঠ ভেসে এল, 'বার্ট মসম্যান বলছি। তোমাকে কাভার করে রেখেছি আমি। যদি আহত হতে না-চাও, তা হলে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াও। আর হাতদুটো মাথার ওপর।'

বার্ট মসম্যান!

গলার আওয়াজে সেরকমই মনে হচ্ছে বটে।

থেমে গেল ফ্রাঙ্ক। হাত গুটিয়ে নিল। এই লোকের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে সমস্ত ইউএস ক্যাভালরির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বললেও আপত্তি করত না সে।

# তেরো

১৭৯১ সালে অ্যারিযোনা ছিল পশ্চিমের সবচেয়ে বুনো এলাকা। বিলি দ্য কিডের মৃত্যুর পরের দশ বছর যত আউটল আর খারাপ মানুষ জড়ো হয়েছিল এক লাখ চোদ্দ হাজার বর্গমাইল আয়তনের এই জায়গায়। আইনের হাত থেকে বাঁচার জন্যে সভ্য দুনিয়া থেকে পালিয়ে এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছিল।

এখানকার পাথুরে পাহাড়গুলোয় রয়েছে নানারকম মূল্যবান ধাতু, বিস্তীর্ণ প্রান্তর বুকসমান সবুজ ঘাসে ভরা। এর বিশাল মরুভূমির নির্জনতায় যে কেউ চাইলে হারিয়ে যেতে পারে, পেছনে কোনও চিহ্ন না-রেখেই।

জায়গাটা গরু চরানোর স্বর্গভূমি, মাইনারদের জন্যে অফুরন্ত

সম্ভাবনার খোলা দ্বার আর আইন মেনে চলতে চায় না এমন দুর্ধর্ষ লোকদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় তারা নিশ্চিন্তে। এরা দুর্মুখ, হামবড়া আর তুমুল ঝগড়াটে। সারাক্ষণ মুখিয়ে থাকে ঝামেলা পাকানোর আশায়। আইন মেনে চলতে দারুণ অনীহা। তাই বলে আইন বসে থাকেনি। আউটলদের হাত থেকে সৎ ও শান্তিপ্রিয় র‍্যাঞ্চার এবং মাইনারদের নিরাপত্তা রক্ষায় এগিয়ে এসেছে। গভর্নর এমন একজনকে নিয়োগ দিয়েছে, যে এর আগে আজটেক ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ক্যাটল কোম্পানির হয়ে কাজ করে নিজের দায়িত্বশীলতা, যোগ্যতা ও দক্ষতার কারণে সবার আস্থা ও সমীহ আদায় করেছে। গভর্নরের বিশ্বাস, সীমান্তের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্যে ওই রকম সাহসী ও যোগ্য লোকেরই দরকার। বলা হয়ে থাকে, লোকটি পিস্তলে এতই দক্ষ, যেন দাঁত গজানোর সাথে সাথেই বাবার অস্ত্রের বাঁট চিবিয়ে বড় হয়েছে। লোকটার নাম বার্টন সি মসম্যান।

নিজের ওপর গভর্নরের আস্থার প্রতিদান সার্থকতার সঙ্গেই দিয়েছে মসম্যান। অ্যারিযোনার আউটল আর মন্দলোকদের জন্যে আগের সে সুদিন আর নেই। মসম্যান ইঁদুরের মত গর্তে লুকিয়ে পড়তে বাধ্য করেছে তাদের। ও রেঞ্জারদের প্রধান এবং প্রায় কিংবদন্তিতুল্য ল-ম্যান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে গেছে শান্তিপ্রিয় মানুষদের কাছে।

'বেশ, এবার বলো তোমার কী অবস্থা?' জানতে চাইল মসম্যান।

ড্রাই বটমের একটা ধোঁয়াভরা বারের পেছনের রুমে রাগে লাল মুখ নিয়ে ওর সামনে বসে আছে ফ্রাঙ্ক সেলজার। ওর প্রশ্নের জবাবে ঘোঁৎ করে উঠল। 'আমি আর কী বলব? তুমি তো আমাকে কোনও সুযোগই দিচ্ছ না।'

'যতটা পাওয়ার নয়, তার চেয়ে বেশি সুযোগ দেয়া হচ্ছে তোমাকে।'

'কিন্তু যা বলার, তা আমি তোমাকে বলেছি। ওই বেজন্মাটাকে আমি খুন করিনি। আমি কেবল ওর হাত ভেঙে দিয়েছি। আমি চলে আসার সময় ওর অবস্থা খারাপ বলতে এইটুকুই ছিল। কিন্তু ধ্যাৎ! তুমি বলছ, সে মৃত্যুর আগে আমার নাম লিখে গেছে তার হত্যাকারী হিসেবে। তাও ডান হাতে। কিন্তু আমি বলছি, আমি ওর ডান হাতটাই ভেঙে দিয়েছিলাম। একবার নয়, এ-পর্যন্ত কম পক্ষে বিশবার...'

'হ্যাঁ, তুমি বলেছ।' মাথা ঝাঁকাল মসম্যান। 'কিন্তু আমার কাছে যে-রিপোর্ট এসেছে, তাতে কোনও ভাঙা হাতের কথা বলা হয়নি। চেরি কাউন্টে তুমি একজন কুখ্যাত লোক, সন্দেহ নেই। তবে এটা বলতে পারি, এর আগে তোমার নামে খুন করার কোনও অভিযোগ পাওয়া যায়নি।'

চুপ করে রইল ফ্রাঙ্ক।

'আচ্ছা, ব্যাপারটা ঠিক কী ঘটেছিল বলো তো?'

'বাইরে যে-রোয়ানটা বাঁধা, ওটা আমি ওর কাছ থেকে কিনে নিতে চেয়েছিলাম। এ নিয়ে কিছুটা কথা কাটাকাটি হয়েছিল ওর সঙ্গে।'

'বিক্রি রশিদ আছে নিশ্চয়?'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল ফ্রাঙ্ক।

'প্যারাডাইসের ওই ব্রীন লোকটাকে তুমি কতদিন ধরে চেন?'

সাবধানে মসম্যানের দিকে চাইল ফ্রাঙ্ক। 'খুব বেশিদিন নয়।'

'কাউকে কি কখনও ওকে *কিড* বা *ব্যাজার* নামে ডাকতে শুনেছ?'

দু'চোখ বড় হয়ে উঠল ফ্রাঙ্কের। তারপর ঘোঁৎ করে উঠল। 'তুমি বোধ হয় কোথাও ভুল করছ, ম্যান। ব্রীন একটা ছিঁচকে

লোক...'

'আমার এক লোক ব্যাজারকে ওই পাহাড়গুলো পর্যন্ত অনুসরণ করে গিয়েছিল। ও ব্যাজারের যে বর্ণনা দিয়েছে, তা ব্রীনের সঙ্গে মিলে যায়।'

'তা হলে ধরল না কেন ওকে?'

'হয়তো ধরত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওর ট্রেইল হারিয়ে ফেলে ও। আমি ওখানকার শেরিফের মুখে ব্রীনের বর্ণনা পেয়েছি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ব্রীনকে এখন আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে অদৃশ্য হয়ে গেছে লোকটা। এল পেসো থেকে আসা ক্রাউন কিং পে রোলে ডাকাতির পর থেকে ওর চেহারা আর দেখা যায়নি।'

মসম্যানের চোখে চোখ রাখল ফ্রাঙ্ক। ওর চোখদুটো এখন আগের চেয়ে কিছুটা তীক্ষ্ণ দেখাচ্ছে। চিবুক থেকে নমনীয় ভাব চলে গিয়ে শক্ত হয়ে উঠেছে এখন।

শেরিফ লেইফ ও তার পাসির কাছে বলা মিথ্যে কথাগুলো মনে পড়ল ওর। উদ্বেগ বোধ করছে। তবে একই সাথে কিছুটা স্বস্তিও পাচ্ছে স্টেজের মেয়েটার নাম লেখা কাগজটা সাথে নেই বলে। লেইফ নিশ্চয় কাগজটার ব্যাপারে পারকিন্সের কাছ থেকে জেনে গেছে এবং সেটা রেঞ্জারকেও জানিয়েছে। কিন্তু রেঞ্জার অনেক কিছু জানতে চাইলেও ওটার কথা কেন বলছে না কে জানে? ধুরন্ধর লোকটার চিন্তাধারা কোন খাতে বইছে, বুঝতে পারছে না ফ্রাঙ্ক।

মুখে স্রেফ কুলুপ এঁটে রইল ও। মসম্যান নীরবে দেখছে ওকে। একটু পরে নীরবতা ভাঙল, 'তুমি বলছ, তুমি কেবল টার্নারের বাহুটা ভেঙে দিয়েছ। বেশ, ভাল কথা। কিন্তু তা হলে তুমি পালাচ্ছিলে কেন? কেন যেখানে ছিলে সেখান থেকে চলে এসেছ?'

'পালাইনি,' গোমড়া মুখে বলল ফ্রাঙ্ক।

'দুই সপ্তাহ ধরে *বক্সড ওয়াই*-এ আত্মগোপন করে ছিলে তুমি।'

'হ্যাঁ! করেছিলাম। কিন্তু তাতে কী? দু'হপ্তা ধরে আমি আহত অবস্থায় পড়ে ছিলাম ওখানে। তাতে তোমার সমস্যাটা কোথায়? কেন, তুমি কি আমাকে অন্য কোথাও আশা করেছিলে নাকি?'

'ওটাই হলো ব্যাপার।' মাথা নাড়ল মসম্যান। 'বিশেষ কোনও কারণ ছাড়া তুমি নিশ্চয় এক শ' মাইল দূর থেকে অমন আহত অবস্থায় এখানে আসতে না।'

জবাব দিল না ফ্রাঙ্ক।

'তোমার কি ধারণা ছিল যে, টার্নার খুন হয়ে যাবে?'

'কেন ধারণা থাকবে? আমি কীভাবে জানব যে, সে খুন হয়ে যাবে?'

'তা হলে তুমি চেরি কাউস থেকে চলে এলে কেন? তুমি লেইফকে বলেছ, তুমি রকিং অ্যারোতে কাজ করো। কিন্তু ওই আউটফিট বলেছে, তারা জীবনে তোমার নামও শোনেনি।' গোঁফের আগা মোচড়াচ্ছে মসম্যান। 'তুমি টার্নারের কাছ থেকে ওর আস্তাবলের সেরা ঘোড়াটা কিনেছ। ওটা কাউবয়দের ঘোড়া নয়, জুয়াড়ীদের ঘোড়া। কোনও লোক যদি খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে অনেকদূর পথ পাড়ি দিতে চায়, সেই কেবল এধরনের ঘোড়া পেতে চাইবে। এ ছাড়া তুমি পাঁচ-ছয় মাস ধরে প্যারাডাইসে ছিলে। ব্রীন হঠাৎ যে-রাতে উধাও হয়ে যায়, তুমিও ঠিক সে-রাতে শহর ছাড়লে। আর সে একই সময়ে পে রোলটাও লুট হলো।'

মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল স্রোত টের পেল ফ্রাঙ্ক। ধুরন্ধর রেঞ্জার ঠিক পথেই এগোচ্ছে। তবে মনের ভাব যাতে মুখে না-ফোটে, সে জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে ও।

'শেরিফ লেইফকে তুমি বলেছ, বাকস্কিনের পিঠে চড়া একটা লোক তোমাকে গুলি করেছে। বলেছ, লোকটার চোখ নাকি হলুদ। লেইফ বলেছে, ব্রীনের চোখের রঙও নাকি হলুদ। এটা কি তবে আরেকটা কাকতালীয় ঘটনা?'

চুপ করে আছে ফ্রাঙ্ক। একটু অপেক্ষা করল মসম্যান। তারপর ফের শুরু করল, 'তোমাদের দু'জনের কাজে দেখছি দারুণ মিল, সেলজার। চুপ করে আছ কেন? ব্রীনই যদি তোমাকে গুলি করে থাকে, তা হলে তার নাম বলতে চাইছ না কেন?'

ফ্রাঙ্ক নিজেও তা বুঝতে পারছে না। এটা এখন ওর কাছে পরিষ্কার যে, ব্রীনই টার্নারকে গুলি করেছে। ও ছাড়া আর কেউ হলে স্রেফ খুন করেই চলে যেত। ওর হাত দিয়ে ফ্রাঙ্কের নাম লিখত না। ফ্রাঙ্ককে ফাঁসানোর উদ্দেশ্যে একমাত্র ব্রীনের পক্ষেই এই চালাকি করাটা স্বাভাবিক। এতে আরেকটা সুবিধে হবে তার। দলের লোকেরাও বিশ্বাস করবে যে, টার্নারকে ফ্রাঙ্কই খুন করেছে। এর ফলে তারাও ফ্রাঙ্ককে দেখামাত্র গুলি করতে উৎসাহী হয়ে উঠবে। আর ব্রীন তো ঠিক সেটাই চায়।

কথা বলছে না ফ্রাঙ্ক। এ পর্যন্ত অনেক মিথ্যে কথা বলেছে। বাকস্কিনের পিঠে চড়া লোকটা ব্রীন, এ-মিথ্যেটা শেরিফ লেইফ যেমন বিশ্বাস করেছে, তেমনি মসম্যানকেও প্রভাবিত করেছে। এখন সে যদি মসম্যানের কাছে বলে, ব্রীন ওকে গুলি করেছে, তা হলে তার পরবর্তী প্রশ্ন হবে, কেন করেছে? আর তা-ই যদি হয়, শেরিফ লেইফকে ব্রীনের নাম বলা হয়নি কেন?

টেবিলের ওপর হালকা তবলা বাজাচ্ছে মসম্যানের আঙুলগুলো। ওর বয়স ফ্রাঙ্কের চেয়ে বেশি নয়। ওর দিকে সরাসরি চেয়ে আছে এখন ফ্রাঙ্ক। লোকটার চোখ-মুখ সতেজ, বুদ্ধিদীপ্ত। নিজের কাজে পুরোপুরি আস্থা এবং আত্মবিশ্বাসে টগবগ করে ফুটছে যেন লোকটা। ওর সঙ্গে নিজের অনেক মিল

BanglaBoi.com

খুঁজে পাচ্ছে ফ্রাঙ্ক। লোকট সৎ ও দক্ষ। নিজের বিবেক ও বুদ্ধি অনুসারে কাজ করতে পছন্দ করে। ফ্রাঙ্ক নিজেও তাই। তবে দু'জনের মধ্যে অমিল নিয়েও সচেতন সে। সবচেয়ে বড় অমিল দু'জনের অবস্থানে। মসম্যান সৎ ও দক্ষ ল-অফিসার আর ফ্রাঙ্ক একজন আউটল–এ মুহূর্তে আস্তাবলরক্ষক সাই টার্নারকে খুন করার দায়ে অভিযুক্ত।

কিন্তু ও যখন কথা বলল, তখন বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেল ওর গলায়। 'দেখো, মসম্যান, তুমি যেভাবেই বলো না কেন–আমার কিন্তু জবাব একটাই। সেটা হলো, তোমার ওই সাই টার্নারের খুনি আর যে-ই হোক, আমি নই। কিন্তু সাই যেহেতু ওর খুনি হিসেবে আমার নাম লিখে গেছে বলছ, তা হলে সেখানে আর কিছু বলার নেই। তুমি যদি মনে কর...'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল মসম্যান। 'আমি কী মনে করছি সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। যা হবার তা কোর্টেই হবে। তুমি শেরিফকে বলেছ, বাকস্কিনে চড়া একটা লোক তোমার দিকে গুলি ছুঁড়েছে। আমার মনে হয়, কথাটা তুমি সত্যি বলোনি। তবে আমি মনে করি, বাকস্কিনে চড়া লোকটা ব্রীন ছিল না। লোকটা কে, সেটা শেরিফ জানত এবং তুমিও জানতে। তোমরা দু'জনেই জানতে ওই পে রোল লুট করার সময় বাকস্কিনের পিঠে কে চড়েছিল এবং আমার বিশ্বাস, ম্যাক্সওয়েলকে বো ব্রীনই খুন করেছিল।

'তবে এর সবই স্রেফ "মনে হওয়া"-র ব্যাপার। কিন্তু এ-দেশে কেবল ভাবলে কিংবা মনে হলেই চলে না। এখানে কাজ চাই। কাজ দিয়েই সব কিছু প্রমাণ করতে হয়। আমি তোমাকে কারও ব্যাপারে অনুমান করতে বলছি না। তার দরকার হলে সে ধরনের লোককে কাজে লাগাব।'

বলতে বলতে চেয়ার টেনে আরেকটু কাছে এসে বসল মসম্যান। টেবিলের ওপর কনুইয়ের ভর রেখে সামনে ঝুঁকল। ওর

চোখদুটো সরু হয়ে উঠেছে। উৎসাহ আর আন্তরিকতায় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। 'তবু আমার এটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে যে, টার্নারকে তুমি খুন করনি। এও বিশ্বাস করতে মন চাইছে, তুমি আদতেই সৎ লোক, সৎ পথে চলতে চাও এবং সে জন্যে তোমার একটা সুযোগ পাওয়া দরকার। বেশ, আমি যদি তোমাকে সে ধরনের একটা সুযোগ করে দিই, তুমি কি তা নেবে? অবশ্য তার বদলে তোমাকে আমার প্রতিটি কথা শুনতে হবে, আমি যা বলি, তা করতে হবে।'

হতভম্ব হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে ফ্রাঙ্ক।

'কী, পারবে?' আবার জানতে চাইল মসম্যান।

মুখ দিয়ে কথা সরছে না ফ্রাঙ্কের। ঠোঁটদুটো যেন শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে। অবিশ্বাসে ভরা চোখদুটো পিট পিট করল বারকয়েক। তারপর ঘোঁৎ করে উঠল। 'খোদা! মসম্যান, তুমি...তুমি যা বলছ ভেবেচিন্তে বলছ তো?'

'অবশ্যই। আমি ভেবেচিন্তেই বলছি। আমি খুব বড় একটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছি। আমার সাহায্য দরকার হবে। তুমি যদি আমার কথা শোনো, তা হলে তোমার পরিষ্কার থাকার ব্যবস্থা আমিই করব।'

দীর্ঘ তিরিশ সেকেণ্ড একে অন্যের চোখে তাকিয়ে রইল ওরা। ফ্রাঙ্ক মসম্যানের চোখে আন্তরিকতা, সততা আর নিশ্চয়তার আভাস দেখতে পাচ্ছে। বারদুয়েক কথা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু ঠিক কী বলবে বুঝতে পারল না।

হঠাৎ ওর ভেতরে সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। অবিশ্বাস, প্রতারণা আর সন্দেহভরা এমন একটা সময় সে কাটিয়ে এসেছে যে, এখন কাউকে বিশ্বাস করতেই কষ্ট হয়। ব্যাপারটা ভাবতে কুটিল হয়ে উঠল ওর চোখ। ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে লাথি মেরে চেয়ারটা পেছনে সরিয়ে দিল। 'তুমি আমাকে বোকা ভেবে বসে

আছ নাকি, অ্যাঁ?'

চোখের পলক পড়ল না মসম্যানের। 'তোমাকে যদি বোকা ভেবে থাকি, সেটা তোমার দোষেই ভাবব। এখন যদি চুক্তি হয়, সেটা হবে সমানে সমান।'

'তাই? তা কতদিনের জন্যে এই চুক্তি বলো তো? আগামী ইলেকশন পর্যন্ত তো? মাস কয়েক পরেই তো ইলেকশন, তাই না? তারপর তো আর মনে থাকবে না চুক্তির কথা। আমাকে কি বাচ্চা ছেলে ভেবে বসে আছ, রেঞ্জার? আমি যদি ক্ষমা পেয়ে থাকি, সেটা কেবল...'

'তুমি তো পড়তে পার, তাই না?' কর্কশ স্বরে বলল মসম্যান। পকেট থেকে একটা চামড়ার কেস বের করল। ভেতর থেকে একটা কাগজ বের করে নিয়ে বিছিয়ে দিল টেবিলের ওপর। 'এটা পড়ো।'

কাগজটা দেখল ফ্রাঙ্ক। সরকারি সিলমারা আর গভর্নরের সই করা অব্যাহতি পত্র। আশার চিহ্ন দেখা গেল ওর চোখে। পড়া শেষ করে মাথা তুলতে মসম্যান বলল, 'কেবল তোমার নামটা নেই, এই যা।'

হাঁটুর কাঁপন টের পাচ্ছে ফ্রাঙ্ক। রেঞ্জারের কথাগুলো বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। 'ক্ষমার আওতায় কী কী থাকবে?'

'এ-পর্যন্ত বেআইনি যা করে এসেছ, সবই। কেবল খুন ছাড়া। টার্নারের ব্যাপারে আমি তোমার পক্ষ নেব। তুমি যদি আমাকে সত্যি কথা বলো, তা হলে আমি তা প্রমাণ করার চেষ্টা করব। করোনারের রিপোর্টে যদি ডান বাহু ভাঙার কথা লেখা থাকে, তা হলে তোমার দাবি সত্যি বলে ধরা হবে।'

'বেশ। কিন্তু ধরো, করোনারের রিপোর্টে তা লেখা থাকল না। তা হলে কী হবে?'

ঝকঝকে সাদা দাঁতের পাটি দেখিয়ে হাসল মসম্যান। 'যদি

লেখা না-থাকে? আরে থাকবে, থাকবে। সে দুশ্চিন্তা তোমার না-করলেও চলবে। এসো, হাত মেলাও, কার্লি!'

হাত বাড়াতে গিয়ে ফের গুটিয়ে নিল ফ্রাঙ্ক। মসম্যানের শর্তের কথা মনে পড়ল। রেঞ্জার বলেছে, কিছু শর্ত মেনে নিলেই কেবল গভর্নরের অব্যাহতি পত্রে তার নাম উঠবে।

'হাত মেলানোর আগে তোমার শর্তগুলো শুনে নিই,' বলল সে।

'তুমি যেরকম ভাবছ, ঠিক সেরকম নয়। গভর্নরের এখন দম ফেলার সময় নেই। তুমি নিজেই একটু আগে নির্বাচন কিনা জিজ্ঞেস করেছ। আসলে তাই। গভর্নর মারফি অনেকের লেজ মাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে এখন তার বিরুদ্ধবাদীর অভাব নেই। বিপদটা ঠিক কোন্‌দিক থেকে আসে, তা আগে ভাগে ঠাহর করাও সম্ভব হয় না।'

ফ্রাঙ্কের দিকে সরাসরি চোখ তুলে চাইল রেঞ্জার। 'গভর্নর তো এমনি এমনি কাউকে ক্ষমা করতে যাচ্ছে না। তোমাকে যা করতে বলা হবে, তা খুব সহজ নয়। তোমাকে একের পর এক বিপদের মধ্য দিয়ে কাজ করতে হবে। তোমাকে গুলি করা হতে পারে, তুমি মারাও যেতে পার। জনসাধারণের কাছ থেকে ধন্যবাদ কিংবা প্রশংসা জুটবে না তোমার কপালে। কিন্তু কাজটা যদি ঠিকঠাক মত শেষ করতে পার, তাহলে গভর্নরের ক্ষমা পেয়ে যাবে। তুমি আগে কী করেছ, তা নিয়ে কেউ কোনও প্রশ্ন তুলবে না। ডগলাস ব্যাংকে জমানো টাকার উৎস নিয়েও কেউ মাথা ঘামাতে যাবে না। ক্রাউন কিং পে রোল ডাকাতির কথাও কেউ তোমার কাছে কিছু জানতে চাইবে না। বো ব্রীন, স্নেক ফ্রেস্টন কিংবা ক্রাউডির সঙ্গে তোমার যোগসূত্র নিয়েও কারও কোনও কৌতূহল থাকবে না।'

ওর সম্পর্কে মসম্যানের জ্ঞানের পরিধি দেখে মনে মনে

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাচ্ছে ফ্রাঙ্ক। শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে। মিনিটখানেকের জন্যে মনে হলো হাত-পা অবশ হয়ে গেছে যেন ওর। চিন্তাশক্তি লোপ পেয়ে গেছে। কিন্তু এরপরই ফের মাথা কাজ করতে শুরু করল।

ওর মনে হলো, বার্ট মসম্যান লোকটা স্রেফ আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছে। এসব অভিযোগ যদি ফ্রাঙ্কের বিরুদ্ধে প্রমাণ করা যায়, তা হলে তাকে ক্ষমার প্রলোভন দেখিয়ে দলে ভিড়িয়ে নেয়ার পাঁয়তারা কেন? ব্যাপারটা ভাবতে মনে এক ধরনের শক্তি অনুভব করল ও। ওর ভাবান্তর লক্ষ করছিল মসম্যান। এবার জিজ্ঞেস করল, 'কী স্থির করলে, কার্লি? কাজটা নিচ্ছ?'

'আমি এখনও বুঝতে পারছি না, তুমি আমাকে দিয়ে ঠিক কী করাতে চাও? আমি পুরোপুরি না-জেনে বুঝে তোমার কথামত কাজ করতে রাজি নই।'

'এ-কাজটা তোমাকে না-জেনে বুঝেই করতে হবে, মাই ম্যান। যদি প্যারাডাইসে লিভারিম্যান হত্যার দায়ে ফেঁসে যেতে না-চাও।'

চোখদুটো জ্বলে উঠল ফ্রাঙ্কের। 'তুমি আমাকে মিথ্যে অভিযোগে ফাঁসাতে চাও?'

মসম্যান হাসল। 'তুমি তো ফেঁসেই আছ, কার্লি। টার্নারকে খুন না-করলেও। শোনো, দুনিয়াটা বড় কঠিন। সেটা তুমি নিজেও আমার চেয়ে কম জান না। আমার কাজটাও কঠিন। এটাকে আমি একভাবে না-পারলে অন্যভাবে করার চেষ্টা করি। এখানে আমি তোমাকে সে-উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চাই। তোমাকে আমি সম্ভাব্য সব ক্ষেত্রে সাহায্য করব। তারপর গভর্নরের অব্যাহতি পত্রে তোমার নাম লিখে দেব, যাতে তুমি জীবনটা নতুনভাবে শুরু করতে পার।'

বিক্ষুব্ধ আর হিংস্র দৃষ্টি মেলে রেঞ্জারের দিকে চেয়ে রইল

ফ্রাঙ্ক। নিজেকে স্রেফ ফাঁদে পড়া জন্তু বলে মনে হচ্ছে। ঠিক সে ধরনের ফাঁদ, যাতে ব্ল্যাক জ্যাক কেচামকে শেষ পর্যন্ত ফাঁসির দড়িতে ঝোলার ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে বাঁচতে হয়েছিল।

মসম্যানকে সে দোষ দিচ্ছে না। ও তার নিজের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করছে। এর জন্যে দায়ী বো ব্রীন নামের লোকটা। ব্রীনই তাকে এই ফাঁদে ফেলেছে। খুন করায় ওর প্রচণ্ড অনীহা। কিন্তু ব্রীনকে হাতের নাগালে পেলে খুন করতে সে সামান্যতম সময়ও নষ্ট করবে না এখন। স্রেফ ওর বুক ছিঁড়েই রক্ত পান করবে।

'ঠিক আছে,' কর্কশ কণ্ঠে বলল সে, 'দেখি তোমার প্রস্তাবটা কী শুনি।'

'সেটা আমার সঙ্গে কাজ করতে রাজি হওয়ার পর শুনতে পাবে। আগে তোমাকে শপথ করতে হবে।'

'কীসের শপথ?'

'শপথ করবে তুমি তোমার অব্যাহতি পত্রের বদলে গভর্নরের এ-কাজটা করে দিচ্ছ।'

'ধরে নাও, ওটা তুমি পেয়েই গেছ।'

'তোমার মুখে এখনও শুনতে পাইনি।'

বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকাল ফ্রাঙ্ক। বিড় বিড় করে খিস্তি আওড়াল। তবে বো ব্রীনকে শায়েস্তা করার দুর্বার আকাঙ্ক্ষাই শেষ পর্যন্ত তাকে শপথবাক্য পাঠ করতে উৎসাহিত করল।

উঠে দাঁড়াল মসম্যান। 'তুমি কি এবার করমর্দন করবে?'

'আমি তো তোমার কাজ করার যন্ত্র মাত্র। তুমি কি যন্ত্রের সাথে হাত মেলাতে চাও?'

'যন্ত্রের সাথে মানুষ হাত মেলায় না। তোমাকে কাজ করার যন্ত্র মনে করলে হাত মেলানোর কথা বলতাম না, কার্লি। আমি তোমার শুভ কামনা করি।'

'বেশ। আমার বিশ্বাস, তোমার শুভেচ্ছাই আমার সবচে' বেশি দরকার।'

'আমারও তা-ই বিশ্বাস, কার্লি।' মৃদু হাসল মসম্যান। হাত বাড়িয়ে দিল।

অনড় দাঁড়িয়ে আছে ফ্রাঙ্ক। 'ঠিক আছে, রেঞ্জার। তবে আমি এখন হাত মেলাতে চাই না। আমি হাত মেলাব অব্যাহতি পত্রে নাম উঠেছে দেখার পর।'

স্থির দৃষ্টি মেলে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে রইল মসম্যান। তারপর ফিরে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল। টেবিলের ড্রয়ার থেকে কলম আর কালির দোয়াত বের করল। 'কার্লি ফ্রাঙ্ক নামে তোমাকে যারা চেনে, তারা জানে এটা কতটা ভয়ঙ্কর নাম। কিন্তু গভর্নরের অব্যাহতি পত্রে তার কোনও দাম নেই। তোমার আসল নামটাই লিখতে হবে। তোমার নামের বানানটা বলবে দয়া করে?'

নামের বানান বলে দিল ফ্রাঙ্ক। অব্যাহতি পত্রের একটা খালি লাইনে ওর নাম লিখছে মসম্যান, খেয়াল করল। লেখা শেষ হতে হাত বাড়িয়ে দিল রেঞ্জারের দিকে। ওর হাতটা আঁকড়ে ধরল মসম্যান। ছেড়ে দিয়ে পেছনে সরে গেল ও। কিন্তু বাড়িয়ে দেয়া হাতটা গুটিয়ে নিল না ফ্রাঙ্ক।

মৃদু হাসল মসম্যান। 'আমি বোকা নই, জেলজার। তুমি কাজটা শেষ করার পরই এই কাগজটা হাতে পাবে। তার আগে নয়।'

'বেশ। কিন্তু আমার অস্ত্রটা?'

ওটা ফিরিয়ে দিল মসম্যান। 'এবার এই চুক্তিপত্রটা নাও। কী করতে হবে, সব এখানে উল্লেখ করা আছে...'

মিনিট কয়েক এক নাগাড়ে বলে গেল মসম্যান।

নিজের চেয়ারে ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল ফ্রাঙ্ক। আচমকা লাফিয়ে উঠল ও। 'জাহান্নামে যাও তুমি। তোমার ওই

চুক্তির নিকুচি করি...’

‘আরে আরে দাঁড়াও...এক মিনিট। শোনো, তুমি কিন্তু আমাকে কথা দিয়েছ...’

‘সেটাও জাহান্নামে যাক!’

তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে তাকাল মসম্যান। তারপর ঠাণ্ডা স্বরে বলল, ‘বেশ। তুমি যা ভাল বোঝ। কিন্তু পরে যখন আটকে যাবে, তখন যেন...’ কাঁধ ঝাঁকাল রেঞ্জার।

## চোদ্দ

সকাল থেকে সুজানার মন ভাল নেই। কেমন যেন হতাশা আর অস্থিরতায় ভুগছে। কেন ভুগছে, তারও কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। হতাশা নিয়ে সকাল বেলায় ঘুম থেকে জেগে ওঠার অভিজ্ঞতাও ওর তেমন নেই। সব সময় ও ঘুম থেকে ওঠে সজীব আর নির্ভার মন নিয়ে। ওর সামনে থাকে দিনভর কী কী করবে তার একটা সাধারণ ছক। সে ছক অনুযায়ী নিজেকে তৈরি করে নেয়।

বিশেষ করে কিশোরী বেলা পেরিয়ে যখন তরুণী হিসেবে নিজেকে অনুভব করতে শিখল, সে থেকেই তার স্বপ্ন দেখা এবং দায়িত্ব পালনের ছক কাটা শুরু। নিজের চারপাশের জগৎ নিয়ে একটা প্রাত্যহিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে সে। সেখানে নিজের অকর্মণ্য বাবারও একটা স্থান ছিল। বাবাকে নিয়েও তার উদ্বেগ আর ভালবাসায় মেশানো সময় কাটত। বাবার সাথে রাগ

বা মান-অভিমানেরও আলাদা একটা স্বাদ পেত সে।

সুজানা বিশ্বাস করে, যেখানে আত্মবিশ্বাস, সেখানেই পূর্ণতা। হতাশা কিংবা দুঃখবোধকে পাত্তা দেয় না সে, মন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দেয়। ওর তরুণী মনে উৎসাহের অভাব কখনও হয় না; দৈনন্দিন রুটিনবাঁধা কাজগুলোতেও সুষ্ঠু পরিকল্পনার ছাপ থাকে।

কিন্তু আজ সকাল থেকে অনিশ্চয়তার কারণ কী, ধরতে পারছে না ও। ওর আত্মবিশ্বাস বা পরিকল্পনা কোনওটাই যেন কাজ করছে না আজ। এখন নিত্য নতুন সমস্যা সৃষ্টি করছে *ডেভিল আয়রন*। কুলিয়ে উঠতে পারছে না সুজানা ওদের সঙ্গে। নিজেদের ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট হয়ে উঠছে ওর চোখে। সামনেটা একটা গভীর কালো পর্দায় ঢাকা যেন।

কার্লি ফ্রাঙ্কের সঙ্গে গতকাল বিকেলে দীর্ঘ আলাপের পরও কোনও আলোর আভাস পায়নি ও। বর্তমান অবস্থায় ওর সাহায্য পেলে ভাল হতো। লোকটার সরাসরি প্রত্যাখ্যান ওকে সারারাত কষ্ট দিয়েছে। তিক্ততায় ছেয়ে গেছে মন।

অবশ্য ফ্রাঙ্ককে অবস্থাটা পুরোপুরি ভেঙেও বলেনি। ও নিজে ডেভিল আয়রনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে বলেছে। কিন্তু প্রতিবেশী ডায়মণ্ড এক্সের কাছে সে-প্রস্তাব দিয়ে যে ব্যর্থ হয়েছে, সেটা গোপন রেখেছে। *ডায়মণ্ড এক্স* আসলে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ন্যাট লামট্রিলের সঙ্গে কোনওরকম বিরোধে যেতে রাজি হয়নি। তারা বরং ডেভিল আয়রনের ছত্রচ্ছায়ায় থেকে নির্বিবাদে ব্যবসা চালিয়ে যেতে চায়।

একটা ব্যাপারে সুজানার কোনও সন্দেহ নেই। ফ্রাঙ্ক ওকে সাহায্য করতে রাজি হয়নি, সেটা ডেভিল আয়রনের ভয়ে নয়। কাল ওর সঙ্গে কথা বলার পর থেকে যতক্ষণ দিনের আলো ছিল, ততক্ষণ লোকটা এড়িয়ে চলেছে ওকে। ওর সামনে না-পড়ার

ব্যাপারে সতর্ক থেকেছে। সুজানার চোখ এড়ায়নি ব্যাপারটা। আসলে এটা নিয়ে দ্বিতীয়বার যাতে আলোচনা করতে না-হয়, সে জন্য ওর সামনে পড়তে চায়নি লোকটা।

তবে তার অনীহা দেখেও হাল ছেড়ে দেয়নি সুজানা। গরজটা ওর, সুতরাং এরপরও ফ্রাঙ্কের সঙ্গে আরও আলাপ করার কথা ভাবছে সে। লোকটাকে রাজি করাতে পারলে ওকে দিয়ে করানোর মত অনেক কাজ আছে ওর হাতে।

আরেকটা ব্যাপারও জানা আছে ওর। ওয়ান্টেড লিস্টে নাম আছে ফ্রাঙ্কের। ওকে ধরিয়ে দিতে পারলে পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কার। ধরিয়ে দেয়ারও দরকার নেই। সিব ডসনকে ওর অবস্থানটা জানিয়ে দিতে পারলেই হলো। টাকাটা লামট্রিলের সঙ্গে লড়াইয়ের কাজে সচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারে সুজানা। এই টাকা দিয়ে বেশ কয়েকজন দুর্ধর্ষ বন্দুকবাজ ভাড়া করা যায়।

লামট্রিলের লড়াইয়ের স্ট্র্যাটেজি জানা আছে সুজানার। প্রতিপক্ষ বাধা দেয়ার জন্যে তৈরি হওয়ার আগে আঘাত করাটাই ওর নিয়ম। স্থানীয় প্রশাসনের ওপর ওর প্রভাব রয়েছে। তিনজন দুর্ধর্ষ ক্রু আছে তার। এদের একজনকে প্রাথমিকভাবে প্রতিপক্ষকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। ভালই কাজে দিয়েছে ওর কৌশলটা। *ডায়মণ্ড এক্স* এতেই কুপোকাত। সুজানার রুখে দাঁড়ানোর প্রস্তাবে সরাসরি না করে দিয়েছে।

কিন্তু *ডায়মণ্ড এক্স* ভয় পেলেও সুজানা ভয় পাচ্ছে না। ওর বিশ্বাস, লামট্রিলের মোকাবিলা করাটা তেমন কঠিন কিছু নয়। ওর এমনও ধারণা, *ডায়মণ্ড এক্স* রাজি না-হলেও এ-অঞ্চলের অন্য র‍্যাঞ্চগুলো ওকে সাহায্য করবে। ব্যাপারটা বেশি বাড়াবাড়িতে গিয়ে ঠেকলে শেষ পর্যন্ত গভর্নর স্বয়ং নাক গলাতে বাধ্য হবেন।

কেবল নিজের প্রয়োজনে রেঞ্জ ওঅরের মত ভয়াবহ ব্যাপার

ঘটাতে চাইছে না সুজানা। কিন্তু এও ঠিক, র‍্যাঞ্চ রক্ষার জন্যে এ ছাড়া বিকল্প কোনও পথও খুঁজে পাচ্ছে না ও। *বক্সড ওয়াই* ওর নিজের র‍্যাঞ্চ। যে কোনও মূল্যে র‍্যাঞ্চটার নিরাপত্তা চায় সে। *বক্সড ওয়াই*-এর শত্রুদের এমনিতে ছেড়ে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। এ জন্যে যদি রেঞ্জ ওঅরও বেধে যায়, তার কিছু করার নেই। কিন্তু কোনওভাবে *বক্সড ওয়াই*-এর ক্ষতি হবে, এমন কিছু মেনে নিতে পারবে না ও।

এখন অশান্তির নতুন আরেকটা উপসর্গ এসে জুটেছে ওর জন্যে। উপসর্গটা হলো মার্টা মে। ন্যাট লামট্রিলের মেয়ে। মেয়েটা সুন্দরী। পুবের স্কুলে পড়েছে। চলনে বলনে কেতাদুরস্ত। সুন্দর একটি ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরোয়। আর শহরে এলে প্রচুর টাকা ওড়ায়। যদিও জানে না ওড়ানোর টাকাটা কোত্থেকে আসে। জানার গরজও বোধ করে না। এই অঞ্চলের প্রায় সবাই ভক্ত বনে গেছে মেয়েটির। কিন্তু সুজানা দু'চোখে দেখতে পারে না ওকে। ওরকম নষ্ট চরিত্রের মেয়ে ওর চোখে আর কখনও পড়েনি।

আঠার মত আকৃষ্ট করে মেয়েটা সবাইকে। আইনপড়া তরুণ জুলেস অ্যাকটেইনের সঙ্গে একটা চমৎকার সম্পর্ক গড়ে উঠতে যাচ্ছিল সুজানার। কিন্তু মার্টা আসতে সম্পর্কটা কেমন যেন শীতল হয়ে গেল। মার্টার সঙ্গে দহরম মহরম শুরু হয়েছে অ্যাকটেইনের। সুজানা ডাকলেও আগের মত দেখা করতে আসে না। লোকটা আসলে পোষা কুকুরের মত। মাংস হাতে যে-ই ডাকবে, তার কাছে গিয়ে লেজ নাড়াতে থাকবে। অনেকটা সিব ডসনের মতই।

ন্যাট লামট্রিলের আগ্রাসীপনার কারণেই ওর প্রতি তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে সুজানার মনে। লোকটাকে শায়েস্তা করার জন্যে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে সে। এ জন্যে লড়াই করতে হলেও রাজি। তবে এটা একটা প্রধান কারণ হলেও তার চেয়ে বড় কারণ

হলো, ও চায় ওর বাবা রড রোনাল্ড ঠিক সে আগের মত প্রভাব-প্রতিপত্তি ফিরে পাক। সে পুরানো দিনের মত আত্মসম্মান ও মর্যাদা নিয়ে দাঁড়াক। বাবাকে সে-ব্যাপারে সাহায্য করতেই ওর সমস্ত চেষ্টা।

কিন্তু বাস্তব অবস্থা যে ভিন্ন, তাও সে বোঝে। ওর চেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হবে, এমন কোনও গ্যারাণ্টিও নেই। তবু লামট্রিলের অন্যায়ের কাছে মাথা নত করতে পারবে না সুজানা।

দু'হাতে চোখ মুছতে মুছতে বিছানা ছেড়ে উঠে বসল সে। ওর রুমে এখনও অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। কিন্তু বাইরে তাকিয়ে গাছপালায় পুবালি বাতাসের শিরশির শব্দ শুনতে শুনতে বুঝতে পারল যে, ভোর হয়ে গেছে। আরেকটু পরেই দিনের আলো ফুটবে।

বিছানা থেকে নেমে মৃদু পায়ে ফ্রাঙ্কের ঘরের দরজায় গিয়ে আস্তে আস্তে টোকা দিল সে। ব্যাপারটা যে নেহাত পাগলামি হচ্ছে, বুঝতে পারছে। তবু ফ্রাঙ্কের সঙ্গে ফের কথা বলার ঝোঁকটা সামলাতে পারছে না। সে হয়তো গতকালকের মত এবারও তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবে। তবু আবার চেষ্টা করে দেখার ইচ্ছে হচ্ছে ওর।

এখন অবশ্য কিছুটা আশাবাদীও হয়ে উঠেছে ও। সকাল বেলায় চারদিকে একটা পবিত্র সমাহিত ভাব, দিনের কোলাহল মানুষের মনে বিরূপ প্রভাব ফেলতে শুরু করেনি এখনও। এ-সময় যদি ফের কথা বলা যায় ফ্রাঙ্কের সাথে, কালকের মত হয়তো অস্বীকার না-ও করতে পারে। সুজানার প্রয়োজনটা যে কত বড়, হয়তো মন দিয়ে উপলব্ধি করতেই পারে।

আবার নক করল ও, আগের চেয়ে জোরে। জানে, লোকটা কর্কশ স্বভাবের, এমনকী কিছুটা নিষ্ঠুরও হয়তো। তবে ওর চলনে বলনে যোগ্যতা ও আত্মবিশ্বাসের কমতি নেই। মুখ দেখে মনে

হয় অনেক ঘাটের পানি খেয়ে অভিজ্ঞ। সবচেয়ে বড় কথা, ভাল-মন্দ বিচারের মত জ্ঞান ও চর্চা দুটোই রয়েছে তার।

সুজানা অবাক হলো। ফ্রাঙ্ক সেলজার *বক্সড ওয়াই*-এ আসার পর থেকে নিজের অজান্তে কেমন একটা স্বস্তি আর নিশ্চয়তার আভাস পাচ্ছে ভেতরে ভেতরে। অন্তত গতকাল পর্যন্তও তা ছিল। গতকাল ওর মুখে 'না' শোনার পর থেকে অবশ্য হতাশায় ছেয়ে গেছে ওর মন। তবু একেবারে আশা ছাড়েনি সুজানা। ওকে ফের অনুরোধ করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করাতে পারবে বলে ভাবছে।

অন্যদের কাছ থেকে ওকে একটু আলাদা দেখছে ও। ওর স্বাভাবিক ও সহজ ভাবভঙ্গি ওর ভাল লেগেছে। নজর কেড়েছে মনখোলা হাসি। সাদা দাঁতের ঝিলিকে ওর মুখটাকে কেমন নিষ্কলুষ দেখায়। ওর মনে আস্তে আস্তে এমন ধারণাও হয়েছে, এক সময় লোকটাকে আরও ভাল করে জানার সুযোগ আসবে।

দরজায় নক করেও কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না ফ্রাঙ্কের। একটু অবাক হলো সুজানা। এই ক'দিন যা দেখে এসেছে, ফ্রাঙ্কের ঘুম ততটা ভারী মনে হয়নি ওর। সামান্য শব্দেই চোখ মেলে নিঃশব্দে জেগে উঠতে দেখেছে ওকে। অসহিষ্ণু হয়ে উঠল এবার। জোরে টোকা দিল দরজায়। এরপরও সাড়া না-পেয়ে এবার দরজায় কান পাতল। ধীরে ধীরে ভুরু কুচকে উঠতে শুরু করল ওর। ফ্রাঙ্কের নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত কানে আসছে না।

আচমকা ভয় পেল ও। কী হয়েছে লোকটার? এবার জোরে ধাক্কা দিল দরজায়। হাট করে খুলে গেল পাল্লাদুটো।

বিছানায় নেই ফ্রাঙ্ক!

পুরো ঘরটায় চোখ বুলাল সুজানা। চেয়ারে ওর কাপড়চোপড় ছিল, তাও নেই। ওর গানবেল্ট ও স্টেটসন হ্যাটটাও যেখানে রাখে, সেখানে দেখা যাচ্ছে না। বিস্ময় ও আতঙ্কের ধাক্কায় গুড়িয়ে

উঠতে গেল ও। মুখে হাতচাপা দিয়ে নিজেকে সামলাল।

বিছানায় ওর শোয়ার চিহ্ন রয়ে গেছে এখনও। তবে বিছানা শীতল। অনেক আগে উঠে গেছে ফ্রাঙ্ক বিছানা ছেড়ে। বালিশে হাত বুলাল সে। বালিশও ঠাণ্ডা। নেড়েচেড়ে দেখতে গিয়ে ওটার তলায় কাগজটা দেখতে পেল।

হতভম্ব হয়ে মসম্যানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ফ্রাঙ্ক। চেয়ার ছেড়ে হাঁটল কয়েক পা। ফের চেয়ারে বসল। ওর দু'চোখে অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের চিহ্ন। 'আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। তুমি কি আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ? আটকাচ্ছ না?'

'না। তুমি যখন খুশি তখন ওই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পার। যেখানে খুশি, সেখানে চলে যেতে পার।'

ভুরু কুঁচকে লোকটাকে দেখছে ফ্রাঙ্ক। 'আমি বেরিয়ে লামট্রিলের কাছেও চলে যেতে পারি।'

'নেহাত ফালতু আর বাজে ধরনের লোক হলে চলে যেতেও পার।'

'তারপরও তুমি আমাকে যেতে দিচ্ছ?'

'আমার মনে হয় না, তুমি অতটা ফালতু মানুষ। তুমি সেখানে যাবে না।'

বিড় বিড় করে খিস্তি আওড়াল ফ্রাঙ্ক। পর মুহূর্তে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। পায়ের ধাক্কায় পেছনে সরিয়ে দিল চেয়ারটা। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। বাইরে ওর ঘোড়ার খুরের ধ্বনি শুনল মসম্যান।

চমৎকার রাইডিং পোশাক পরনে মার্টা মের। দারুণ মানিয়েছে। সাবলীল ভঙ্গিতে ঘোড়ায় চড়ে একটা উতরাই পেরোচ্ছে, এমন সময় সামনে থেকে দ্রুত ছুটে আসা ঘোড়ার খুরের শব্দ এসে

কানে ঢুকল। বিরক্তিতে নাক কুঁচকাল মার্টা। কোন্ বেআক্কেল এভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে? ধুলোয় চারদিক অন্ধকার হওয়ার জোগাড়।

ধুলোর দাপট থেকে বাঁচার আশায় কালো গেল্ডিংটাকে রাস্তার এক পাশে থামিয়ে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল মার্টা।

আজ ওর একটু তাড়া আছে। জুলেস অ্যাকটেইনকে কথা দিয়েছে বেলা এগারোটায় ড্রাই বটমে দেখা করবে। লোকটাকে ওর বাবা পছন্দ করে। সেটা অবশ্য স্বার্থের কারণে। আইন নিয়ে পড়াশোনা করে লোকটা। ভবিষ্যতে কখন কোন্ কাজে লেগে যায়, তার ঠিক নেই। তাই মার্টাকেও ওকে কিছুটা পাত্তা দিয়ে চলতে হয়। কিন্তু ওর সঙ্গ একদম পছন্দ নয় ওর। গোমড়ামুখো লোকটার রয়েছে কড়া সময়ানুবর্তিতা আর সারাক্ষণ আইন-আদালত নিয়ে একঘেয়ে স্বরে কথা বলে যাওয়ার প্রবণতা। দু'মিনিটেই বিরক্তি ধরে যায় ওর। তবে আজ ও একদম কাঁটায় কাঁটায় পৌঁছে ওকে খুশি করে দিতে চায়, যাতে করে একটু আগে ভাগে ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসে বাকি সময়টা কিড ব্যাজারের সঙ্গে কাটাতে পারে। কিডের সঙ্গ ভাল লাগে মার্টার।

উতরাই বেয়ে রিজের মাথায় উঠতেই সামনে থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ তুলে ছুটে আসা রাইডারকে দেখল মার্টা। রাইডারও দেখল ওকে। আস্তে আস্তে কমিয়ে আনল নীল রঙের রোয়ানটার গতি। পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে আরও কমিয়ে ফেলল। হণ্টন গতিতে এগোল এবার রোয়ান। আরও কাছাকাছি হতে লোকটার চোখদুটো সরু হয়ে উঠতে দেখল মার্টা। ভাব দেখে মনে হলো, লোকটা যেন ওকে চেনার চেষ্টা করছে। তারপরই চোখদুটো সরল হয়ে উঠল। একধরনের স্বীকৃতি আর মুগ্ধতার চিহ্ন দেখল তাতে মার্টা। তবে খুব একটা ভাবান্তর হলো না ওর। পুরুষের চোখে ওকে দেখে এরকম দৃষ্টি প্রায় দেখতে হয় ওকে।

মার্টাও দেখল লোকটাকে। দীর্ঘদেহী, সুদর্শন। পশ্চিমের রুক্ষ কঠিন ছাপ সত্ত্বেও মুখে কমনীয়তার আভাস। গভীর কালো চোখ, প্রশস্ত ঠোঁট আর শক্ত উঁচু চিবুক। অনেকদূর থেকে ঘোড়ায় চড়ে আসার দরুণ লম্বাটে মুখে ধুলোর প্রলেপ। হাবভাব দেখে এখানকার কেউ মনে হচ্ছে না। ভবঘুরে টাইপের কেউ হবে হয়তো, ভাবল মার্টা।

মার্টা সম্ভবত ওর পাশ কাটিয়ে চলে যেত নীরবে। তবে লোকটা ঘোড়া নিয়ে প্রায় আড়াআড়িভাবে দাঁড়াল রাস্তার মাঝখানে। তারপর মৃদু সৌজন্যের হাসি হেসে ওর কাছ থেকে জানতে চাইল লামট্রিল আউটফিটে যাওয়ার পথ কোথায়।

সুডৌল ডান হাতটা উঁচিয়ে যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকে নির্দেশ করল মার্টা। সুন্দর বাচনভঙ্গিতে জবাব দিল, ‘তুমি চাইলেও মিস করতে পারবে না।’ একটু থেমে দেখল লোকটাকে। তারপর আবার বলল, ‘লামট্রিল আউটফিটে কেন যাচ্ছ জানি না। তবে যদি চাকরির খোঁজে যাও, তা হলে স্রেফ সময় নষ্ট হবে তোমার। *ডেভিল আয়রন* যে সে লোককে কাজে নেয় না।’

‘তাই নাকি?’ হাসল ফ্রাঙ্ক। ‘তা কোন্ ধরনের লোককে কাজে নেয় ওরা?’

‘অন্তত তোমার মত কাউকে না!’ মুখ ঝামটা মারল মার্টা। তারপর বাঁকা হাসি হেসে পাশ কাটিয়ে ঘোড়া ছোটাল ফের ড্রাই বটমের উদ্দেশে।

বেলা প্রায় আড়াইটার দিকে *বক্সড ওয়াই* র‍্যাঞ্চহাউসের উঠানে পৌঁছল ফ্রাঙ্ক। সুজানা তখন কাপড়চোপড় ধুয়ে রোদে দিচ্ছে। ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে চকিতে ঘুরল মেয়েটি। ফ্রাঙ্ককে দেখে চমকে উঠল প্রথমে। পরক্ষণে দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর।

তবে সাথে সাথে মুখের ভাব পাল্টে ফেলল। বরাবরের মত পাথুরে ভাব ফিরে এল তাতে। অবশ্য ওর মুখে পলকের জন্য ফুটে ওঠা উজ্জ্বল ভাবটুকু ফ্রাঙ্কের নজর এড়াল না।

ফ্রাঙ্কের উপস্থিতি উপেক্ষা করে নিচু হয়ে ভেজা কাপড়ের ঝুড়ির ওপর ঝুঁকল মেয়েটি। ঘোড়ার ওপর বসেই পকেট থেকে মেকিংস বের করে সিগারেট বানাতে শুরু করল ফ্রাঙ্ক। বলল, 'বছরের এই সময়টায় এদিকে খুব গরম, তাই না?'

এক মনে নিজের কাজ করে যেতে লাগল সুজানা। ফ্রাঙ্কের কথা ওর কানে ঢুকেছে বলে মনে হলো না।

হ্যাটটা ঠেলে পেছনে সরিয়ে সিগারেট বানানো শেষ করে আগুন ধরাল ফ্রাঙ্ক। চুপচাপ প্রায় তিরিশ সেকেণ্ড ধূমপান করল। তারপর বলল, 'তখন মনে হয়, সিদ্ধান্তটা নিতে একটু তাড়াহুড়ো করে ফেলেছিলাম। ব্যাপারটা পরে বুঝতে পেরেছি।'

ঝুড়ি থেকে এক জোড়া ভিজে প্যান্টি বের করল সুজানা। পানি ঝরানোর জন্য ঝাড়তে গেল। আচমকা হাতের জিনিসগুলো কী খেয়াল হতেই লজ্জায় লাল হলো কিছুটা। তবে তা সামলে নিয়ে মুখে ক্রুদ্ধ ভাব ফুটিয়ে তুলে মেলে দিল কোনওমতে। সিগারেটের শেষ হয়ে আসা অংশটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ফ্রাঙ্ক। নামল ঘোড়া থেকে। হাসছে সে। আরও লাল হয়ে উঠল সুজানার মুখ। ফ্রাঙ্কের দিকে না-তাকিয়ে বলল, 'ডেভিল আয়রনেই যদি কাজ কর, তা হলে ফের এখানে এলে কেন?'

'সেটা আবার কে ঢোকাল তোমার মাথায়?'

'মনে হয়, মার্টা মের নাম লেখা কাগজটা দেখে বুঝতে পেরেছি। কাগজটা তো তোমার বালিশের নীচেই ছিল, তাই না?'

'ব্যস, তাতেই তোমার সব জানা হয়ে গেল?' ভুরু কুঁচকাল ফ্রাঙ্ক। 'সে যাক। এখন তুমি কি চাও না যে, আমি তোমাদের র‍্যাঞ্চে কাজ করি?'

মুখের ভাব পাল্টে গেল সুজানার। অনেক শান্ত আর পরিশীলিত দেখাল তাকে। কিছুটা অবাক হয়ে চাইল সে ফ্রাঙ্কের দিকে। তারপর চুপ করে রইল। যে কোনও লামট্রিলই তার ঘৃণা আর প্রতিহিংসার পাত্র। হঠাৎ সন্দেহ উঁকি দিল তার মনে। এটা চালাকি নয়তো? কথাটা মনে হতেই রাগে মুখ লাল হয়ে উঠল ওর। খ্যাপাটে স্বরে বলে উঠল, 'লামট্রিল তোমাকে পাঠিয়েছে এখানে, না?'

'দেখো, আমি লোকটাকে চিনিও না...'

'ওর মেয়েকে তো ঠিকই চেন।'

'তাতে কী? আমি তোমাকে র‍্যাঞ্চের ব্যাপারে সাহায্য করতে এসেছি...'

'এ-কথা যারা বিশ্বাস করবে, তারা নিশ্চয় পায়ে হাঁটে না, মাথায় ভর দিয়ে হাঁটে। গতকাল তোমার মুখে এ-কথা শোনা যায়নি। এমনকী, আমি সাহায্য চাওয়ার পরও।'

'সেটা আজ নয়। সেটা ছিল গতকাল।'

'তার মানে পরিকল্পনা ফাঁদার জন্য যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনার সময় পেয়েছ। অথচ আমাকে সাহায্য করতে হবে, এই ভয়েই রাত ভোর হওয়ার আগে চোরের মত পালিয়েছিলে।' হেসে উঠল সুজানা। তবে তাতে যে আনন্দ বা উল্লাসের বিন্দুমাত্রও নেই, বুঝতে অসুবিধে হলো না ফ্রাঙ্কের। মাথা ঝাঁকিয়ে চোখের ওপর এসে পড়া চুল সরিয়ে দিল সুজানা। 'আমি নির্বোধ নই, কার্লি। তুমি আমাকে সাহায্য করতে ফিরে এসেছ, ব্যাপারটা অত সরল নয়। তুমি এখান থেকে চলে যাওয়ার পর কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়।'

'সেটা ঠিক।' গোটানো লাগামের বাড়ি মেরে প্যান্টের ধুলো ঝাড়ল ফ্রাঙ্ক। 'তোমার অবস্থাটা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখার সুযোগ পেয়েছি। মনে হয়েছে, তোমাকে এভাবে ফেলে রেখে যাওয়াটা

উচিত হচ্ছে না।'

'আমাকে নয়, বলো বালিশের নীচে মার্টা মের নাম লেখা কাগজটা। ওটা না নিয়ে যাওয়াতে ওই কুত্তীটা তোমাকে গালাগাল করেছে। তুমি ওটার জন্যে এসেছ।'

রাগে বিড় বিড় করে খিস্তি আওড়াল ফ্রাঙ্ক। ডান হাত তুলল। মনে হলো, মারতে যাচ্ছে মেয়েটিকে। পর মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে। ঝট করে পেছন ফিরল। পা বাড়াল রোয়ানের দিকে।

'বেশ, তা হলে জাহান্নামে যাও তুমি। তুমি যদি আমার সাহায্য না চাও, তা হলে আর কী করার আছে?'

'না, আমার সাহায্য চাই,' সুজানা বলল। 'আমি তোমার সাহায্য নেব। তুমি যেভাবেই এসে থাক না কেন। কিন্তু তোমার ওপর আমার চোখ থাকবে সারাক্ষণ। নিমকহারামী করতে দেখলে সোজা জাহান্নামে পাঠিয়ে দেব।'

ওর চোখ দেখে মনে হলো, যা বলছে ঠিক তাই করবে মেয়েটা।

নিজের ঘোড়ার স্যাডলে চড়ে বসল ফ্রাঙ্ক। মেয়েটার চোখের রঙ বাদামী। তবে এখন সে উজ্জ্বল বর্ণ নেই চোখে। কালো হয়ে গেছে যেন। ওর মুখে বিতৃষ্ণা। ফ্রাঙ্কের মনে হচ্ছে, এখন যদি সে চলেও যায়, মেয়েটা তাকে আর গতকালকের মত থাকতে সাধবে না। এমনকী একটি কথাও বলবে না।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে চিবুক উঁচিয়ে উদ্ধত ভঙ্গিতে। ওর চোখদুটো স্থির, মুখ পাথরের মত শক্ত। অসহিষ্ণুভাবে অপেক্ষা করছে যেন কখন তার সামনের লোকটা ঘোড়ায় চড়ে চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাবে। তবে ফ্রাঙ্কের মনে হচ্ছে, সুজানা যেন চাইছে, ও আসলেই থেকে যাক। কিন্তু সেটা নিজের মুখে প্রকাশ করে নিজেকে কখনও খাটো করবে না।

মেয়েটার সাহস আছে বটে। নিজের দায়িত্ব পালন করার

মত বুদ্ধিও। কিন্তু একটা জিনিস ফ্রাঙ্ক বেশ বুঝতে পারছে যে, মেয়েটার সঙ্গে ওর মিলবে না। তাদের দু'জনেরই স্বভাব প্রায় এক। দু'জনেই জেদী এবং সম্ভবত গোঁয়ার। ফ্রাঙ্ক অবশ্য ওই দুটো বৈশিষ্ট্য নিজের মধ্যে আছে বলে খুশি। ওর মতে, একজন পুরুষের এই গুণ অবশ্যই থাকা উচিত। কিন্তু ওই ধরনের একজন মহিলার সঙ্গে একই বৈশিষ্ট্যের পুরুষের বেশিদিন থাকা সম্ভব না-ও হতে পারে।

কিন্তু এখন ওকে আরেকটা ব্যাপারও চিন্তা করতে হচ্ছে। মার্টা মের খোঁজ পেয়েছে সে এখানে এসে। মেয়েটাকে ও নিজের করে পেতে চায়। কিন্তু বাস্তব অবস্থা যা দেখতে পাচ্ছে, তাতে ব্যাপারটা খুব একটা সহজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। মার্টা মে ডাকসাইটে র‍্যাঞ্চার ন্যাট লামট্রিলের মেয়ে। ওকে পেতে হলে ওর বাপের চোখে নিজেকে যোগ্য হিসেবে প্রমাণ করতে হবে। সেটা অবশ্যই টাকা-পয়সা আর ধন-সম্পদের মামলা। সেদিক দিয়েই লামট্রিলের জামাই হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতাও ওর নেই।

শুধু তাই নয়। ওর সাথে আজ সকালে মার্টার দেখা হয়েছে। সত্যি বলতে কী, ব্যাপারটা এখন আগের চেয়েও কঠিন বোধ হচ্ছে। খুব বেশি অহঙ্কারী আর উন্নাসিক মনে হয়েছে মেয়েটাকে ওর কাছে। মেয়েটা যদি ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত, তা হলে বিষয়টাকে অতটা কঠিন মনে হতো না।

কিন্তু অত সহজে হাল ছাড়ার ধাতু ওর নেই। ও সিদ্ধান্ত নিয়েছে অপেক্ষা করার। তা করতে হলে ওকে মেয়েটার কাছাকাছি থাকতে হবে। আর কাছাকাছি থাকার জন্যে ওকে *বক্সড ওয়াই*-এর কাজটা গ্রহণ করতে হবে। বার্ট মসম্যানকে ও কথা দিয়ে এসেছে ন্যাট লামট্রিলের ধারে কাছেও ভিড়বে না। তার চেয়ে বরং সুজানাকে সাহায্য করার নামে থেকে যাবে মার্টার কাছে পিঠে।

ঘোড়ার পিঠে বসেই জিজ্ঞেস করল সে সুজানাকে, 'জমি বেচে কত টাকা পাবে তুমি?'

'মনে হয় না, ওটা বেচতে পারব। *ডায়মণ্ড এক্স* না করে দিয়েছে।'

'কেন, ওরা কি *ডেভিল আয়রন*কে সমর্থন দিচ্ছে নাকি?'

'না, ওরা কোনও পক্ষ নেবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে।'

'তা বেশ। কিন্তু আরও অনেক র‍্যাঞ্চ তো আছে। তুমি ওদের কাছে যেতে পার।'

'না, ওরা হলো গিয়ে চুনোপুঁটি। ওদের কেনাকাটার সাধ্য নেই। তারা স্রেফ অপেক্ষা করে আছে কখন লামট্রিলের বন্দুকবাজরা এসে ভাগিয়ে দেবে তাদের। অবশ্য বার হুইলের টাকা আছে। কিন্তু ওটার ম্যানেজার বিল প্রায়র প্রয়োজনে নিজের ডান হাত কাটা পড়তে দেখবে, তবু আমাদের উন্নতি দেখতে চাইবে না। আর কিছু মালিক আছে, যারা এখানে থাকে না...'

'ওদের কেউ বেচবে কিনা তুমি আমাকে বলোনি কিন্তু।'

'নগদ টাকা পেলে হয়তো হুমড়ি খেয়ে পড়বে। ওরা গরুর পাল বাড়াতে আগ্রহী। কিন্তু ওদের র‍্যাঞ্চে ঘাস তো পরের কথা, আগাছা জন্মাবে না। তবু ওদের কেউ দুই-আড়াই হাজার ডলারে র‍্যাঞ্চ বেচতে চাইবে না।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল ফ্রাঙ্ক। 'কারও বাইরের অবস্থা দেখে তার সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া ঠিক নয়। আমার মনে হয়,' হাসল একটু ফ্রাঙ্ক। 'দশ হাজার ডলার পেলে ওরা বেচতে রাজি হয়ে যাবে।'

চুপ করে রইল সুজানা। ফ্রাঙ্ক ঠিক কী বলছে, বোঝার চেষ্টা করছে। ফ্রাঙ্ক তাকাল ওর দিকে। বলল, 'তুমি আমার সম্পর্কে সব কিছু জান নিশ্চয়। আমি কার্লি ফ্রাঙ্ক, ফারাও হিলসের একজন কুখ্যাত ডাকাত। তারপরও তুমি আমাকে কাজে রাখতে

চেয়েছিলে!'

চিবুকে লালের ছোপ লাগল সুজানার। তবে পর মুহূর্তে মনের ভেতর থেকে ভাবান্তরটাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিল। এক পা সামনে এগিয়ে ফ্রাঙ্কের বেল্ট থেকে অস্ত্রটা তুলে নিয়ে ওর দিকে উঁচাল। 'সম্ভবত এখনও খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি।'

# পনেরো

মেয়েটির চিবুকে হঠাৎ রঙের আভাস কিংবা তা ফের চলে যাওয়া নিয়ে মাথা ঘামাল না ফ্রাঙ্ক। ওর চোখ ততক্ষণে আটকে গেছে সুজানার বুকের বামপাশে। ওর গায়ে শুধুই শার্ট। পিস্তলের জন্যে ডান হাত উঁচানোয় বামপাশটা স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি উঁচু হয়ে উঠতে বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল ফ্রাঙ্কের। পর মুহূর্তে সচকিত হয়ে উঠল ও। মেয়েটি তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

একটুও বিব্রত না-হয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই হাত নামাল সুজানা। শার্টের বোতাম লাগাল ধীরে সুস্থে। তারপর পিস্তলটা বাড়িয়ে ধরে বলল, 'তবে আমার মনে হয় তোমার চলে যাওয়াই ভাল।'

মুখ থেকে ঘাম মুছল ফ্রাঙ্ক। হাত বাড়িয়ে পিস্তলটা নিয়ে হোলস্টারে ঢোকাল। ও যতটা ভেবেছিল, মেয়েটা তার চেয়ে অনেক বেশি ধুরন্ধর। ওর কথার জবাবে ঠিক কী বলবে, বুঝতে পারছে না।

কাছ থেকে ওর নড়াচড়া লক্ষ করছে সে। মেয়েটা যেন

হাঁটছে না, বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করল ফ্রাঙ্ক। সুজানার হাঁটা-চলা অনেক দিন আগে দেখা স্বল্পবসনা এক জিপসি মেয়ের নাচের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে ওকে। ওর ভেতরে চঞ্চলতা কেবল বেড়েই চলেছে। আচমকা মেয়েটি ওর আরও কাছে চলে এল। কমনীয় আঙুলগুলো দিয়ে ওর হাঁটু ছুঁয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে যেন বুকের ভেতরে হাতুড়ির ঘা পড়ল ওর।

কিছু না, এ স্রেফ মেয়েটির অভিনয়, ভাবতে চেষ্টা করল ফ্রাঙ্ক। ওর অজান্তেই যেন হাঁটুদুটো চেপে গেল রোয়ানের পাঁজরের সাথে। ওর হাঁটু কাঁপছে। কিন্তু সেটা বুঝতে দিতে চাইছে না মেয়েটাকে। ও এখন মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে, মেয়েটিকে সাহায্য করবে। তবে সেটা ওর নিজের হিসেব মত, মেয়েটার শর্তে নয়। আবেগকে পাত্তা না-দেয়ার জন্যেই এরকম ভাবছে সে। তবু বুকের ভেতর রক্ত ছলকে ওঠার শব্দ থামাতে পারছে না।

হাঁটুর ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিল সুজানা। বিব্রত স্বরে বলল, 'আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছ কেন?'

বিব্রত বোধ করল ফ্রাঙ্ক নিজেও। তাড়াতাড়ি বলল, 'কৌচিস কাউন্টিতে তোমাদের যে সেকশনগুলো আছে, ওগুলোর জন্যে আমাকে কত দিতে হবে বলো তো?'

ভুরু কুঁচকে তাকাল সুজানা। 'কে বলেছে যে, ওগুলো আমরা বেচতে চাইছি?'

'না, কেউ বলেনি। তবে টাকা ছাড়া তোমরা গানহ্যাণ্ড ভাড়া করবে কী করে?'

'তুমি মোটেই আমার সমস্যা নিয়ে ভাবছ না। তুমিও আর সবার মত। ওই মার্টা হারামজাদী তোমাদের আঙুলের ইশারায় নাচাচ্ছে। বাদ দাও। এখন যেটার জন্যে এসেছ, সেটা নিয়ে দূর হও তো।'

বালিশের নীচে ফ্রাঙ্কের ফেলে যাওয়া মার্টার নাম লেখা কাগজটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল।

হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল ফ্রাঙ্ক, পকেটে ঢোকাল। ওর মনে বিস্ময় ও সন্দেহ দুটোই। মেয়েটাকে কী বলবে, বুঝতে পারছে না। সে মার্টাকেই চায়, এটা ঠিক আছে–কিন্তু ওই রেঞ্জারের সঙ্গে কী কথা হয়েছিল, সেটাও ভুলতে পারেনি। গভর্নরের কাছ থেকে অব্যাহতি পত্রের বিনিময়ে মসম্যান ওকে লামট্রিলের বিরুদ্ধে কাজ করার কথা বলেছে। ব্যাপার এখন যেমন দাঁড়িয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে ফ্রাঙ্ক যেন ঘটনার পাঁকে গলা পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে। লামট্রিল এখন আর আগের মত ছিঁচকে চোর নয়, রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ওর এতটা বেড়ে গেছে যে, ওকে আইন দিয়ে আটকানো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ওর দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ গভর্নর রেঞ্জার বসকে ডেকে নিয়ে তার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নামার নির্দেশ দিয়েছে। এক বৈঠকে বলেছে, ‘ওই শয়তান ব্যাংকার আর তার চেলাচামুণ্ডাদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করে এসেছি। এ জন্যে আমাদের অনেক বিপদাপদের মোকাবেলা করতে হয়েছে। আমি ভোটারদের কাছে ওর ভয়াবহ রূপটা তুলে ধরতে চাই। ওর লোকেরা আমার পেছনে লেগেছে, চারদিকে আমার বদনাম ছড়িয়েছে। আমার কাজকর্ম নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে। ওসবে আমার কিছু আসে যায় না। কিন্তু এই টেরিটরিতে ওরা যে উৎপাত চালাচ্ছে, সেটা সহ্য করা হবে না। ওদের বিপক্ষে গেলে আমি হয়তো আগামী নির্বাচনে হেরেও যেতে পারি। কিন্তু ওকে দমন করতে পারলে তাতেও আমার কোনও আফসোস থাকবে না।’

গভর্নর আরও বলেছে, ‘তবে ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়। লামট্রিলের বেতনধারী প্রত্যেকটি লোক ওকে রক্ষা করার জন্যে জানপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করবে। কারণ ওরা জানে, লামট্রিলের

সর্বনাশ মানে তাদেরও সর্বনাশ। লামট্রিলকে জেলে যেতে হলে তাদেরও জেলে যেতে হবে।’

মসম্যান গভর্নরের কথার বরাত দিয়ে ফ্রাঙ্ককে বলেছে, ‘তুমি এটা করতে পারবে। কারণ আইনের চোখে তুমি খুনের আসামী। আইন তোমাকে গ্রেফতার করার জন্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে। লামট্রিলের দলে ভেড়ার জন্যে এটাই তোমার সবচেয়ে বড় সুবিধে। তুমি ওর সঙ্গে দেখা করো, ওর হয়ে কাজ করতে শুরু করো। তারপর ওর দুর্বলতাগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করো। ওকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যাও, যেখানে নিজের সত্যিকারের রঙ দেখাতে বাধ্য হবে ও। তোমার এই কাজের মূল্য দেবে গভর্নর। অব্যাহতি পত্রটা তুমি পেয়ে যাবে।’

মসম্যানের কাছে প্রকৃত ব্যাপারটা শোনার পর কাজটায় আগ্রহ দেখায় ফ্রাঙ্ক। সে কারণেই ও এখন *বক্সড ওয়াই*-এ। তবে কথা হলো, ও হয়তো বোকা হতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক নয়। সে গভর্নরের অব্যাহতি পত্র পেতে চায়। তবে সেটা বিশেষ কোনও একটি কারণে নয়। এর পেছনে আরও অনেক কারণ রয়েছে। সে গভর্নরকে সাহায্য করতে চায় এবং সোজা পথে চলতে চায়। কিন্তু সে জন্যে একজনের নুন খেয়ে বিশ্বাসঘাতকতা তার পোষাবে না।

মসম্যানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ও লামট্রিলের ওখানে যাচ্ছিল। উদ্দেশ্য ছিল, কাছ থেকে দেখে লোকটা সম্পর্কে একটা ধারণা নেয়া। তাতে তার কাজ শুরু করতে সুবিধা হতে পারে। কিন্তু পথে মার্টার সঙ্গে দেখা হবার পর মত পাল্টে যায় ওর।

*ডেভিল আয়রন*-এর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সুজানার লড়াকু মনোভাবের ব্যাপারটা ভাল লেগেছে ফ্রাঙ্কের। মেয়েটার বেপরোয়া মনোভাবের কারণে পুরো পরিস্থিতি ধীরে ধীরে রেঞ্জ ওঅরের দিকে এগোচ্ছে। মসম্যান অবশ্য কখনও তাতে সমর্থন দেবে না।

তরে তাতে এটা বন্ধ থাকবে বলে মনে হয় না। ফ্রাঙ্কের জন্যে এটা ঋণ শোধের একটা সুযোগ। আর এর দ্বারা লামট্রিলকেও এগিয়ে নেয়া যাবে তার গন্তব্যের দিকে। বুঝতে পারছে ও, বোকা লোকটা আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে নিজের সর্বনাশের দিকে। আসলে মানুষকে ক্ষুব্ধ ও হতাশ করে তুলে নিজের কবর খোঁড়ার কাজটা নিজ হাতেই করছে ব্যাংকার।

তবে ব্যাপারটা ঠিক কীভাবে করবে বুঝতে পারছে না। ও নিজে এখানকার কেউ নয়। লামট্রিলের সঙ্গে লাগতে হলে ওর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপার থাকতে হবে। স্বার্থ রক্ষার লড়াইয়ে একটা নৈতিক সমর্থন থাকে। কিন্তু এখানে সে-সমর্থনটা পাচ্ছে না ও নিজের কাছ থেকে।

মার্টার কথাও ভেবেছে ফ্রাঙ্ক। মেয়েটাকে নাকউঁচু ধরনের মনে হয়েছে ওর। ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হলে লামট্রিলের সঙ্গে লাগতে হবে ওকে। মেয়েটা এখন পাত্তা না-দিলেও এক সময় দিতে বাধ্য হবে। সেটা নির্ভর করছে, ফ্রাঙ্ক এখানে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে, তার ওপর।

এখানে স্বার্থ সৃষ্টি করতে হলে ফ্রাঙ্কের প্রথম প্রয়োজন হবে কিছু জমির মালিক হওয়া। সেটা অবশ্যই কিনে নিতে হবে–এবং এই মুহূর্তে জমি বিক্রি করতে চাইছে কেবল সুজানাই।

'তুমি স্রেফ একটা দাম বলো,' বলল সে। 'আর তুমি যদি রাজি হও তা হলে আমি বীয়ার ফ্ল্যাটসসহ গ্রাহাম কাউন্টির জমিগুলো কিনে নেব।'

হতভম্ব হয়ে তাকাল সুজানা ওর দিকে। 'বীয়ার ফ্ল্যাটসের সমস্ত জমি এবং লেকটাও লামট্রিল দখল করেছে জেনেও ওটা কিনতে চাও?'

'লামট্রিলকে আমি সামলাব। তুমিও তো ঠিক ওটাই চাও, তাই না?'

কোনও কথা বলছে না সুজানা। স্রেফ চেয়ে আছে ওর দিকে।

'কী হলো?' ঘোঁৎ করে উঠে বিরক্তি প্রকাশ করল ফ্রাঙ্ক। 'চুপ করে আছ কেন? তুমি তো আমার সাহায্যই চেয়েছিলে। নাকি?'

'চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন আর চাই না।'

'কেন? হঠাৎ মত পাল্টে যাবার কারণটা কী? কাল তো সাহায্যের জন্যে সব ধরনের চেষ্টাই করেছিলে।'

'না,' মাথা নাড়ল সুজানা। 'সব করিনি। তবে করতাম। কাল এমনকী সাহায্যের জন্যে তোমার সঙ্গে ঘুমোতেও রাজি ছিলাম। আর সে জন্যে যখন তোমার ঘরে গেলাম, তখন তুমি শেকল কেটে পালিয়ে গেছ। ওই কাগজটা ছাড়া আর কিছুই রেখে যাওনি। আমার হুঁশ হয়েছে তখন। ভাবলাম, কী বোকামিই না করতে যাচ্ছিলাম।'

'কিন্তু তারপরও তো চেষ্টা ছাড়নি।'

'না। কারণ আমার দরকারটা খুব বেশি...

'এবং দরকারটা এখনও আছে।'

'আছে। তবে সেটা আর তোমার কাছে নেই। তুমি অনায়াসেই মার্টা মের কাছে চলে যেতে পার। ওকে বলো গিয়ে, তোমাকে ছাড়াও আমার ঝামেলা আমি মেটাতে পারব। ওকে বলতে পার, তুমি যখন ওর বাবার হুকুম তামিল করতে আসছিলে, আমার বুড়ো বাবাও তখন তার পাল্টা ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে। বলবে, *ডেভিল আয়রন* যেখান থেকে এসেছে, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ফের সেখানে তাড়িয়ে দেব আমরা।'

আচমকা খেপে উঠল মেয়েটা। 'ঘোরো। ঘুরে দেখে নাও ওকে। তারপর যা বোঝার বুঝে নাও।'

# ষোলো

মাথা দ্রুত কাজ করতে শুরু করল ফ্রাঙ্কের। সুজানার চোখের দৃষ্টি পাল্টে যেতেই গোলমালটা টের পেল। এতক্ষণ ধরে মেয়েটার আবোলতাবোল বকাবকি শুনে বিভ্রান্ত বোধ করছিল। কারণটা আচমকা পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে। মেয়েটা জানে, লামট্রিলের মত প্রভাবশালী লোকের বিরুদ্ধে একা মেয়েমানুষ সে কিছুই করতে পারবে না। পুরুষের সাহায্য চাই-ই। ওর বাবা অবশ্য নিজের মত করে কিছু একটা ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু কী করেছে, লোকটা আসার আগে সে জানতে পারছিল না। এদিকে ফ্রাঙ্ক ফিরে এলেও মেয়েটা ওকে আর বিশ্বাস করতে পারেনি। ফ্রাঙ্কের বালিশের নীচে লামট্রিলের মেয়ের নিজের হাতে নাম লেখা কাগজটা পাওয়ার পর লামট্রিলের বিরুদ্ধে ফ্রাঙ্ককে কাজে লাগাবার যৌক্তিক কোনও কারণ খুঁজে পাওয়ার কথাও নয় তার। তবু ফ্রাঙ্ককে বিশ্বাস না-করেও ওকে ব্যবহার করার ইচ্ছে ওর ছিল। অন্তত উঠানে যে-লোকটা এসেছে, তাকে না-দেখার আগে পর্যন্ত।

পরিস্থিতি না-বোঝার মত বেকুব ফ্রাঙ্ক নয়। পুরো ব্যাপারটাকে তার কাছে একধরনের পরিহাস বলেই মনে হচ্ছে। মসম্যানের অমন পরিকল্পনাটাও মেয়েটার গরম মাথার কারণে শেষ পর্যন্ত মাঠে মারা গেল। মেয়েটি আসলে অতিরিক্ত চালু। ফ্রাঙ্ক জানে, খুব বেশি চালু হতে গেলে নানা সমস্যা হতে পারে। কোনও কাজ করতে গেলে আগে চারদিক ভেবেচিন্তে দেখতে

হয়।

রোয়ানের লাগামে টান দিতে মাত্র এক মুহূর্ত সময় নিল ফ্রাঙ্ক। এরপর একটুও তাড়াহুড়ো না-করে ঘোড়াটাকে ঘোরাল। নিজের হাতদুটোকে যথাসম্ভব সংযত রাখার চেষ্টা করছে। এমনভাবে রাখছে যেন এই মাত্র উঠানে ঢোকা আগন্তুক সেগুলো স্পষ্ট দেখতে পায়। লোকটাকে অস্ত্রধারী বলেই ভাবছে সে। অস্ত্রটা নিশ্চয় ওর দিকেই বাগিয়ে ধরা। কিন্তু লোকটাকে দেখে বুঝতে পারল, ওর অনুমানের একটাও ঠিক হয়নি। লোকটার হাতে অস্ত্রও নেই এবং সে তার অপরিচিতও নয়। তবে সবচেয়ে বেশি অবাক হলো ওর দিকে তাকিয়ে লোকটার মুখের ভাব পাল্টে যেতে দেখে।

হাত-পা অবশ হয়ে যাওয়া মানুষের মত অতি কষ্টে যেন নড়ে উঠল লোকটা। চোখদুটো গোলআলুর মত গোল হয়ে উঠল। মুখ হাঁ হয়ে গেছে। ফ্রাঙ্কের সন্দেহ হলো ওই হাঁ আর আদৌ বন্ধ হয় কিনা। 'হাউডি, ক্রাউডি,' সম্ভাষণ জানাল। ওর চোখে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের আভাস। 'ভাবিনি তোমাকে এখানে দেখতে পাব।'

শুকনো হাসি ফুটল ক্রাউডির মুখে। তবে শুকনো হাসিতেও লোকটার মনোভাব ফ্রাঙ্কের অজানা রইল না। মানুষ অনেকদিন পর পুরানো কোনও আত্মীয় কিংবা বন্ধুর দেখা পেলে সাধারণত এরকম হাসে। 'তা হলে তুমিই *বক্সড ওয়াই*-এর সেই নতুন বস যে সব কিছু ওলট পালট করে দেয়ার তালে আছ। তোমার নেতৃত্বেই *বক্সড ওয়াই* নতুন নতুন গানহ্যাণ্ড জোগাড় করছে ন্যাট লামট্রিলের মোকাবিলা করার জন্যে। বেশ। ...তবে তারা বলছে, সব কুকুরেরই নাকি নিজস্ব এলাকা থাকে। এমনকী নেড়ি কুত্তারও।'

মিষ্টি কিন্তু পিচ্ছিল হাসি হাসল ফ্রাঙ্ক। 'তোমার খোঁয়াড়ের বাকিগুলো কোথায়? বো ব্রীন, স্নেক ফ্রেন্সটন আর ওরা, যারা ইউএস ডেপুটি মার্শাল ম্যাক্সওয়েলকে গুলি করেছিল?'

'ওটা একটা ডাহা মিথ্যে কথা!' হিসহিসিয়ে উঠল ক্রাউডি। রাগে লাল হয়ে উঠেছে ওর মুখ। 'আমি ওকে খুন করিনি।'

'কিন্তু ওকে যখন খুন করা হয়, তখন ওখানে ছিলে। আইনের চোখে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্যে ওইটুকুই যথেষ্ট।'

'আমি ওকে খুন করিনি। ধ্যাত্তেরি, জাহান্নামে যাও তুমি। তুমি নিজেও জান যে, কাজটা আমি করিনি। ওরা কেবল তোমাকে দেখেছে। তোমার হাতেই অস্ত্র দেখেছে ওরা।'

'অবশ্যই। ওরা কার্লি ফ্রাঙ্ক মানে আমাকেই দেখেছে। আর ওই বেজন্মা খুনিটাই খুন করেছে সাই টার্নারকে। তোমার কী মনে হয়, ক্রাউডি? ওই ব্যাপারটা সম্পর্কে কতটা জান?'

ঢ্যাঙা টেক্সান ডাকাতের চোখে এবার ধূর্ত হাসির ভাব দেখা গেল। 'খোদার দোহাই, ফ্রাঙ্ক, তুমি বাজি ধরতে পার। আমরা এর কিছুই ভুলতে পারছি না।' দাঁত বের করল এরপর। 'যারা তাদের পার্টনারদের সাথে বেঈমানি করে, পরকালে তাদের এর ফল ভোগ করতে হয়।'

'আমিও তাই মনে করি। আশা করছি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে তার খোঁজ পেয়ে যাব। লামট্রিলের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের সাহায্য করব।'

পলকে চোখের ভাব পাল্টে গেল টেক্সানের। অবিশ্বাসের ছায়া খেলে গেল চেহারায়। মুখের রং মাছের পেটের মত সাদা। এক পা পিছিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল, 'তুমি...তুমি কী করবে বললে!'

'যা শুনেছ, ঠিকই শুনেছ, ক্রাউডি। বলেছি, ন্যাট লামট্রিলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমি তোমাদের সাহায্য করব। সেই আগের দিনগুলোয় আমরা যেভাবে একসঙ্গে কাজ করতাম সেভাবে...'

ওর কথা শেষ হওয়ার আগে বিড় বিড় করে খিস্তি আওড়াল ক্রাউডি। ঝট করে ঘাড় ফেরাল সুজানার দিকে। কর্কশ স্বরে বলল, 'আমার বস হিসেবে কি তুমি এই মার্শালের খুনিকে নিয়োগ

দিয়েছ?'

উদ্বিগ্ন চোখে দেখছিল সুজানা। দু'জনকেই। ক্রাউডির প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে দ্বিধায় ভুগছে। তারপর নিজের মনের ভেতর একটা বিষয় উপলব্ধি করে চমকে উঠল। অনিশ্চয়তা বোধ করতে লাগল ফ্রাঙ্কের ব্যাপারে, একই সাথে নিজের ব্যাপারেও। ফ্রাঙ্কের দিকে চেয়ে আবেদন ফুটল ওর চোখে। কিন্তু ফ্রাঙ্কের চোখে তার প্রত্যুত্তর না-পেয়ে আত্মসম্মানে ঘা লাগল। নির্বিকার স্বরে বলল, 'না।'

রোয়ানের লাগামে টান দিল ফ্রাঙ্ক। মৃদু হাসির রেখা ফুটল ঠোঁটে। ক্রাউডির বিজয় গর্বিত মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'ঠিক আছে। আমাকে তার দরকার নেই। কিন্তু এক সময় পছন্দ না-করলেও ও আমাকে মিত্র হিসেবে পেতে চাইবে। ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে বলছি, সে কখনও ফ্রাঙ্ক সেলজারের নাম শোনেনি।'

'চালচুলোহীন লোকের জন্যে কথাটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে...'

'বার হুইল নেহাত ফেলনা আউটফিট নয়, ক্রাউডি। তুমিও জান নিশ্চয়, তাই না?'

'এখানে বার হুইলের কথা আসছে কীভাবে?' মুখ বেঁকাল ক্রাউডি।

'এভাবে।' নিজের দিকে আঙুল নির্দেশ করল ফ্রাঙ্ক। 'আমি বার হুইলের মালিক। যাও, এবার গিয়ে কিউ ব্যাজার আর ন্যাট লামট্রিলকে খবরটা বলে এসো।'

আচমকা নীরবতা নেমে এল উঠানে। স্রেফ যেন বোবা বনে গেছে বাকি দু'জন। মৃদু হেসে পকেট থেকে মেকিংস বের করে সিগার ধরাতে শুরু করল ফ্রাঙ্ক। সিগারটা ঠোঁটে ঝুলিয়ে লেভাইসের প্যান্টে দেশলাইয়ের কাঠি ঘষে আগুন জ্বালাল। সিগারে আগুন ধরাতে ধরাতে তেরছা চোখে চাইল ক্রাউডির

দিকে। আগুন ধরতে আঙুলের টোকায় জ্বলন্ত কাঠিটা ছুঁড়ে দিল।

'মানে...' গলা মিইয়ে এল সুজানার। 'তু-তুমি বার হুইল কিনে নিয়েছ?'

'ধ্যাৎ!' খেঁকিয়ে উঠল ক্রাউডি। 'ডাহা মিথ্যে কথা! স্রেফ ধাপ্পা দিচ্ছে ও। তোমার বুড়ো বাবা যে ব্যবস্থাটা নিতে চাইছে, ওটাকে ভণ্ডুল করার জন্যে এসব আবোলতাবোল কথা বলছে...'

'বাজি ধরতে চাও, ক্রাউডি?'

'কোনও দরকার নেই। আমি জানি, তোমার দখলে র‍্যাঞ্চ দূরের কথা, একমুঠো বালিও নেই। তুমি...'

'থামো।' ধমক দিয়ে লোকটাকে চুপ করিয়ে দিল সুজানা। 'কার্লি, তুমি আমাকে সত্যি কথাটা বলো। তুমি আজ সকালে কীভাবে এখানে এলে? তুমি গতকাল কোথায় গিয়েছিলে? তুমি কি বিল প্রায়রের সঙ্গে দখা করতে গিয়েছিলে?'

ক্রাউডির ওপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরায়নি ফ্রাঙ্ক। টেক্সান ডাকাতটার চেহারায় মনের ভাব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। অবিশ্বাস, ঈর্ষা আর প্রতিহিংসা মিলে ভয়াবহ অবস্থা। 'ওকে আমি এখনও এক পয়সাও দিইনি,' লোকটার ওপর থেকে চোখ না-সরিয়ে মেয়েটার কথার জবাব দিল ও।

'হয়তো তুমি দেবেও না।' বলেই পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল ক্রাউডি। ওর হাত পিস্তলের বাঁট ছোঁয়ার আগেই হেসে উঠল ফ্রাঙ্ক। 'বেশ তো, বের করো, ক্রাউডি। তুমি শালা রক্তপিপাসু নেকড়ের চেয়ে খারাপ। ঠিক আছে, বের করো তোমার ওই লোহাটা। তারপর ফয়সালা হবে দু'জনের মধ্যে।'

জায়গায় জমে আছে যেন ক্রাউডি। জিভ দিয়ে চেটে ঠোঁটদুটো ভিজিয়ে নিচ্ছে। পিস্তলের দিকে বাড়ানো হাতটা এখনও বাঁট থেকে ইঞ্চি তিনেক দূরে। এগোচ্ছে না আর।

থুতু ফেলল ফ্রাঙ্ক, যেন নাকচ করে দিল লোকটাকে।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসল। 'তারপর যা বলছিলাম। প্রায়রের সঙ্গে কোনও কাগজপত্রে চুক্তি হয়নি আমার। তবে শীঘ্রিই আমি বার হুইলের মালিকানা নিতে যাচ্ছি।'

'তোমার কি মনে হয় না যে, প্রায়র ওটা না-ও বেচতে পারে?'

'বেচবে, বেচবে। আর তুমি যদি আমার সাথে একটা চুক্তিতে আসো, তা হলে বীয়ার ফ্ল্যাটস দখল করার ব্যাপারে আমার সাহায্য পাবে।'

'ওটা আমাদের পেটেন্ট করা সম্পত্তি নয়।'

'তোমাদের তো স্কোয়াটার্স রাইটস আছে।'

'তাতে কী হবে যদি সেটা ধরে রাখতে না-পারি। তুমি জান, লামট্রিল বেড়া দিয়ে...'

'সেটা আমি দেখব। আমি তোমার কাছে যা চাইছি, তা হলো একধরনের সুবিধে। তোমার সঙ্গে একটা চুক্তি আমাকে এখানে নাক গলানোর অধিকার দেবে।'

'সে জন্যে তোমাকে আমার ফোরম্যানের সাথে কথা বলতে হবে।'

'তুমি কি আমাকে ওই টেক্সানটার সাথে কথা বলতে বলছ?'

ফ্রাঙ্কের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে বিব্রত বোধ করল ক্রাউডি। সুজানা তা খেয়াল করল না। বলে চলল, 'মনে হয়, আমার চেয়ে ও-ই তোমাকে বেশি চেনে। ও যদি তোমাকে বিশ্বাস করতে না-পারে, তা হলে...'

ঘৃণাভরে থুতু ফেলল ফ্রাঙ্ক। 'ভর দিয়ে দাঁড়ানোর জন্য তেমন শক্ত খুঁটি তুমি জোগাড় করতে পারনি, ম্যাম।'

চোখদুটো জ্বলে উঠল সুজানার। ক্রাউডির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ইউএস মার্শাল-হত্যার সাথে কি তুমি জড়িত, ক্রাউডি?'

'মোটেই না!' চেঁচিয়ে প্রতিবাদ জানাল ক্রাউডি। 'ওই ঘটনার

পেছনে আমার কোনও ভূমিকাই ছিল না। আমি আর কয়েকজন বন্ধু যখন চলে আসছিলাম, তখন এই লোক...'

'তোমার বন্ধুরা মানে...লামট্রিলের বিরুদ্ধে যাদের নিয়ে আমাকে সাহায্য করতে চাইছ তারা?'

এক মুহূর্ত থেমে কী বলবে ভেবে নিল ক্রাউডি। তারপর মাথা ঝাঁকাল সম্মতির ভঙ্গিতে। 'ঠিক বলেছ। ওই ঘটনার সাথে আমাদের কোনও সম্পর্কই নেই। তবে কাজটা আমরা ওকেই করতে দেখেছি। ওই লোকই এল পাসো স্টেজে ডাকাতি করেছিল। আমরা দূর থেকে দেখলাম, এল পাসো স্টেজে ডাকাতি হচ্ছে আর একটু পরে মার্শালকে দেখলাম সীট থেকে গড়িয়ে পড়তে।'

'কী বলতে চাও পরিষ্কার করে বলো,' শীতল কণ্ঠে বলল ফ্রাঙ্ক।

'তুমি বলতে চাইছ, কার্লি ফ্রাঙ্কই লোকটাকে গুলি করে মেরেছে?'

'একদম ঠিক বলেছ, ম্যাম। এই লোকটাই মার্শালকে খুন করেছে। শুধু তাই নয়, লুটের মালের একটা অংশ ও প্যারাডাইসে সাই টার্নারের আস্তাবলে মাটির নীচে লুকিয়ে রেখেছিল। এখন থেকে হপ্তা দুয়েক আগে টার্নারকে মৃত পাওয়া যায় প্যারাডাইসে ওর অফিসরুমে। বুকে গুলি করে মারা হয়েছে লোকটাকে। ফুটো দেখে মনে হয়েছে সিক্সগানের গুলি। কাজটা করে তাড়াহুড়ো করে পালিয়েছে খুনি। মরার আগে টার্নার নিজের রক্ত দিয়ে মাটিতে ওর খুনির নাম লিখে যেতে পেরেছিল।'

'হাহ্!' হাসল ফ্রাঙ্ক। 'টার্নার ভাঙা কবজি দিয়েই নামটা লিখেছিল আর কী?'

বিচিত্র ভাব জাগল সুজানার মুখে। পুরোপুরি বোঝা গেল না ঠিক কী ভাবছে। তবে মুখে হতাশার ভাবটা ধরতে পারল ফ্রাঙ্ক।

ওর দিকেই চাইল এবার মেয়েটি। 'এ-কথা সত্যি?'

'সেটা তোমার ওই ফোরম্যানকে জিজ্ঞেস করলেই ভাল করবে। তার সাথে এটাও জেনে নাও যে, সে তার মনিব কিড ব্যাজারের কাছ থেকে হুকুম পেয়ে তোমাকে সাহায্য করতে এসেছে কিনা।'

'মিথ্যে কথা। ডাহা মিথ্যে কথা বলছে ও!' চেঁচিয়ে উঠল ক্রাউডি।

ঘোড়ার লাগামে টান দিল ফ্রাঙ্ক। সুজানাকে বলল, 'তুমি যদি মত পাল্টাও, তা হলে আমাকে সব কিছু জানতে দাও। লামট্রিলের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া যায় আমি দেখব। কিন্তু দয়া করে এসব চামচিকে নিয়ে আমার পেছনে লাগতে এসো না।'

লাগামে টান দিয়ে ঘোড়া ফিরিয়ে নিল ও। তারপর ওদের পেছনে রেখে চলতে শুরু করল। উঠানের ফটক পেরিয়ে রোদেপোড়া প্রান্তরের ওপর দিয়ে বার হুইলের পথে ঘোড়া ছোটাল।

ওর মনের ভেতর খুশি খুশি লাগছে এখন। ক্রাউডিকে *বক্সড ওয়াইতে* দেখার পর থেকে দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে শুরু করেছে ও। মনে হচ্ছে মসম্যানের অনুমান সত্যি হতে যাচ্ছে। মসম্যান ব্রীনকেই কিড ব্যাজার বলে মনে করে। রেঞ্জারের কথার সূত্রে জানা গেছে, ব্যাজার মাস কয়েক আগে জনতার ধাওয়া খেয়ে পালানোর আগে এই সানসেট ভ্যালিতে অনেক লুটপাট আর ধ্বংসাত্মক কাজ-কারবার চালিয়েছিল। এখন ব্রীনকে যদি ব্যাজার হিসেবে ধরে নেয়া যায়, তা হলে অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়া যায়। এমনকী প্যারাডাইসে ওর অবস্থানের কারণ কী তাও। ব্যাজার এখানে লামট্রিলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা ছাড়া দু'দিনও টিকতে পারবে না।

ওর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার পেছনে লামট্রিলের দিক থেকেও

যথেষ্ট কারণ আছে। যে যা-ই বলুক, ও এই এলাকায় যথেষ্ট মান্যগণ্য লোক। নাম খারাপ হবে, এমন কাজ সে নিজে করতে চাইবে না। *বক্সড ওয়াই* এখন তার সঙ্গে যুদ্ধ বাধানোর কথা বলছে। এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে চাইবে সেও। কিন্তু কাজটা করার জন্যে নিজে মাঠে নামবে না। ওর হয়ে অন্য লোক কাজটা করে দিক, সেটাই চাইবে। আর সে জন্যে লোক ভাড়া করবে ও। তবে স্থানীয় লোকদের ভাড়া করবে না। এমন কাউকে ভাড়া করবে যারা কাজ শেষে চলে যাবে, ওর দুষ্কর্মের সাক্ষী হয়ে কাছে পিঠে ঘুরে বেড়াবে না।

এখন প্যারাডাইসে ওর কোনও বন্ধু যদি ওকে এই খবরটা দিয়ে থাকে যে, বো ব্রীন আর তার দলের সাথে ফ্রাঙ্কের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, তা হলে সেটাকে নিজের কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে পারে লামট্রিল। ওদিকে ব্রীন ইউএস মার্শাল হত্যার অভিযোগে ওকে ফাঁসাতে না-পারলেও প্যারাডাইসে সাই টার্নারকে খুন করার দায় ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছে। ওদের এখানে এনে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে পারলে আলগোছে নিজের স্বার্থটা হাসিল হয়ে যাবে লামট্রিলের। লোকজনকে বোঝানো যাবে, পুরো ব্যাপারটা ফ্রাঙ্ক সেলজার আর তার দলের লোকদের অন্তর্কোন্দল ছাড়া আর কিছু নয়।

*বক্সড ওয়াই* লামট্রিলের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কথা যখন জোরে শোরে প্রচার করছে, ঠিক তখনই এসে হাজির হয়েছে ক্রাউডি। লোকটার এখানে আসার ব্যাপারটাকে সহজভাবে নিতে পারছে না ফ্রাঙ্ক। ওর মনে হচ্ছে ব্যাপারটা কাকতালীয় নয়, পরিকল্পিত।

তা ছাড়া ক্রাউডি একা এসেছে বলে মনে হয় না। ওর কথা থেকে বেরিয়ে এসেছে তথ্যটা। সে বলেছে, তারা *বক্সড ওয়াই*কে সাহায্য করবে। *তারা* মানে, সে আর তার বন্ধুরা। এ ছাড়া ক্রাউডি এও বলেছে, সে আর তার বন্ধুরা ফ্রাঙ্ককে স্টেজে ডাকাতি

করতে দেখেছে।

ফ্রাঙ্কের মনে হচ্ছে এসব কিছু জোড়া দিয়ে একটা পরিষ্কার ছবি পাওয়া যাচ্ছে। পুরো ছবিটায় *বক্সড ওয়াই*কে কব্জা করা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না ও। ওর মনে হচ্ছে ও যদি এতে নাক না-গলায়, তা হলে দারুণ সমস্যায় পড়ে যাবে সুজানা।

কিন্তু নাক গলাবার কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছে না ও। ওকে একটা কাজ দিয়েছে বার্ট মসম্যান। কোনওরকম ঝুঁকির মধ্যে না-গিয়ে কাজটা তাকে শেষ করতে হবে। আর তা করতে গেলে *বক্সড ওয়াই*কে নিজের সমস্যা নিজেকেই সমাধান করতে দিতে হবে। মসম্যান তার কাছে যা চায় তা হলো, লামট্রিলের বেআইনি কাজগুলোর ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়া। ও সম্ভবত কিড ব্যাজারের কাছ থেকে আগেই কিছু তথ্য জোগাড় করে রেখেছে।

মনে মনে এসব চিন্তার জাল বুনতে বুনতে ধীরে ধীরে ঘোড়া চালাচ্ছে ফ্রাঙ্ক। ওর স্বাভাবিক সতর্কতায় কিছুটা ঢিল পড়েছে। রিনকস পর্বতের আড়ালে চলে গেছে সূর্য। ছায়া ঘনিয়ে এসেছে।

সুজানা রোনাল্ডের দীর্ঘ সুগঠিত শরীর আর রুক্ষ অথচ কমনীয় চেহারা চোখে ভাসছে ওর। মেয়েটি আকর্ষণীয়। যে কোনও পুরুষই আকৃষ্ট হবে মেয়েটির প্রতি। তবে চিন্তাটা জোর করে মন থেকে সরিয়ে দিল ফ্রাঙ্ক। সে কেবল একটা মেয়ের কথাই ভাবছে। সে হলো মার্টা মে। মার্টা মেকেই কেবল চায় সে। নিজের স্ত্রী হিসেবে আর কারও কথা ভাবতে পারছে না।

মনে মনে বিরক্ত বোধ করছে ফ্রাঙ্ক। বিড় বিড় করে গালাগাল করল সুজানাকে। মেয়েটার কথা বারবার আর সব চিন্তাকে ছাপিয়ে উঠতে চাইছে কেন কে জানে?

অথচ মেয়েটা ওকে বড় নগ্নভাবেই নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইছে। চাইছে *বক্সড ওয়াই*-এর নিরাপত্তা আর লামট্রিলের লালসার মাঝখানে ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে। কোন্ ধরনের

মেয়ে হলে এমন বাজে চিন্তা করতে পারে? ফ্রাঙ্কের মনে হচ্ছে, অন্তত মার্টার মত সুন্দর ও প্রেইরির গোলাপের মত কোমল স্নিগ্ধ মেয়ের পক্ষে এধরনের জঘন্য ব্যাপার এমনকী চিন্তা করাও সম্ভব হবে না।

ওক গাছে ছাওয়া পাহাড়ের কোথাও একটা কয়োটের একটানা কান্না ফ্রাঙ্কের মনে চাঞ্চল্য জাগাল। ম্যানজানিটার ঝোপের ভেতর বাতাসের শিরশিরে আভাস।

নিজের ভবঘুরে জীবনের কথা ভাবছে ও। বিগত দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে। সামনের দিনগুলো কীরকম হবে, তার একটা সম্ভাব্য ছক আঁকতে চাইছে মনে মনে। রোয়ানের পিঠে নীরবে চলতে চলতে মনে মনে উচ্চারণ করল, 'যেখানেই যাক, একজন মানুষ তার নিজের ভাগ্যকেই সাথে নিয়ে যায়। ভাগ্যে যা হওয়ার তা হবেই।'

বাগলারের ছুটন্ত খুরের একটানা আওয়াজ শুনছে ও মন দিয়ে। জুনিপারের গাঢ় সবুজ পাতার ফাঁকে একটা রাতজাগা পাখির সাদা ডানার ঝাপটানি পলকের জন্য চোখে পড়ল ওর। ব্যাপারটার মধ্যে একটা প্রতীকী ব্যঞ্জনা খুঁজে পেল ফ্রাঙ্ক। বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছে সে। তারুণ্যের উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটেছে। থিতু হয়ে বসার কথা তখন মনে আসেনি। তবে এখন বুঝতে পারছে, স্রেফ সময় নষ্ট ছাড়া আর কোনও লাভ হয়নি তাতে। ফেলে আসা জীবনের যথেচ্ছাচার এখন ছবির মত ভাসছে যেন চোখের সামনে। এখন যেমন জীবন নিয়ে গুরুত্বের সাথে ভাবছে, তখন যদি এভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে পারত, তা হলে এখন আর জীবনটাকে মরুভূমির মত শুষ্ক আর নিষ্ফলা মনে হতো না। রাতজাগা পাখির ডানা ঝাপটানো যেন তার চোখে নিজের জীবনেরই অস্থিরতার প্রতীক হয়ে প্রতিবিম্বিত হলো। সেদিন কথা বলার সময় সুজানা ওকে জিজ্ঞেস

করেছিল, 'জীবনে কখনও এমন কোনও কাজ কি করেছ, যা নিয়ে গর্ব করতে পার?'

মনে করতে চাইল ফ্রাঙ্ক। তবে যতটুকু মনে আছে, তাতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খুঁজেও কাউকে গর্ব করে বলার মত কোনও বিষয় পেল না। এমনকী এখন যে নিজেকে বদলানোর কথা ভাবছে, সেটাও তার সঠিক পথে চলার সরল ইচ্ছে থেকে নয়; বরং এ-তাগিদ এসেছে তার অতীত দিনের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য আইনের হাতে ধরা পড়ার ভয় থেকেই। তা ছাড়া সে বুঝতে পারছে লুটেরা এবং চোরদের সামাজিক জীবন বলে কিছু নেই।

ফেলে আসা জীবনে গর্ব করার মত কিছুই করেনি সে। এই দেশে আগে থেকে যা হয়ে আসছে, তার অতীত কাজকর্ম তারই একটা অংশ মাত্র। নিজের সঙ্গে ব্যাংকার লামট্রিলের খুব একটা পার্থক্য করতে পারছে না সে এখন।

তবে সে জন্যে অপরাধ বোধ করলেও গ্লানি বোধ করছে না ফ্রাঙ্ক। অন্তর থেকে উপলব্ধি করছে, বার্ট মসম্যানের সঙ্গে তার পরিচয় হয়ে ভালই হয়েছে। ও নিজে নিজের মনোভাব যতটা বুঝতে পারছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে মসম্যান তাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে।

নিজেকে মনে মনে বিচার করতে করতে এগোচ্ছে ফ্রাঙ্ক। অস্বস্তি বোধ করছে। সিগারেট বানাবার জন্যে পকেটে হাত ঢুকিয়ে মেকিংসটা বের করতে যাচ্ছে, এমন সময় গুলির শব্দ শুনল। ওর বাহনটা চলতে চলতে টলে উঠল হঠাৎ। হোঁচট খেল রোয়ান। আর ওটার পিঠ থেকে প্রায় ওড়ার ভঙ্গিতে নীচে গিয়ে পড়ল ফ্রাঙ্ক।

# সতেরো

পাহাড়ের ঢালুতে গিয়ে পড়ল ও। যেভাবে পড়েছে, সেভাবে পড়ে রইল। একটুও নড়াচড়া করল না। চারদিক ঝোপঝাড়ে ভরা, ছায়া ছায়া অন্ধকার। অনড় পড়ে থেকে গুলিটা কোন্‌দিক থেকে এসেছে আন্দাজ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু গোধূলির ম্লান আলোয় দৃষ্টি খুব বেশি দূর যাচ্ছে না। বামদিকে নীচে পাইন গাছের ঝোপের দিকে অপলক চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তবে বিশেষ কিছু দেখতে পেল না।

ও নিজে আঘাত পায়নি। কিন্তু মনে মনে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। ওর সঙ্গে রাইফেল নেই। পিস্তল দিয়ে দূর থেকে অ্যামবুশকারীর বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে মা। কাছে একটা সিডার ঝোপ। আচমকা পড়ি কি মরি করে উঠে দৌড় লাগাল ওদিকে, ঝাঁপ দিল ঝোপের উদ্দেশে। তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দূর থেকে ভেসে আসা পায়ের শব্দ শোনার জন্যে কান খাড়া করল।

কেটে গেল বেশ খানিকক্ষণ। কোনও সাড়া-শব্দ শোনা গেল না। আর কিছু সময় পর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেল সে। দূরে সরে যাচ্ছে শব্দটা।

কাজটা কার হতে পারে, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না ফ্রাঙ্কের। অ্যামবুশকারী লোকটা হয়তো ক্রাউডি নয়তো সুজানা। তারা দু'জন ছাড়া এ-সময় ওর এই পথ ধরে যাওয়ার খবরটা আর

কারও জানার কথা নয়।

তবে কাজটা মনে হয় সুজানারও নয়। ওর হলে গুলি করার পর এর ফল কী হলো জানার জন্যে অপেক্ষা করত। নিজের চোখে দেখে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে উদ্যত অস্ত্র হাতে কাছে এগিয়ে আসত। সবচেয়ে বড় কথা হলো ফ্রাঙ্ক সেলজারকে খুন করে ওর কোনও লাভ নেই। ওর সাথে পুরানো কোনও শত্রুতাও নেই মেয়েটার। কিন্তু ক্রাউডির আছে। দল ভেঙে চলে আসায় ফ্রাঙ্ক এখন ওদের শত্রু। সুতরাং শত্রুতা করার সামান্যতম সুযোগও ছাড়বে না তারা। তা ছাড়া আরও ব্যাপার আছে। ক্রাউডি যদি কোনও মতলবে *বক্সড ওয়াই*-এ এসে থাকে, তা হলে সুজানার পেছনে কেউ এসে দাঁড়াক, তা চাইবে না। কিন্তু আজ সকালে ফ্রাঙ্ক সুজানাকে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছে। সুজানা ওর সাহায্য নিতে রাজি না-হওয়ায় শেষে তার সাথে একটা সমঝোতায় আসতে চেয়েছে। এর কোনওটাই ক্রাউডির ভাল লাগার কথা নয়। সুতরাং ফ্রাঙ্ককে মেরে ফেলতে পারলে ওরই লাভ।

আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর উঠে পড়ল ফ্রাঙ্ক। ওর ঘোড়ার পেছনের অংশে লেগেছে গুলি। আহত পাছা নিয়ে দৌড়ে পালিয়েছে জন্তুটা। অন্ধকারে ওটাকে খোঁজার ঝামেলায় গেল না ও। ও এখন যেখানে আছে, সেখান থেকে প্রায়রের র‍্যাঞ্চহাউসটা খুব বেশি দূরে নয়। ওদিকে চলতে শুরু করল।

প্রায়রের র‍্যাঞ্চ হেডকোয়ার্টারটা কাঠের তৈরি। ওপরে টিনের ছাউনি প্রতিটা ঘরের। বছর দুয়েক আগে তৈরি করা হয়েছে ঘরগুলো। মাটি থেকে বেশি উঁচু নয় ছাদ। দূর থেকে দেখলে র‍্যাঞ্চহাউসটাকে আসলে বাসস্থান বলেও মনে হয় না। গাছপালাবিহীন খোলামেলা জায়গায় ভবনগুলোকে ঘরের চেয়ে সুপরিকল্পিতভাবে তৈরি দুর্গ বললেই ভাল মানায়।

ঘরের বাইরে কাউকে দেখতে পেল না ফ্রাঙ্ক। একটা ঘোড়ার

গাড়িতে দুটো পনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢুলছে। একটা ঘরের বারান্দার সামনে বাঁধা পিঠে স্যাডল চাপানো একটা মেয়ার। ঘরটাকে প্রায়র ওর অফিস হিসেবে ব্যবহার করে।

কাউবয়রা ঘোড়ার পিঠে বসে গরু সামলায়। বাহন হিসেবে মেয়ার ব্যবহার করে, এমন কোনও কাউবয়ের কথা ফ্রাঙ্ক শোনেনি। পিঠে স্যাডল চাপানো মেয়ার দেখে বুঝতে পারল নিজের অফিসরুমে একা নয় বিল প্রায়র, অতিথি আছে। তবে সে কোনও কাউবয় নয়। হয়তো কোনও টাউনম্যান কিংবা মুদি দোকানদার এসেছে তার সাপ্লাই নিয়ে।

কিন্তু তা হলে এত চুপচাপ আর শান্ত কেন ঘরের ভেতরটা?

একটু পরেই চারদিক পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে যাবে। ঘরের ভেতরটা নিশ্চয় এতক্ষণে হয়েও গেছে। কিন্তু ফ্রাঙ্ক অবাক হয়ে লক্ষ করল এখনও কোথাও বাতি জ্বলে ওঠেনি, কোনও জানালার পর্দা ফুঁড়ে আলোর ছটা বেরিয়ে আসছে না।

মেয়ারটাকে দেখল ও ঘুরে ফিরে। কোনও ব্র্যাণ্ড বা পরিচিতিমূলক চিহ্ন দেখতে পেল না ওটার গায়ে।

এবার আস্তে করে শান্তভাবে হাত বুলাল ঘোড়াটার গায়ে।

ঘোড়াটার গা গরম। ঘামে ভেজা লোম। এই মাত্র ছুটে এসেছে উর্ধ্বশ্বাসে। কে এসেছে এটায় চড়ে? ক্রাউডি!

যে-ই হোক, লোকটা সম্ভবত কথা বলতে চাইছে না। কিংবা এত আস্তে কথা বলছে যে, বাইরে থেকে তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। মনে হয় পুরো ব্যাপারটা গোপনেই সারতে চাইছে প্রায়র এবং তার অতিথি।

ঘরের কোনার দিকে গেল ফ্রাঙ্ক। জানে, বেমক্কা কোনও শব্দ হলে প্রায়র জেনে যাবে বাইরে কেউ এসেছে। সতর্ক হয়ে যাবে। কিন্তু ফ্রাঙ্কের তর সইছে না। কার সঙ্গে সময় কাটাচ্ছে প্রায়র, তা জানার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েছে সে। সুজানার একটা কথা ওর

মনে আছে। মেয়েটা বলেছিল, বিল প্রায়রকে ওদের খুব একটা প্রয়োজন নেই। লোকটা একটা র‍্যাঞ্চের ম্যানেজার মাত্র। ফ্রাঙ্কের ভয় হচ্ছে, ধূর্ত লামট্রিল হয়তো এ-সুযোগটাকে নিজের কাজে লাগাতে চাইবে। প্রায়রের সঙ্গে যোগসাজশ করে বার হুইল দখল করে নেবে।

বারান্দার দিকে এগোল ফ্রাঙ্ক। নীচের ধাপে পা রাখতে হঠাৎ যেন অস্ফুট গোঙানির শব্দ কানে এল। খসখসে, কর্কশ। যেন গলার একদম ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা শব্দ। থমকে দাঁড়াল ফ্রাঙ্ক, একটা হার্টবিট মিস করল নিজের অজান্তে। তার পর ফের পা বাড়াল।

বারান্দায় উঠে ফের দাঁড়িয়ে পড়ল ও। ওর হাত-পা যেন ঠাণ্ডা হয়ে এল। ঘরের ভেতর প্রায়রের সঙ্গে কথা বলছে একটা মেয়ে। আধখোলা জানালা দিয়ে মেয়েটার গলা ভেসে এল, 'হা, ঈশ্বর! বিল, এসব কী?'

পরবর্তী দুই সেকেণ্ড আর কোনও আওয়াজ শোনা গেল না। এরপর বিল প্রায়র ঘোঁৎ করে উঠল। 'কিড, আরে তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ। এখানে ধারে কাছে কেউ নেই...আমার লোকদের সবাইকে পাঠিয়ে দিয়েছি...'

'কিন্তু আমি কিছু একটা শব্দ শুনেছি।'

'অবশ্যই তুমি কিছু একটার শব্দ পেয়েছ। হয়তো ওল্ড ব্লু দরজায় ঠেলা দিয়েছে ভেতরে ঢোকার জন্যে...'

'তুমি না বলেছিলে ওটা গত সপ্তাহে খুন হয়েছে?'

'ঠিক। গত সপ্তাহে শিকারে গিয়ে কুকুরটা ভালুকের আক্রমণে মারা গেছে। ইয়ে...আরে ধ্যাৎ, ব্যাপারটা আমি এখন বুঝতে পারছি। বাইরে কয়েকটা তক্তা নড়বড়ে হয়ে গেছে। হয়তো বাতাসের কারণে ওগুলো নড়ে ওঠার শব্দই তোমার কানে এসে লেগেছে।'

নারীকণ্ঠের আওয়াজটা এবার স্পষ্ট শোনা গেল, 'বিল, আমার মনে হয়, বাইরে কেউ একজন এসেছে!'

'আহ্, যীশুর দোহাই...' ঘোঁৎ করে উঠল প্রায়র। রেগে গেছে। একটু পরে হঠাৎ কাপড়ের খসখস আর কোথাও একটা দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনল ফ্রাঙ্ক। একই সাথে মেঝেয় খালি পায়ের শব্দ। আচমকা ওর সামনের দরজাটা খুলে গেল সশব্দে, বেরিয়ে এল প্রায়র। ওর পরনে একটা ঢোলা প্যান্ট, যেন কোনওরকমে জড়িয়ে নেয়া হয়েছে কোমরে। হাতে একটা সিক্সগান নিয়ে ভুরু কুঁচকে চাইল ফ্রাঙ্কের দিকে। 'তুমি? তুমি কী চাও এখানে?'

'আমি ওই চুক্তির ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।'

'তার জন্যে আর সময় পেলে না, না? এটা কি এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল যে এখন এই মাঝরাত্তিরে এসেছ মানুষকে ঘুম থেকে তুলে...'

'ধীরে, বন্ধু, ধীরে।' লোকটাকে শান্ত করার প্রয়াস পেল ফ্রাঙ্ক। 'আমার নিজের মেজাজও খারাপ হয়ে আছে। তোমার এসব বকবকানি শোনার জন্যে আমি আসিনি...'

এক মুহূর্ত চুপ করে চেয়ে রইল প্রায়র। ওর সিক্সগানটার নল নিচু হয়ে গেল। ভাব দেখে মনে হচ্ছে অনেক কষ্টে চোখ থেকে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা করছে। পিস্তলটা কোমরের কাছে চেপে ধরে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। খিস্তি আওড়াল বিড় বিড় করে। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। দাঁড়াও, আমি আলো জ্বালাচ্ছি। কিন্তু... ঘোড়ার ডিম কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না অন্ধকারে। ধ্যাৎ!'

রুমে ঢুকে অন্ধকারে আরও কিছুক্ষণ হাতড়াল বিড় বিড় করতে করতে। এরপর আলো জ্বলে উঠল।

'ঠিক আছে,' আবার ঘোঁৎ করে উঠল প্রায়র। 'তোমার যদি মনে হয়, মাঝরাতে এসে কারও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানোটা কোনও

ব্যাপারই নয়, তা হলে ভেতরে এসো।'

ঘরের ভেতর ঢুকল ফ্রাঙ্ক। খাটের ওপর অগোছাল একটা কম্বল–আর মেঝেয় একটা গ্লাভ দেখতে পেল। প্রায়রের হাতের তুলনায় অনেক ছোট গ্লাভটা। রূমের পেছন দিকের দরজার কাছে পড়ে আছে ওটা।

এক মুহূর্ত ওটার ওপর চোখ রাখল ফ্রাঙ্ক। তারপর ম্যানেজারের দিকে তাকাল। 'গ্লাভটা একটু ছোট হয়ে গেল না তোমার জন্যে?'

'ওটা যদি তোমার কাছে বিস্ময়কর কিছু মনে হয়ে থাকে তা হলে বলছি। ওটা আমার ভাইঝির গ্লাভ। আজ বিকেলে ও বেড়াতে এসেছিল এখানে। মনে হয় যাওয়ার সময় ভুলে ফেলে গেছে।'

ম্যানেজারের মেয়েমানুষে আসক্তি বা নিরাসক্তি নিয়ে কোনও আগ্রহ নেই ফ্রাঙ্কের। কিন্তু লোকটার অস্বস্তি দেখে অবাক হচ্ছে। দু'চোখে অসন্তোষ। একই সাথে অনুসন্ধানী দৃষ্টিও। লোকটার কাঁধের পেশীগুলো যেন পেঁচানো স্প্রিং। ছেড়ে দিলে লাফিয়ে উঠবে ওপরের দিকে।

'নাও, এবার কাগজগুলো বের করো,' গলায় জরুরি ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল ফ্রাঙ্ক।

'ওগুলো নিয়ে কাল কথা বললে হয় না? আমি এখন...এই এত রাতে...মানে...'

'দেখো,' ফ্রাঙ্কের গলায় স্পষ্ট বিরক্তি। 'আমি এখানে তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে আসিনি। আমি কেন এসেছি তুমি জান। সকাল বেলায় এ-ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা হয়েছে। তুমি বলেছিলে...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' ঘোঁৎ করে উঠল প্রায়র। 'তুমি কি টাকা-পয়সা নিয়ে এসেছ?'

'নগদ টাকা আনিনি। আমি তোমাকে ডগলাসের ব্যাংকের একটা ড্রাফট দেব।'

'তোমার ওসব ফালতু ড্রাফটে হবে না। হয় নগদ টাকা দেবে নয়তো নয়।'

চুপচাপ লোকটার দিকে চেয়ে রইল ফ্রাঙ্ক। প্রায়রের ডান হাতটা আধ ইঞ্চি এগোল কোমরে গোঁজা পিস্তলের দিকে। 'নগদ,' ফ্রাঙ্কের চোখে তাকিয়ে শব্দটা ফের আওড়াল। 'এক্ষুণি। টাকাটা যদি সাথে না-থাকে, তা হলে বরং এখন ফিরে যাও।'

'তুমি আমার সাথে একটা চুক্তি করেছিলে, বিল। চুক্তি অনুযায়ী আমার পকেট থেকে দুশ' ডলার বের করে দিয়েছি তোমাকে। এখন ধরো এই বাকিটা,' বলতে বলতে পকেটে হাত দিল ফ্রাঙ্ক। একটা জলপাইরঙা কাগজ বের করে এনে প্রায়রের ডেস্কের ওপর রাখল।

কাগজটা একটা চেক। চকচকে চোখ মেলে ওটা দেখল ম্যানেজার। এক মুহূর্ত বিমনা দেখাল ওকে। তারপর টেবিল থেকে তুলে নিয়ে চার টুকরো করে ফেলল ওটা। ফ্রাঙ্কের চোখে চেয়ে হাসল। মেঝেয় ফেলে দিল ছেঁড়া টুকরোগুলো।

'প্রায়র,' মৃদু স্বরে ডাকল ফ্রাঙ্ক। 'আমার মনে হয়, তুমি কানে কম শোন।'

'জাহান্নামে যাও!' খেঁকিয়ে উঠল প্রায়র। পিস্তলের বাঁটে হাত রাখল। 'তোমার ওই খচ্চরটা নিয়ে এখনই দূর হও এখান থেকে।'

'ঠিক আছে। আমি আমার দিকটা সাফ করে নিচ্ছি।' একটু থামল ফ্রাঙ্ক। তারপর ফের বলল, 'আমি জানি না তোমার ওই বন্ধ দরজার ওপাশে কে আছে? জানার আগ্রহও নেই। ওর সাথে তোমার কীসের সম্পর্ক তাও জানবার দরকার মনে করছি না। কিন্তু আমি এই র‍্যাঞ্চের জন্যে তোমাকে টাকা দিয়েছি। তাই

এখন বেচাকেনার ব্যাপারে কাগজপত্র তৈরি করতে চাই। সুতরাং নিজের ভাল চাইলে এক্ষুণি কাগজ-কলম নিয়ে ঝটপট কাজে লেগে পড়ো।'

অবজ্ঞার চোখে ওর দিকে চেয়ে আছে প্রায়র। থুতু ফেলল। 'তুমি যদি ঝামেলা চাও...' শুরু করল সে। 'তা হলে যে কোনও সময়...' আচমকা থেমে গেল। কান খাড়া করে কিছু শোনার চেষ্টা করল।

বারান্দায় বুটের শব্দ শুনল ওরা। দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে কেউ একজন। আচমকা সামনের দরজাটা খুলে গেল হাট হয়ে। রাইডিং পোশাকপরা এক মেয়ে এসে দাঁড়াল ওদের সামনে। ওর চোখে আগুনের আভাস।

কুল কুল করে ঘামছে প্রায়র। পিস্তলের বাঁট থেকে হাত সরে গেল। আধপাক ঘুরে গিয়ে টেবিলটা আঁকড়ে ধরতে গেল। ওর ঠোঁট থেকে রক্ত সরে গেছে। তবে ফ্রাঙ্কের চোখ ওকে দেখছে না। ওর চেহারায় ফুটে ওঠা বিপন্ন ভাবটা ওর অগোচরে রইল।

ওর চোখ দরজার চৌকাঠে এসে দাঁড়ানো মেয়েটার ওপর। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে। আচমকা লাল হয়ে উঠল ওর মুখ, যেন আগুন ধরে গেছে। ঝট করে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দুম দুম পা ফেলে রুমের পেছনের দরজার সামনে গেল, লাথি মেরে খুলে ফেলল ওটা। বাইরে অন্ধকারে তাকিয়ে দেখল। তারপর পেছন ফিরে নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিল মেঝেয় পড়ে থাকা গ্লাভটা। গ্র্যানিটের মত শক্ত মুখ নিয়ে ফিরে এল আগের জায়গায়।

গ্লাভটা বাড়িয়ে ধরল মেয়েটার দিকে। 'এটার জন্যেই তো ফিরে এসেছ, তাই না?'

দোরগোড়ায় দাঁড়ানো মেয়েটা মার্টা মে। ওপরের পাটির দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে মার্টা। ওর চোখে যেন আগুন জ্বলছে। প্রায়রকে চোখের আগুনেই ঝলসে দিতে চাইছে।

বৃষ্টিতে ভেজা ছাইয়ের গাদার মত চুপসে গেছে প্রায়র। রাগে কাঁপছে মার্টার শরীর।

স্টেজে দেখা মেয়েটার কথা ভাবছে ফ্রাঙ্ক। সে-মেয়ের সঙ্গে একে মেলাতে পারছে না ফ্রাঙ্ক। এ যেন সেই স্নিগ্ধ সুকোমল রুচিশীল মার্টা মে নয়।

তবু এই হলো মার্টা মে। আর এর সামনে এখন কেন্নোর মত কুঁকড়ে মুকড়ে গেছে বার হুইলের দুর্ধর্ষ ম্যানেজার বিল প্রায়র। ওর হিসহিসে কর্কশ গলা যেন চাবুকের ঘা মারছে লোকটাকে। গালির চোটে প্রায়রের ভূত ছাড়াচ্ছে মেয়েটা। 'তা হলে তুমি আমাদের র‍্যাঞ্চটা বেচে দেয়ার ফন্দি এঁটেছ, না? তুমি...তুমি বিশ্বাসঘাতক, বেঈমান...

দুই কাঁধ ঝুলে পড়েছে প্রায়রের। বিড় বিড় করে মেয়েটার অভিযোগ নাকচ করে দিতে চাইছে। একবার মার্টা আরেকবার ফ্রাঙ্কের দিকে তাকাচ্ছে সে। বলল, 'তু-তুমি নিশ্চয় শুনেছ, আমি ওর সাথে চুক্তি করতে রাজি হচ্ছি না। তুমি...'

'নিশ্চয় শুনেছি। তুমি চুক্তি করতে রাজি হচ্ছ না। কী করে হবে? আমি যে এখানে! আমাকে সাক্ষী রেখে তুমি ওর কাছ থেকে টাকা-পয়সা নেবে নাকি? তা করতে গেলে যে ফেঁসে যাবে। আমি যখন বাবাকে তোমার কীর্তির কথা জানাব...'

'নির্ঘাত তাই করবে তুমি!' খেঁকিয়ে উঠল প্রায়র। 'কিন্তু সে সুযোগ...' ঝট করে পাশে ফিরল প্রায়র। কোমর থেকে পিস্তল বের করতে গেল। বের করে মার্টার দিকে তুলতে যাচ্ছে, ঠিক এসময় সামনে এগোল ফ্রাঙ্ক। পিস্তল ধরা হাতের কবজিটা ধরে ফেলল ডান হাতে। বাম হাতের প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে টেবিলের ওপর গিয়ে পড়ল প্রায়র। হাত থেকে পিস্তল ছিটকে পড়ল। ওর শরীরের চাপে জায়গা থেকে সরে গেল হালকা কাঠের টেবিল। হুড়মুড় করে মেঝেয় পড়ল ও। পর মুহূর্তে লাফিয়ে উঠল

স্প্রিং-এর মত। একটা চেয়ার তুলে নিয়ে ধেয়ে এল ফ্রাঙ্কের দিকে।

এতটা ত্বরিত প্রতিক্রিয়া আশা করেনি ফ্রাঙ্ক ম্যানেজারের কাছ থেকে। বাউলি কেটে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল ও। পুরোপুরি সফল হলো না। শেষ পর্যন্ত মাথায় চেয়ারের পায়ার বাড়ি খাওয়ার আগে দুই হাত তুলে ধরে ফেলল ওটা। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইল। চেয়ারের পায়ার বাড়ি ওর মাথায় না-লেগে কাঁধে লাগল।

ভারী চেয়ারের আঘাত বেশ জোরাল হলো। মাথা ঝিম ঝিম করে উঠল ফ্রাঙ্কের। কাঁধ অসাড় হয়ে গেছে। ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল শরীরে। মিটিমিটি জ্বলতে থাকা বাতির আলোর চারদিকে যেন কুয়াশা ঘনাতে দেখল। বসে পড়ল ও।

চেয়ারটা ফেলে দিয়ে হাঁফাচ্ছে প্রায়র নিজেও। ফ্রাঙ্ককে বসে পড়তে দেখে উল্লাস বোধ করছে মনে মনে। দম ফিরে পাবার জন্যে একটু থামল ও। আবার ঝাঁপিয়ে পড়ার মতলব করছে। কিন্তু দ্বিতীয়বার আক্রমণ শানাবার আগেই বসা থেকে উঠে দাঁড়াল ফ্রাঙ্ক। তবে পুরো শক্তি ফিরে পায়নি। টলছে ও। এ-অবস্থায় ওর ওপর প্রায়রের ফের ঝাঁপিয়ে পড়ার মতলবটা টের পেল।

প্রায়রের চেয়ারটা মেঝেয় পড়ে আছে এখন। একটা পায়া মনে হয় ভেঙে গেছে। তবু এটা এখনও চমৎকার একটা অস্ত্র।

প্রায়রের জোরে জোরে শ্বাস টানার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সে। টলতে টলতে নড়বড়ে টেবিলটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ফ্রাঙ্ক। ও জানে শীঘ্রিই কিছু একটা উপায় করতে হবে। গোঁয়ার গোবিন্দ লোকটাকে শায়েস্তা করতে না-পারলে এমনিতে সে থামবে না।

হ্যাঁচকা টানে নড়বড়ে টেবিলের একটা পায়া ছুটিয়ে নিল ফ্রাঙ্ক। লক্ষ করল প্রায়র ফের তুলে নিয়েছে ভাঙা চেয়ারটা। ভাঙা পায়া হাতে প্রায়রের দিকে এগোল সে। প্রায়রও ধেয়ে এল চেয়ার নিয়ে। লোকটার কাছাকাছি হতেই আচমকা নিচু হয়ে গেল ফ্রাঙ্ক।

সে-অবস্থায় পায়া দিয়ে আঘাত করল প্রায়রের হাঁটুতে।

চেয়ার উঁচিয়ে প্রতিপক্ষের আঘাত ঠেকিয়ে তারপর ওটা ওর মাথায় ছুঁড়ে দেয়ার মতলব ছিল প্রায়রের। ফ্রাঙ্ক যে ওর পায়ে মারবে, ওটা তার মাথায় আসেনি।

হাড় ভাঙার শব্দটা বুঝতে পারল ফ্রাঙ্ক। প্রাণঘাতী এক চিৎকার বেরিয়ে এল প্রায়রের গলা চিরে।

'এ-রকমই তো তুমি চেয়েছিলে, না।' ওর শরীরের ওপর ঝুঁকল ফ্রাঙ্ক। 'যেরকম চেয়েছিলে, ঠিক সেরকমই পেয়েছ।'

হাড় ভেঙে অকেজো হয়ে গেছে পা, অতি কষ্টে উপুড় হয়ে এবার কনুইয়ে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করল প্রায়র। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল ফের। ওর অবস্থা বুঝতে পারছে ফ্রাঙ্ক। মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে লোকটা।

একটু আনমনা হয়ে পড়ল ও। লোকটাকে ধরে উঠে বসতে সাহায্য করবে কিনা ভাবছে। আস্তে আস্তে অতি কষ্টে উপুড় হওয়া থেকে চিৎ হলো প্রায়র। তারপর ওর ওপর ঝুঁকে থাকা ফ্রাঙ্ক কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভাল পা-টা দিয়ে লাথি হাঁকাল।

পেটে প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে ককিয়ে উঠল ফ্রাঙ্ক। ব্যাপারটা এতই আচমকা হলো যে, টাল সামলাতে পারল না। পিছিয়ে গেল। বাম কাঁধ দিয়ে পড়ল দেয়ালের ওপর। ছিটকে গেল সেখান থেকে। দড়াম করে পড়ল মেঝের ওপর। এক রাশ ধুলো উড়ল।

মাথা ঝাঁকাল ফ্রাঙ্ক। চোখের সামনে ধুলোর পর্দা। সামনেটা দেখতে পাচ্ছে না। বুঝতে পারছে না প্রায়র কোথায়। কানের ভেতর বোঁ বোঁ গুঞ্জন। তবে এর ভেতরও একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে। মেঝেয় পা ঘষটানোর শব্দ। ধুলো একটু কমতে দেখতে পেল লোকটাকে। হাঁটু আর কনুইয়ে ভর দিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোচ্ছে। যে-টেবিলের পায়া দিয়ে ওর পা ভেঙে দিয়েছে

ফ্রাঙ্ক, সেটাই হাতানোর চেষ্টা করছে।

ঘরটার মেঝেয় চোখ বুলাচ্ছে ফ্রাঙ্ক। প্রায়রের কাছ থেকে ফুট ছয়েক দূরে ওর পিস্তলটা দেখল। একই সঙ্গে ওটা চোখে পড়ল প্রায়রেরও। ওর ম্লান চোখদুটো আচমকা প্রতিহিংস। আর প্রত্যাশায় চক চক করতে শুরু করেছে।

পিস্তলের উদ্দেশে গড়ান দিতে চাইল ফ্রাঙ্ক। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে টের পেল ওর দু'পায়ের স্পার জড়িয়ে গেছে এ কটা আরেকটার সাথে। নিজের সমস্যাটা বুঝতে পারছে ফ্রাঙ্ক। জড়িয়ে যাওয়া স্পারদুটো ছাড়াতে না-পারলে গড়ান দেয়া সম্ভব হবে না। পিস্তলের নাগাল পেতে হলে কম পক্ষে তিনবার গড়ান দিতে হবে ওকে। কিন্তু বারবার পা ঝাড়া দিয়েও স্পারের জটিলতা থেকে মুক্ত হতে পারছে না ফ্রাঙ্ক। ওদিকে প্রায়র দাঁতে দাঁত চেপে ইঞ্চিও ইঞ্চি করে পৌঁছে যাচ্ছে পিস্তলের বাঁটের কাছে। ওর হাতে পিস্তলের বাঁট ছুঁই ছুঁই করছে এমন সময় স্পারের সমস্যা থেকে মুক্তি পেল ফ্রাঙ্ক।

শোয়া থেকেই বেড়ালের মত লাফ দিল সেও পিস্তলের দিকে। প্রায়রের মুখের কাছে গিয়ে পড়ল। একই সঙ্গে স্পারঅলা বুটের তলা দিয়ে আঘাত করল লোকটার মুখে।

কেঁপে উঠল প্রায়রের শরীর। মাথা ঝাড়া দিল ও, একই সঙ্গে ফের বেরিয়ে এল গলা থেকে কানফাটানো চিৎকার। হাত থেকে পিস্তল পড়ে গেল। মাথা ঠুকে গেল মেঝেয়। জ্ঞান হারাল।

ওর রক্তমাখা মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ফ্রাঙ্ক।

হঠাৎ মেয়েটির কথা খেয়াল হতেই চোখ ফেরাল। সারা ঘরে চোখ বুলাল। দেখতে পেল না মেয়েটিকে। ঘরের খোলা দরজা দেখে যা বোঝার বুঝে ফেলল। চলে গেছে মেয়েটা। তবু বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ঘোড়াটা যেখানে বাঁধা ছিল, সেদিকে তাকাল। জায়গাটা খালি। চলে গেছে মার্টা মে।

ফের ঘরে ঢুকল ফ্রাঙ্ক। প্রায়রের ডেস্কের ড্রয়ার খুলে তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কিন্তু বার হুইল বিক্রি করার জন্যে তৈরি করা কোনও কাগজ পাওয়া গেল না। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর প্রায়রের কাছে গিয়ে ওর প্যান্টের পকেটগুলো হাতড়ে দেখল। কিছু নেই। খালি।

বিড় বিড় করে গাল বকল ফ্রাঙ্ক মেয়েটার উদ্দেশে। তারপর ফিরে এসে বসে পড়ল মেঝেয়।

মার্টা মে এমন কাজ করতে পারে, বিশ্বাস হতে চাইছে না ওর। স্টেজে দেখা সে-সুন্দর কোমল ও অভিজাত চেহারার মেয়েটা এত নীচ! ওর নীচতা যেন হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে ফ্রাঙ্ক। নিজেকে প্রতারিত মনে হচ্ছে। যে-মেয়ের জন্যে এতদূর আসা, হা ঈশ্বর, সে-মেয়ে এরকম ভ্রষ্ট চরিত্রের! ওর ইচ্ছে করছে এক্ষুণি ঘোড়ার পিঠে চড়ে সীমান্তের পথ ধরতে।

তবে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবল ফ্রাঙ্ক। মনে হচ্ছে না এটা ঠিক হবে। তা ছাড়া সে বার্ট মসম্যানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। সুতরাং কাজ শেষ না-করে চলে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। হতাশায় মাথা ঝাঁকাল সে। নিজেকে ফাঁদে পড়া পশু মনে হচ্ছে এখন।

পা থেকে বুটজোড়া খুলে ফের পরে নিল ফ্রাঙ্ক। ঘর থেকে বেরিয়ে করালের দিকে চলল। করালে দুটো ঘোড়া বাঁধা। সীমান্তের দিকে ঘোড়া ছোটাবে কিনা ভাবল ফের। আচমকা সুজানার কথা মনে পড়ল। বিরক্তির সাথে উপলব্ধি করল, সুজানার কাছে ওর ঋণ শোধ করা হবে না তা হলে।

'এরই নাম মেয়েলোক!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর ঘোঁৎ করে অসন্তোষ প্রকাশ করে বেরিয়ে এল করাল থেকে।

# আঠারো

দিনের আলো ফোটার এক ঘণ্টা পরে এল প্রায়রের ক্রুরা। উইনচেস্টারটা হাতে নিয়ে ফ্রাঙ্ক বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

ওরা দেখল ওকে। প্রথমে চাঞ্চল্য দেখা গেল লোকগুলোর মধ্যে। এরপর স্থির হয়ে দাঁড়াতে ফ্রাঙ্ক ওদের বার হুইলের মালিকানা বদলের কথা জানাল।

'বিল প্রায়র কোথায়?' জানতে চাইল ওদের একজন।

'ভেতরে আছে। অসুস্থ। পোর্চের খুঁটির সাথে ধাক্কা খেয়ে পা ভেঙে ফেলেছে। মনে হয় না এখন তোমাদের সাথে দেখা করতে আসতে পারবে।'

'আমরা দেখতে গেলে আপত্তি আছে?'

'নেই। তবে কেন খামাকা দেখতে যেতে চাইছ বুঝতে পারছি না।'

বয়স্ক ক্রুদের কয়েকজনকে সন্দিগ্ধ দেখাচ্ছে। মালিকানা পাল্টানোর কথাটা ঠিকমত হজম করতে পারছে না মনে হয়। ভালুকের মত কাঁধঅলা বলিষ্ঠ গড়নের বয়স্ক একজন প্রশ্ন করল, 'তোমার হাতে রাইফেল কেন?'

'এটাকে সতর্কতার অংশ বলতে পার,' ফ্রাঙ্ক বলল। 'আমরা এখানে ডেভিল আয়রনের শুভাগমনের আশঙ্কা করছি কিনা...'

চকিতে একে অন্যের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল লোকগুলো। দাঁতের ফাঁকে চিকন হাসি হাসল ফ্রাঙ্ক। 'মনে হয়, চুলোয়

চড়ানোর আগেই কী রান্না হচ্ছে লামট্রিল তা টের পেয়ে যায়। আর গন্ধ পেলে ও বাতাসের আগে আগে ছোটে। ও আমাকে এখানে পাঠিয়েছিল ওর স্বার্থটা দেখার জন্যে। তাই দেখতে এসেছিলাম এখানকার কী অবস্থা। এ-লোক ওর ক্ষতি করছিল। তাই ওকে সরিয়ে দিয়ে এর নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নেয়ার কাজে সাহায্য করতে এসেছিলাম আমি। কিন্তু ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি প্রায়রের। রাজি হচ্ছিল না। ঝামেলা এড়াতে তাই এটা বের করতে হয়েছে।'

ক্রুদের কয়েকজন স্যাডলের ওপর নড়েচড়ে বসল। আগুনে পুড়ে বাদামী হয়ে যাওয়া চেহারার লোকটা বলল, 'ও এখন কোথায়?'

'গেছে হয়তো কোথাও।' কাঁধ ঝাঁকাল ফ্রাঙ্ক। 'হতে পারে নতুন করে আতশবাজির ব্যবস্থা করার জন্যে।'

তরুণ রাইডার দাঁতের ফাঁক দিয়ে ফিক করে থুতু ফেলল। তারপর লাল চোখ মেলে চাইল ফ্রাঙ্কের দিকে। 'আমরা ডেভিল আয়রনের সঙ্গে কোনও ঝগড়াঝাঁটিতে যাব না।'

'খুব ভাল কথা,' মাথা দুলিয়ে ওর কথায় সায় দিল ফ্রাঙ্ক। 'আমরাও কারও সাথে শক্রতা চাই না। তবে প্রায়রের স্বাক্ষর দেখার পরও তোমাদের কারও যদি কিছু বলার থাকে, তা হলে বলতে পার...'

'আর কার কী বলার থাকবে?' বাদামী চামড়ার লোকটা জানতে চাইল।

অন্যদের দিকে চাইল ফ্রাঙ্ক। ওর ঠোঁট বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে আছে। অন্যরা চেয়ে আছে বুড়োর দিকে, এমন ভঙ্গিতে যেন বুড়োর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

'বেশ। না-থাকলে এখন প্রায়রকে শহরে নিয়ে যাও। ওর ডাক্তারের দরকার হবে। তোমাদের মধ্যে যে কোনও একজন

নিয়ে যাও। বাকিরা যেখানে যেতে চাও, যেতে পার। তোমার নামটা যেন কী বলেছিলে?' বুড়োর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল।

'ব্ল্যাক।'

'হ্যাঁ, ব্ল্যাক। এবার আমরা এ-প্রসঙ্গটা বাদ দিতে পারি। কী বলো?'

প্রায়রকে নিয়ে একজন শহরের পথে রওনা হলো। বাকিরা তাদের ওয়ারব্যাগ গুছিয়ে রাস্তায় নামল। ওদের দিকে একটা হাত নাড়ল ব্ল্যাক। তারপর ফ্রাঙ্কের দিকে চেয়ে হাসল। 'মনে হচ্ছে পিকনিক পার্টি, কী বলো?'

হাসল না ফ্রাঙ্ক। তাকিয়ে রইল বুড়োর দিকে। বয়স হয়েছে লোকটার। পঞ্চাশের কম নয়। চেহারায় সাধারণত তেমন কিছু প্রকাশ করে না। তবে একটু খেয়াল করলে ভেতরের কঠিন রূপটা টের পাওয়া যায়। মুখে একটা নির্লিপ্ত ভাব। তবে সেটা যে কোনও পোকার খেলোয়াড়ের ছদ্ম গাম্ভীর্য নয়, ফ্রাঙ্কের অভিজ্ঞ চোখে তা ঠিকই ধরা পড়ল।

লোকটা এক সময় কঠিন পাত্রই ছিল। তবে অতীতের কিছু দুঃখজনক ঘটনা ওকে ক্লান্ত ও হতাশ করে ফেলেছে। সেসব অভিজ্ঞতা এখনও সম্ভবত ওর মনের ভেতর কাঁটার মত বিঁধে আছে। ওর মুখের প্রতিটি ভাঁজে সে-তিক্ত অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর; এক সময়ের শয়তানিভরা চোখের কোণে ক্লান্তির ছাপ। ওর একটা পা কাঠের। অতীতের কোনও দুঃখজনক ঘটনার আজীবন স্মারক।

'তুমি যাচ্ছ না যে?' জানতে চাইল ফ্রাঙ্ক।

'আমার ব্যাপারে তোমার চিন্তা না-করলেও চলবে, মিস্টার,' ফ্রাঙ্ককে পরামর্শ দিল বুড়ো। র‍্যাঞ্চ ইয়ার্ডের বাইরে দূরের পাহাড়গুলোর দিকে হাত উঁচাল। 'এসব পাহাড়ের আনাচে কানাচে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়িয়েছি। এর প্রতিটা ইঞ্চি চিনি আমি।

তুমি যদি *ডেভিল আয়রন* দখল করতে চাও...'

'তোমার হঠাৎ এ-ধারণা হলো কেন?'

পিচ্ছিল হাসি হাসল ঘাগু বুড়ো। 'তুমি চাও আর না-চাও, ওরা এসে তোমার ঘাড়ের ওপর নেকড়ের মত হামলে পড়বে। বিল প্রায়রকে তারা নিজেদের ইচ্ছেমত চালিয়েছে। কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি ঠিক প্রায়রের মত নও। তোমার কাছে মনে হয়, জারিজুরি চলবে না। এখানে একটা কথা তোমার মনে রাখা দরকার, মিস্টার। যে ন্যাট লামট্রিলের কথামত চলবে না, তাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। সেটা তার নিজের ইচ্ছেয় হোক আর লামট্রিলের পীড়াপীড়িতে হোক।'

'তুমি বোধ হয় অনেক কিছু জান ওর ব্যাপারে?'

'ওর এবং ওর সব কাজকর্ম সম্পর্কে,' মাথা দুলিয়ে সায় দিল ব্ল্যাক। নিজের কাঠের পায়ের ওপর সজোরে থাপ্পড় বসাল। 'আমাকে এটা দিয়েছে ওই *ডেভিল আয়রনই*। আর এটা যখন বলেছি, তোমাকে আমি আরও কিছু কথা বলব। ডেভিল আয়রনের টার্গেট এখন তোমার নিকটতম প্রতিবেশী র‍্যাঞ্চটা। তুমি নিশ্চয় এটাকে খবর হিসেবে খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছ না। তবে এখানে যখন আধমরা অবস্থায় এসে হাজির হয়েছিলে, তখন তো ওরাই তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিল। তাই না?'

'তুমি দেখছি অনেক কিছুই জান!' বিস্ময় প্রকাশ করল ফ্রাঙ্ক।

ঘোলাটে কাচের মত বুড়োর চোখে কোনও ভাব ফুটল না। 'আমাকে জানতে হয়। হপ্তা দুয়েক আগে তুমি যখন ওই র‍্যাঞ্চে এসেছিলে, আমি তখন তার কাছে পিঠে ছিলাম। আমি তোমাকে দেখেছি।'

ফ্রাঙ্কের চোখে নিখাদ বিস্ময় দেখে হাসল বুড়ো। 'তোমাকে আর মসম্যানকে পেছনের রুমে বসে কথা বলতে দেখেছি।

অনেকক্ষণ কথা বলেছ তোমরা। মসম্যান কোন্ বিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারে, আন্দাজ করে নিয়েছি। তারপর তুমি ওখান থেকে বেরোতে ট্রেইল করে এসেছি।' আবার হাসল ব্ল্যাক। 'এখনও বুঝতে পারছ না, না? মসম্যান রেঞ্জার মানুষ। তোমাকে শিকার করাই হবে ওর কাজ। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তা যখন হলো না, তখন এই অঞ্চল সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানে, এমন কারও পক্ষে এর কারণটা কল্পনা করে নেয়া কি খুব কঠিন কিছু?'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি বোধ হয় ভাইপার নিয়ে খেলছি!'

'সেটা চাইলে এ-অঞ্চলে অঢেল পাবে,' অম্লান বদনে স্বীকার গেল বুড়ো। 'তবে নির্ভর করছে তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছ তার ওপর। ধরো, তুমি যদি রোনাল্ডদের সাহায্য করার কথা ভেবে থাক, তা হলে আমাকে সাথে পাবে। আর যদি তাদের ক্ষতির কথা চিন্তা করো...যীশুর কসম, তা হলে তোমাকে আমি পরামর্শ দেব সারাক্ষণ পিস্তল হাতে রাখার জন্যে।'

প্রতিটি শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করল ব্ল্যাক। একদম মন থেকেই। ওর হাত পিস্তলের বাঁটের কাছে।

'প্রথমটাই ভাবছি আমি,' বলেই লোকটার দিকে হাত বাড়াল ফ্রাঙ্ক।

ব্ল্যাক ওর বাড়ানো হাত স্পর্শ করল না। 'মুখে বলার চেয়ে করে দেখানোটাই ভাল।'

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল ওরা। দু'জনে যেন পুরো ব্যাপারটা আরেকবার ভেবে নিচ্ছে। তারপর মাথা ঝাঁকাল ফ্রাঙ্ক বুড়োর কথা সমর্থনের ভঙ্গিতে। 'আমি নিজেও তা-ই মনে করি। তা ঠিক কোত্থেকে শুরু করলে ভাল হবে বলে মনে করছ?'

'তুমি কীভাবে শুরু করবে, সেটা ঠিক করা আমার কাজ নয়।

তবে একটা কথা বলছি। প্রায়র কী করেছে লামট্রিল যখন শুনতে পাবে ওর চোখের ঘুম হারাম হয়ে যাবে।'

'আমরা ওর চোখের ঘুম হারাম হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা চিরস্থায়ী করে দিতে পারব।'

'ওর কিছু বিল্ডিং-এ আগুন ধরিয়ে দেবে, তাই তো? দু'একটা কাঁটাতারের বেড়া কেটে দেবে, তাই না? তুমি কি মনে মনে এসবই ভাবছ, মিস্টার?'

'কেন, এসবে কাজ হবে না ভাবছ নাকি?'

'না।' মাথা নাড়ল ব্ল্যাক। 'তবে কাজটা যদি করতে পার।'

'আমি বীয়ার ফ্ল্যাটসে যাবার কথা ভাবছি।'

ব্ল্যাক মাথা দোলাল। 'আমিও যাব তোমার সাথে।'

'আমার কোনও সাহায্যের দরকার হবে না। আমাকে বলা হয়েছে এখান থেকে কৌচিসের মাঝামাঝি কোথাও ডেভিল আয়রনের একটা ক্যাম্প আছে। যে জায়গা ও দখল করে নিয়েছে, ওই জায়গা থেকে আমি যদি ওর লোকদের ভাগিয়ে দিতে পারি, সেটা ওকে আরও বেশি উত্তেজিত করে তুলবে। তুমি...'

'তুমি কি কখনও ডেমন আর পিথিয়াস নামে দু'জন লোকের কথা শুনেছ?'

'এর সাথে গ্রীক মাইথোলজির কী সম্পর্ক!' অবাক হলো ফ্রাঙ্ক।

'ওই দুটো লোক হলো বেকন আর ডিমের মত।' হাসল ব্ল্যাক। 'এদের তুমি সব সময় একসাথে দেখতে পাবে। কী বলেছি বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়?'

ভুরু কুঁচকে বুড়োর দিকে চাইল ফ্রাঙ্ক। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে। এখন যাও, আমার জন্যে একটা ঘোড়া নিয়ে এসো।'

'স্বীকার করতে খারাপ লাগছে,' আবার হাসল ব্ল্যাক। 'কিন্তু ঘোড়ার গলায় দড়ি পরানোর কাজটা আমার কখনও ভালভাবে শেখা হয়ে ওঠেনি। তবে তোমার কাছ থেকে দেখে এখন হয়তো শিখেও ফেলতে পারি।'

পাহাড়ের মধ্য দিয়ে খালি পেটে দীর্ঘ সময় ধরে ঘোড়া চালিয়ে এক জায়গায় এসে থামল দুই রাইডার। নিজের ঘোড়া থেকে নেমে ওটাকে একটা গাছের সাথে বেঁধে চট করে পাশের ওক বনে ঢুকে গেল ব্ল্যাক। কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেল না ফ্রাঙ্ক। অগত্যা চুপ করে দাঁড়িয়ে ওর ফেরার অপেক্ষায় রইল। ওর পেটের ভেতর গুড়ুম গুড়ুম শব্দ, খিদে জানান দিচ্ছে প্রবলভাবে। রাতে প্রায়রের সাথে মারপিটের ধকল এখনও কাটেনি, তার ওপর সকালে ব্রেকফাস্ট না-হওয়ায় শারীরিক দুর্বলতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

ফিরতে খুব বেশি দেরি করল না ব্ল্যাক। ওকের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল একটু পরেই।

'এটাই কি সে-জায়গা?' জানতে চাইল ফ্রাঙ্ক।

'দেখি,' অস্পষ্ট স্বরে বলল বুড়ো, তারপর ঘোড়ার পিঠে চাপল। দু'জনে সামনে এগোল। মিনিট পনেরো পরে জঙ্গল যেখানে হালকা হয়ে এসেছে, সেখানে গিয়ে থামল।

তারা যেখানে দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে নীচে একটা ছোট হ্রদের মত। তার এক পাড়ে বিরাট এক কটনউড গাছ বিশাল জায়গা জুড়ে ছায়া মেলে দাঁড়িয়ে আছে। ঝিরি ঝিরি বাতাস কটনউডের পাতায় পরশ বুলাচ্ছে। শীতল জায়গাটায় ফ্রাঙ্কের শরীরের ক্লান্তি যেন অর্ধেক দূর হয়ে গেল।

এই জায়গাটা ছিল আগে *বক্সড ওয়াই*-এর সাবেক লাইন ক্যাম্প। একটা করাল, আরেকটা কেবিন পড়ে আছে পরিত্যক্ত

অবস্থায়।

লেকের পশ্চিম আর উত্তর-পশ্চিম কোনায় কাঁটাতারের বেড়া। একটা মালভরা ওয়্যাগন দাঁড়িয়ে আছে। পাশে কিছু খুঁটি আর কাঁটাতার। সূর্য উঠেছে আরও ঘণ্টা দুয়েক আগে। পরিত্যক্ত কেবিনের চিমনি দিয়ে বেরোতে থাকা কালো সরু ধোঁয়ার রেখা চোখে পড়ল ওদের। কিছু লোককে দেখল ঘোড়ার পিঠে তাদের মালপত্র তুলছে।

‘কম পক্ষে দুই শ’ গজ হবে এখান থেকে,’ ব্ল্যাক হিসেব করল। ‘যে কেউই চাইলে পেছনে একটা উইনচেস্টার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।’

‘ওদের সাথে কথা বলব আমি,’ ফ্রাঙ্ক বলল। ‘ওরা এখানে কেন জানতে চাইব। এটা ওদের জায়গা নয়।’

‘আমি যাব না। আমি এখান থেকে নজর রাখব ওদের ওপর।’

‘বেশ তো। তুমি যদি ভয় পেয়ে থাক...

‘কীভাবে বুঝলে যে ভয় পেয়েছি?’

ভুরু কুঁচকে বুড়োর দিকে চাইল ফ্রাঙ্ক। ‘পাওনি? তা বেশ। আমিও জানি, তুমি ভয় পাওয়ার ছেলেই নও। তা তুমি এখানে থাকতে চাইলে থাক। আমাকে কাভার দিতে পারবে।’

‘আমিও তা-ই ভাবছিলাম।’

আচমকা দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ফ্রাঙ্কের। ‘এর মানে কী?’

‘কীসের মানে জানতে চাইছ?’

‘আমার বেতনভোগী হয়ে আমার সাথে এভাবে কথা বলছ? তুমি আসলে কার পক্ষে বলো তো?’

‘আমি সুজানা রোনাল্ডের পক্ষে। তুমি নিশ্চয় আমার আগের কথাগুলো ভুলে যাওনি?’

কোনও কথা না-বলে ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে সামনে

এগোল ফ্রাঙ্ক। ওর পেছনে ঘোড়া ছোটাল ব্ল্যাকও। দু'জনে একসাথে সামনের ঘেসো ঢালটুকু পেরোল। আরও কিছুদূর গিয়ে একটা ছড়ানো ছিটানো পাথরে ভরা সমতল ভূমিতে গিয়ে থামল।

সামনের পথটা আবার উতরাই। ক্ষুধায় ক্লান্ত আর অবসন্ন শরীরে ফের সামনে বাড়ল ফ্রাঙ্ক। ওর ঘোড়াটা প্রথমে একটু দোনোমনো করল উতরাই বেয়ে উঠতে। ফ্রাঙ্ক মৃদুস্বরে কথা বলতেই লক্ষ্মীছেলের মত হাঁটতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর সমতলে উঠে গেল তারা। এটাই সে পুরানো ক্যাম্পসাইট।

ঘোড়ার খুরের শব্দ আর মানুষের মৃদু আলাপ শুনে কেবিনের ভেতর থেকে একজনকে মাথা বের করে উঁকি দিতে দেখা গেল। ফ্রাঙ্কের দিকে চাইল লোকটা শান্ত কৌতূহলী চোখে। তারপর মাথা ঢুকিয়ে ফেলল কেবিনের ভেতর। করালের ভেতর থেকে কারও সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। এমনকী কে এসেছে তা জানার কৌতূহলটুকু দেখাল না ভেতরের লোকগুলো। এর কারণ হতে পারে, লোকগুলো হয়তো মনে করেছে আগন্তুক দু'জন তাদের মতই এখানে কাজ করতে এসেছে। আর নয়তো তারা এখানে এতই নিরাপদ বোধ করছে যে, ওখানে কে এল আর কে গেল তা নিয়ে মাথা ঘামানোর গরজ আছে বলেই মনে করছে না। তবে একটু নিবিড়ভাবে লক্ষ করতেই বোঝা গেল, ততটা উদাসীন ওরা নয়।

বারতিনেক ডাকাডাকির পর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রাঁধুনী, দোরগোড়ায় এসে বিরক্তমুখে কী চায় জানতে চাইল।

'করালের কাছে এসো,' ডাকল ফ্রাঙ্ক। 'তাড়াতাড়ি। তোমাদের জন্যে একটা খবর আছে। হেডকোয়ার্টার থেকে। তোমাদের সবারই শোনা উচিত।'

নোংরা হাতদুটো আরও নোংরা অ্যাপ্রনে মুছতে মুছতে বিড় বিড় করে কিছু বলল রাঁধুনী। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে

লোকগুলোর সন্দেহ জাগতে পারে ভেবে সিগারেট রোল করতে শুরু করল ফ্রাঙ্ক। তারপর ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল বাকি লোকগুলোর দিকে।

পাঁচজন লোক স্যাডলে বসে আছে। চুপচাপ দেখছে ফ্রাঙ্ককে। হাবভাবে মনে হচ্ছে কারও হাতে কোনও কাজ নেই। কিংবা থাকলেও সেটা করার জন্যে পুরো দিন পড়ে আছে সামনে। ওদের একজন ছাড়া বাকিদের দেখেই বোঝা যাচ্ছে পঁয়ত্রিশ ডলার মাস মাইনের কাউবয় মাত্র। যে ব্যতিক্রম, তাকে বস বলেই মনে হলো। কাপড়ে চোপড়ে তেমন কোনও পার্থক্য নেই সঙ্গীদের সাথে, তবু ওর হাবভাবে কর্তৃত্বের আঁচ পেল ফ্রাঙ্ক। লম্বা লোকটা, ঢ্যাঙা। রোগা, হাড় জিরজিরে। বাঁ হাতে ড্র-এর উপযোগী করে হোলস্টারটি উরুর সাথে নিচু করে বাঁধা। ফ্রাঙ্কের দিকে আড়চোখে চাইল লোকটা, তারপর ঘোড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

রাঁধুনী এখনও ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে। সিগারেটে একটা লম্বা টান দিল ফ্রাঙ্ক। একটানে ওটার গোড়ায় গিয়ে পৌঁছল আগুন। টোকা দিয়ে ফেলে দিল ফ্রাঙ্ক গোড়াটা। চাকার মত অর্ধবৃত্ত তৈরি করে নেতা গোছের লোকটার পাশে ধুলোতে গিয়ে পড়ল ওটা।

দু'চোখ ছুরির মত ধারাল হয়ে উঠল লোকটার। সরাসরি চাইল এবার ফ্রাঙ্কের দিকে।

'আ-মা-র ম-নে হ-য়,' ইচ্ছে করে টেনে টেনে বলল ফ্রাঙ্ক। 'তোমার চেহারায় কিছুটা মিশেল রয়েছে।'

'তো?' শুরু করল লোকটা। 'তো-তোমার হঠাৎ এরকম মনে হচ্ছে কেন?'

'আমার কাছে তোমাকে রোনাল্ডদের কাউহ্যাণ্ড বলে মনে হচ্ছে না।'

একই সঙ্গে ঘোঁৎ করে উঠল বাকি লোকগুলো। রঙ হারিয়ে চেহারা ছাইয়ের মত হয়ে গেল লোকটার। চোখদুটো সরু করে দু'পা এগিয়ে এল।

'এই...এই!' খেপে গেল রাঁধুনী। 'তুমি কি তা হলে বলতে চাইছ...'

'ঠিক আছে, টাকমাথা,' মৃদুস্বরে ওকে থামিয়ে দিল লোকটা। 'ব্যাপারটা আমি দেখছি।' বিদ্বেষভরা চোখে ফ্রাঙ্কের দিকে চাইল। 'তা হলে আমাকে তোমার রোনাল্ডদের কাউহ্যাণ্ড বলে মনে হচ্ছে না, তাই তো? তা হলে আমি নিজেও অবশ্য অবাক হয়ে যেতাম। ঠিক বলেছ। রোনাল্ডদের কোনও লোকজন নেই।'

'ওদের কিছু বন্ধুবান্ধব তো আছে।'

হেসে দিল লোকটা ফ্রাঙ্কের কথা শুনে। ওর সাথে হাসল আরও কয়েকজন। ওর বাহনের দিকে নজর গেল লোকটার। ব্র্যাণ্ড দেখে ভুরু কুঁচকাল। 'বিল প্রায়র আবার কখন থেকে এখানে এল?'

'বিল প্রায়র আউট। বার হুইলের মালিক এখন আমি।'

ডান হাতের আঙুল তুলে চিবুক চুলকাল লোকটা। 'তাতে আমার কী?'

'কেবল একটাই,' অমায়িক হাসি হাসল ফ্রাঙ্ক। 'তুমি ভুল জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া দিতে এসেছ। তোমার তার গুটিয়ে নাও। খুঁটিগুলো তুলে নাও। ওসব নিয়ে যেখান থেকে এসেছ, সেখানে চলে যাও।'

লোকটা থুতু ফেলল। 'তোমার জন্যে আমার কাছে একটা খবর আছে, মিস্টার। ওই কাঁটাতারগুলো এখানে থাকবে। খুঁটিগুলোও। আমরাও থাকছি। তোমার যদি তাতে আপত্তি থাকে, তা হলে...' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'ঠিক আছে?'

এর মানে পরিষ্কার লড়াইয়ের আমন্ত্রণ।

রাগে মুখ কালো হয়ে উঠল ফ্রাঙ্কের। ঋজু ভঙ্গিতে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে ও। এতক্ষণ কথা বলার সময় একবারও চোখ ফেরায়নি লোকটার ওপর থেকে। ওর কথা বলার ধরন খেয়াল করেছে। ওর দু'পাশে ওর লোকেরা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ওর কাছাকাছি ডানদিকে, ওর শরীরের প্রায় আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে রাঁধুনীও।

উস্কানিমূলক কথা বলেছে লোকটা। পিস্তল বের করতে বলেছে। ফ্রাঙ্ক জানে, ও পিস্তলের দিকে হাত বাড়ানো মাত্র ক্রসফায়ারে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।

লোকটার চোখে খুনির উল্লাস। বিদ্রূপে ঠোঁট বেঁকে গেল ওর। 'আচ্ছা, তুমি তা হলে পিস্তল বের করতে চাও না? কিন্তু তা তো হবে না। তিন সেকেণ্ডের মধ্যে পিস্তলের দিকে হাত না-বাড়ালে মেরে হাড়গোড় ভেঙে দেব। দু'হাত আর দু'পা খোঁড়া করে দেব। তারপর তোমার নিজের ঘোড়ার সাথে বেঁধে...'

প্রচণ্ড শব্দে চাপা পড়ে গেল লোকটার কথা। ফ্রাঙ্কের পেছনে ঝোপঝাড়ে ভরা রিমের ওপর থেকে আবার ভেসে এল গুলির শব্দ। চারদিকে প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল।

ফ্রাঙ্কের পাশে সরে এসে দাঁড়িয়েছিল দু'জন। নেতার হুমকি অনুযায়ী আগন্তুককে পিটিয়ে হাতের সুখ মেটানোর কল্পনা করতে করতে পুলকিত হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। প্রথম গুলিতে ওদের একজনকে পড়ে যেতে দেখল ফ্রাঙ্ক। দ্বিতীয় গুলি কোথায় লাগল টের পেল না সে। কারণ ততক্ষণে ওর গুলিতে তৈরি নেতার তৃতীয় নয়নের দিকে তাকিয়ে আছে ও। লোকটার মুখ হাঁ হয়ে গেছে শব্দহীন চিৎকারে। বেচারা আচমকা গুলির শব্দে চমকে ওঠায় ফ্রাঙ্কের হাতে কখন পিস্তল উঠে এসেছে খেয়ালই করতে পারেনি। যখন খেয়াল করতে পেরেছে, তখন শব্দহীন চিৎকার ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। গুলির ধাক্কায়

পেছনে উল্টে গেছে ও। হাতে ধরা পিস্তলটা ছিটকে পড়েছে।

তবে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় উপুড় হলো লোকটা। উঠতে গেল। কিন্তু হাত ও হাঁটু সাড়া দিল না। উপুড় হয়ে পড়ল ফের। মুখ দিয়ে কাশির সাথে গল গল করে বেরিয়ে এল তাজা রক্ত।

নেতার পতন দেখে বাকি তিনজন আর দাঁড়ানোর ভরসা পেল না। একই সঙ্গে ঝাঁপ দিল ওরা নিজ নিজ ঘোড়ার উদ্দেশে। সবাই সফল হলো না। একজন মাত্র কোনওরকমে ঘোড়ার পিঠের নাগাল পেল। বাকি দু'জনের একজনের পা আটকে গেল স্টিরাপের সঙ্গে, সে-অবস্থায় ওকে নিয়ে ছুটল ঘোড়াটা, আরেকজন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাথায় ঘোড়ার লাথি খেয়ে। ঘোড়ায় চড়ে পলায়নরত লোকটার পেছনে শার্ট আস্তে আস্তে রঞ্জিত হয়ে উঠতে দেখল ফ্রাঙ্ক।

বার হুইলের ঘোড়াটা মনে হয়, বারুদের ধোঁয়ায় অভ্যস্ত নয়। ভয়ে সামনের দু'পায়ের নীচে মাথা ঢুকিয়ে পেছনের দু' পা তুলে লাফাতে শুরু করেছে ওটা। লাফের তালে তালে পাঁজরের পেশী কিলবিল করে উঠছে। ঘুরতে লাগল ওটা। যেন উটকো ঝামেলাটাকে পিঠ থেকে উল্টে ফেলে দিতে পারলেই মুক্তি। বারবার লাফাচ্ছে ঘোড়াটা। চিৎকার করে ওটাকে শান্ত হতে বলছে ফ্রাঙ্ক। প্রাণপণে চেষ্টা চালাচ্ছে পিঠে টিকে থাকতে। হাত থেকে কিছুতে লাগাম ছাড়ছে না।

বারবার ধমক আর আশ্বাস শোনার পর শেষ পর্যন্ত শান্ত হলো ঘোড়াটা।

ঘামে ভেজা লাল মুখ নিয়ে চারদিকে চাইল এবার ফ্রাঙ্ক। মাটিতে পড়ে থাকা নেতাগোছের লোকটার লাশটা দেখল। ওর হাতে এখনও পিস্তল। আচমকা গা গুলিয়ে উঠল ওর। ও তা হলে একজন মানুষ খুন করেছে!

ঘোড়ার খুরের শব্দে সচকিত হয়ে উঠল। ব্ল্যাককে দেখতে

পেল কাছে এসে ওর পেছনে ঘোড়া থামাতে। ওর হাঁটুর ওপর রাখা একটা উইনচেস্টার। একটু আগে এখানে কম পক্ষে দুটো লোক খুন হয়েছে ওই উইনচেস্টারের গুলিতে।

অসন্তুষ্টিতে ঘোঁৎ করে উঠল বুড়ো। 'একটাকে ফেলতে পারিনি। তোমার কী অবস্থা? গুলি লেগেছে?'

মাথা নাড়ল ফ্রাঙ্ক।

'কাহিল দেখাচ্ছে তোমাকে।'

'আমি ঠিক আছি, ব্ল্যাক।' উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুখ মুছল। 'ওই ওয়্যাগনটায় আগুন ধরিয়ে দাও। খুঁটিগুলো জ্বালিয়ে দাও। তারপর কাঁটাতারগুলোর একটা ব্যবস্থা করো। আমি এখন যাচ্ছি। রাতে *বক্সড ওয়াই* হেডকোয়ার্টারে দেখা হবে তোমার সাথে।'

ঘোড়া ফেরাল ফ্রাঙ্ক চলে যাওয়ার জন্য। ব্ল্যাক পেছন থেকে বলল, 'ওখানে না-হলে আর কোথায় পাব তোমাকে?'

'ড্রাই বটম ব্যাংকে খোঁজ কোরো,' বলেই ঘোড়া ছোটাল ফ্রাঙ্ক।

## উনিশ

স্প্যারোহোয়াকের উঁচু ফলস ফ্রন্টের সামনে ঘোড়া থামাল ফ্রাঙ্ক। শহরের সবচেয়ে বড় বার আর সবচেয়ে বড় জুয়ার আসর বসে এখানে। ঘোড়াটাকে বেঁধে ড্রাই বটমের সঙ্কীর্ণ রাস্তায় নামল সে। আড়াআড়িভাবে পেরিয়ে অপর পাশে গিয়ে উঠল। এমনভাবে

হাঁটছে, দেখে যে কারও মনে হতে পারে যে, লোকটা কাউকে খুঁজছে বোধ হয়।

সময় ঠিক মধ্যদুপুর। ভাপসা গরম। দমকা হাওয়ায় থেকে থেকে রাস্তার দু'পাশের কাঠের পাটাতন থেকে ধুলো উড়ছে। কলোসাল মার্কেন্টাইল থেকে দু'জন মহিলা বেরিয়ে এল। পরনে ক্যালিকো শার্ট আর বনেট। নাপিতের দোকানের সামনের খুঁটির পাশে পেছনের এক ঠ্যাং তুলে প্রাকৃতিক ক্রিয়া সারছে একটা বেওয়ারিশ কুকুর।

পরনের লেভাইস থেকে হাতের ঝাপটায় বীয়ার ফ্ল্যাটসের ধুলো ঝাড়ল ফ্রাঙ্ক। স্প্যারোহোয়াকের অনিং-এর ছায়ায় দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল। ওর ভাবভঙ্গি খুঁটিয়ে দেখলে যে কারও মনে হবে লোকটার হাতে বুঝি প্রচুর অবসর, একটুও তাড়া নেই। কিন্তু ফ্রাঙ্ক ব্যস্ত। অলস ভঙ্গিতে ধূমপান করতে করতে চোখের সামনে যা পড়ছে, প্রতিটি জিনিস দেখছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। চুলচেরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছে। জানে, এখানে বসে যা দেখছে, তা ঠিকমত বুঝতে পারলে পরিস্থিতি তার জন্যে অনেকটা সহজ হয়ে যেতে পারে। আসলে কোনও জায়গায় প্রথম যাওয়ার পর সেখানকার পরিবেশের সাথে নিজেকে দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে চাইলে লোকজনের আচার-আচরণ আর দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হয়।

হ্যাটের ব্রীম কপালের ওপর টেনে দেয়ায় দূর থেকে দেখে যে কারও মনে হতে পারে, লোকটা বোধ হয় বসে বসে ঢুলছে।

ওর সামনের রাস্তার ওপারের ভবনটার নাম হেয়ারপিন হাউস। টু-স্টোরি ভবনটার দক্ষিণ অংশে বেকারি আর উত্তর পাশটা ব্র্যাকারদের মহিলাদের টুপিসহ আটপৌরে কাপড়চোপড়ের দোকান। ধুলোয় ধূসর দুটো হ্যাট যেন উঁকি দিচ্ছে জানালা দিয়ে। তার থেকে খানিকটা দূরে রাস্তার ওপাশে ড্রাই বটম

ব্যাংক। ব্যাংকের সামনের দরজার পাল্লাদুটো খোলা। ভেতরে লোকজন দেখা যাচ্ছে না বিশেষ। তার মানে এই মুহূর্তে ব্যবসা হচ্ছে না ওখানে।

সিগারেট শেষ না-হওয়া পর্যন্ত এসব দেখে শুনে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করল ফ্রাঙ্ক। শেষ হতেই পায়ের তলায় গোড়াটা পিষে ফেলে উঠে দাঁড়াল। আড়মোড়া ভেঙে ধীর পায়ে ঢুকল স্প্যারোহোয়াকের ভেতর। বারের দূরপ্রান্তে তিনজন খদ্দেরকে দেখল নিজেদের মধ্যে গল্প করে সময় কাটাচ্ছে। একটা খালি পোকার টেবিলে বসে নিজের মনে টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে আঁকিবুঁকি কাটছে একজন লোক। একটা চেয়ার দখল করে হুইস্কির অর্ডার দিল ফ্রাঙ্ক। চুপচাপ ওটা শেষ করে ফের নেমে এল রাস্তায়। কী করবে এখনও ঠিক করতে পারেনি।

বোর্ডওঅক দিয়ে অলস পায়ে দক্ষিণে হেঁটে যাচ্ছে ও। হাবভাবে তাড়াহুড়োর কোনও চিহ্ন নেই। এখানে আসার পর থেকে ঘটে যাওয়া ব্যাপারগুলো মনে মনে পর্যালোচনা করে দেখছে। সুজানার কাছে এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে যা শুনেছে, সেগুলো মনে মনে যাচাই করছে। তবে কোনও কথাই এখন ওর মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। এসবের সাথে জড়ানোর পেছনে বিশেষ কোনও উৎসাহ খুঁজে পাচ্ছে না সে। মসম্যান ওকে যে ক্ষমা ঘোষণার প্রস্তাব দিয়েছে, সেটাও শর্তসাপেক্ষ। শুধু শুধু লামট্রিলের বিরুদ্ধে *বক্সড ওয়াই* গ্রাস করার অভিযোগ তুললে কাজ হবে না। ও যে আইনের বিধিবিধান ভাঙছে, আগে সেটার প্রমাণ পেতে হবে। কিন্তু সেটা করতে গেলে রোনাল্ডদের ওপর বিপদ নেমে আসবে। ওরা বাপ-মেয়ে একা থাকে র‍্যাঞ্চে। লামট্রিলের শত্রুতা থেকে নিজেদের রক্ষা করার শক্তি ওদের নেই। ফ্রাঙ্ক লামট্রিলের বিরুদ্ধে লাগলে রোনাল্ডদের ওপর তার শোধ তুলতে চাইবে লোকটা।

সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হবে দ্রুত এবং আচমকা ওর শক্তির উৎসে আঘাত হানা। কিছু না, স্রেফ ড্রাই বটম আর উইলকক্সের ব্যাংকদুটো লুট করলেই চলবে। কিন্তু সমস্যা হলো, তা হলে সে ব্যাংকডাকাত হিসেবে চিহ্নিত হবে। মসম্যানের কাছ থেকে ক্ষমা ঘোষণা পাবার সুযোগটা হারাবে চিরতরে।

সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে ফ্রাঙ্ক। দাঁত দিয়ে ঠোঁটের কোনা চিবোচ্ছে। রোনাল্ডদের সাহায্য করতে যাওয়া মানে নিজের জন্যে ক্ষমা পাওয়ার সে-সুযোগটা হারানো, যেটা তাকে স্বয়ং গভর্নর তার প্রতিনিধির মাধ্যমে সেধে দিতে চাইছে। ব্যাপারটা ভাবতেই খারাপ লাগছে ওর।

তবে এও ঠিক, লামট্রিল যা করছে, তা অন্যায়। একটা লোক দিনের পর দিন আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গরিব র‍্যাঞ্চগুলোর স্বার্থ নষ্ট করে যাবে, অথচ টাকার জোরে নিজেকে সারাক্ষণ আড়াল করে রাখবে, তা হয় না। সেদিক থেকে দেখতে গেলে সুজানার পরিকল্পনাই ঠিক আছে। লামট্রিলের বিপক্ষে সর্বাত্মক লড়াইয়ে নেমে পড়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু সে জন্যে যতটা শক্তি ও প্রস্তুতির দরকার, তা তার নেই। অন্তত এমন একজন লোকের দরকার যে, লামট্রিলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে। কিন্তু ফ্রাঙ্ক জানে, সেরকম ক্রু তাদের নেই। সেরকম কেউ ওর নিজেরও নেই।

এসব ভাবতে ভাবতে কলোসাল মার্কেন্টাইলের ভেতর ঢুকল সে। তিনজন মহিলা বসে আছে কাউন্টারে। একটা ক্র্যাকার বক্সে বসে আড্ডা মারছে গোটাকয়েক ছোকরা। মহিলাদের একজন মালপত্র কেনায় ব্যস্ত। বাকি দু'জন প্রায় প্রত্যেকটা কাপড় ধরে ধরে পরীক্ষা করে দেখছে কেনা যায় কিনা। তবে মুখের বিরাম নেই তিনজনের কারও। শহরের বিভিন্ন ব্যাপারে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করছে।

কেরানি লোকটা দুই মহিলাকে কাপড় দেখায় সাহায্য করছিল। ফ্রাঙ্ক ওর উদ্দেশে বলল, 'আমাকে দু'বাক্স পয়েন্ট ফরটি ফাইভ গুলি দিতে পারবে?'

অনুমোদন পাওয়ার আশায় যেন মহিলা দু'জনের দিকে চাইল কেরানি। তারপর কার্তুজের বাক্স নিয়ে এল ফ্রাঙ্কের কাছে। দাম মিটিয়ে দিয়ে কার্তুজগুলোর কিছু লুপে ঢোকাল ফ্রাঙ্ক। বাকিটা পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে কেরানিকে বলল, 'উইলকক্সের ব্যাংকে গণ্ডগোলের কথা শুনেছ নাকি কিছু?'

'না তো! কীসের গোলমালের কথা বলছ?' নিরীহ স্বরে জানতে চাইল কেরানি।

'আমি যেরকম শুনেছি,' বলল ফ্রাঙ্ক। 'সেটা হলো, ব্যাংকের কাগজপত্র পরীক্ষা করার জন্যে দু'জন লোক এসেছিল। শুনেছি তারা কাগজপত্রে কিছু গোলমাল খুঁজে পেয়েছে...'

চুপ করে রইল কেরানি।

এর চেয়ে বেশি কিছু বলল না আর ফ্রাঙ্ক। কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে গেল। বেরিয়ে এল মার্কেন্টাইল থেকে। রাস্তার এক হাঁটু ধুলোর মধ্য দিয়ে হেঁটে চলল। ব্যাংকের ভেতর গিয়ে ঢুকল কিছুক্ষণ পর।

ব্যাংকে মাত্র একজন খদ্দের। গরুব্যবসায়ীর পোশাকপরা একজন বুড়োমত লোক ক্যাশিয়ারের সঙ্গে ব্যবসায়িক আলোচনায় মত্ত। কক্ষের মাঝামাঝি জায়গায় কাস্টমার'স কাউন্টার। ওখানে গিয়ে পেন্সিলটা নিল ফ্রাঙ্ক। হ্যাটব্যাণ্ডের ভেতর থেকে দুমড়ানো এক টুকরো কাগজ বের করে তাতে আগের লেখার ওপর অতিরিক্ত তিনটি শব্দ লিখল। তার সাথে লিখল কয়েকটি সংখ্যা। তারপর কাগজটি নিয়ে দাঁড়াল বুড়ো লোকটার পেছনে। এসময় আরও তিনজন লোক ঢুকল ব্যাংকে।

এদের মধ্যে একজন মহিলা। সবাই যার যার চেক নিয়ে

ফ্রাঙ্কের পেছনে লাইনে দাঁড়াল। মেয়েলোকটার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে এক নজর তাকাল। চিনতে পারল মেয়েটাকে। একটু আগে গ্রোসারিতে দেখেছে। তবে পরিচিতির কোনও চিহ্ন দেখাল না ফ্রাঙ্ক। ওর দু'হাতের তালু ঘামছে। বাইরে থেকে দেখে অবশ্য বোঝার উপায় নেই। নির্বিকার মুখে সামনের দিকে চেয়ে আছে সে।

লামট্রিলের শক্তির উৎস কোথায়, এটা সে প্রথম থেকেই জানে। এখন যদি সে লামট্রিলের ব্যাংক লুট করে, তা হলে ব্যাংকটা লাটে উঠবে। সবাই জেনে যাবে, উইলকক্স ব্যাংকে টাকা নেই। ওর ভাড়াটে বন্দুকবাজরা ওকে ছেড়ে চলে যাবে। আর যেসব সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়মিত ঘুষ দিয়ে নিজের পক্ষে কাজ বাগিয়ে নিত, তারাও টাকা-পয়সা না-পেয়ে মুখ ফিরিয়ে নেবে।

ব্যাংকটায় ডাকাতি করলে কীরকম মারাত্মক সমস্যার মুখে পড়তে হতে পারে, তা ভাল করেই জেনে এসেছে ফ্রাঙ্ক। এটা কৌচিস কাউণ্টি। শেরিফ লেইফের এলাকা। কে জানে, হয়তো ওর পাসিদলের কেউ এখানে কোথাও ঘাপটি মেরে থেকে ওর ওপর নজরও রাখতে পারে। কেউ হয়তো এখন ওকে বার হুইলের মালিক হিসেবেও চিনে ফেলতে পারে। আজ সকালে বীয়ার ফ্ল্যাটসে গোলাগুলির ব্যাপারটাও কেউ না কেউ মনে রেখেছে হয়তো বা। খাঁচার মত এই ঘরটার সামনের গ্রিলের অপর পাশে বসা ক্যাশিয়ার লোকটাও হয়তো ওকে সন্দেহ করে সতর্ক হয়ে উঠতে পারে। হয়তো উঠেছেও। সামনের কাস্টমারকে বিদায় দিয়ে এবার চেকের জন্যে ফ্রাঙ্কের দিকে হাত বাড়াল সে। লোকটার দিকে একবারও না-তাকিয়ে কাগজ ধরা হাতটা বাড়িয়ে দিল ফ্রাঙ্ক।

ব্যাংকে এখন লোকজন গিজ গিজ করছে। এতক্ষণ ধরে প্রায় নিঃশব্দ ঘরটা এখন নিচু স্বরের আলাপে মুখর। কারও দিকে না-

তাকিয়ে সোজা সামনের দিকে চেয়ে রইল ফ্রাঙ্ক। অপেক্ষা করছে।

ওর কাগজটা হাতে নিয়ে চোখ তীক্ষ্ণ করে চাইল ক্যাশিয়ার। কপালে ভাঁজ ফেলে চোখের আরও কাছে নিয়ে গেল ওটা।

'কী ব্যাপার?' কপালে ভাঁজ ফেলল ফ্রাঙ্ক নিজেও। 'কোনও সমস্যা?'

'না...মানে...ঠিক...ইয়ে, একটু যেন অনিয়ম...' থেমে গেল ক্যাশিয়ার। আমতা আমতা করছে।

'অনিয়ম? কীসের অনিয়ম দেখতে পাচ্ছ তুমি এতে?' খেপে উঠল ফ্রাঙ্ক। 'উনি এখানে একটা অ্যাকাউন্ট করেছেন।'

বিরক্তিভরা চোখদুটো তুলল ক্যাশিয়ার ওর দিকে। 'এটা ফের *ওকে* করিয়ে আনতে হবে।'

'কেন? ফের *ওকে* করে আনতে হবে কেন? তুমি বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র। তোমার কাজ গ্রাহকদের সেবা করা। তুমি কেন এটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ? ওনার স্বাক্ষর দেখছ না?' পেছনের লোকগুলোকে ওদের কথাবার্তার দিকে মনোযোগী হয়ে উঠতে দেখে গলা চড়াল। 'এটা এক হাজার ডলারের একটা নিখুঁত বেয়ারার চেক। মি. লামট্রিলের নিজের মেয়ের হাতে দস্তখত করা। আর তুমি কিনা আমাকে আইন দেখাচ্ছ! তোমাদের ব্যাংকে যদি টাকা না-থাকে তা হলে...'

'অবশ্যই আমাদের টাকা আছে। যে কোনও জরুরি প্রয়োজন মেটানোর জন্যে আমাদের প্রচুর টাকা মজুত থাকে। কিন্তু...'

'তা হলে শুধু শুধু ঝামেলা করছ কেন? টাকা থাকলে দিয়ে দাও। আমরা যে যার কাজে চলে যাই।'

পেছনে একসঙ্গে ঘোঁৎ করে উঠল অপেক্ষমাণরা। ফ্রাঙ্ককে সমর্থন জানাচ্ছে। তারা সবাই এখানে এসেছে তাড়াতাড়ি টাকা তুলে নিয়ে যে যার ধান্দায় চলে যাওয়ার জন্যে। এখানে দাঁড়িয়ে ফালতু প্যাঁচাল শোনার সময় ও ইচ্ছে কারও নেই। একজন

অসহিষ্ণু স্বরে চেঁচাল, 'কী হচ্ছে ওখানে, অ্যাঁ?'

তার জবাবেই যেন একজন মহিলার বাজখাঁই গলা শোনা গেল, 'ওরা আমাদের টাকা দিতে চাইছে না।'

একসঙ্গে পাঁচ-ছয়টি গলার ক্রুদ্ধ গর্জনের পুরো ঘরটা গম গম করে উঠল। ক্যাশিয়ারের রুমের পেছনের দরজাটা খুলে একজন লোক ঢুকল। বিশালকায় মোটা লোক। পরনের নীল পোশাক। দ্রুত ক্যাশিয়ারের পেছনে চলে এসে কর্তৃত্বপূর্ণ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার বলো তো? কী হয়েছে এখানে? এত হৈ চৈ কীসের?'

লোকজনের হৈ চৈ শুনে মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল ক্যাশিয়ারের। সেভাবেই বলল, 'এই যে...' ফ্রাঙ্কের কাছ থেকে পাওয়া কাগজটা ঠেলে দিল। 'এই লোকটা...'

কাগজটা তুলে নিল আগন্তুক। পড়তে গিয়ে মুখ কালো হয়ে উঠল। বিড় বিড় করতে করতে লবিতে লাইন ধরে দাঁড়ানো লোকগুলোর দিকে চাইল। ভেতর থেকে দরজা পর্যন্ত দাঁড়ানো লোকগুলো ক্রুদ্ধ অসহিষ্ণু চোখে তাকিয়ে আছে। জানালা দিয়েও উঁকি মারতে দেখা যাচ্ছে।

ওদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কাউন্টারের সামনে দাঁড়ানো ফ্রাঙ্কের দিকে চাইল ফের। ওর মুখ গ্র্যানিট পাথরের মত শক্ত হয়ে আছে।

'মি. লামট্রিল,' ক্যাশিয়ার বলল। 'এই লোক...'

'টাকাটা দিয়ে দাও ওকে,' ক্যাশিয়ারকে পাত্তা দিল না লামট্রিল। 'ওটা মার্টার দস্তখত।'

কাউন্টারের ওপাশের ক্রুদ্ধ মুখগুলোর দিকে অমায়িক চোখে চাইল ও। পর মুহূর্তে ছুরির ফলার মত ধারাল দৃষ্টিতে ফের তাকাল ফ্রাঙ্কের দিকে।

এরপর বাইরের লোকগুলোকে শান্ত করার চেষ্টা চালাল ও।

টাকা গুণে ফ্রাঙ্কের দিকে এগিয়ে দিচ্ছিল ক্যাশিয়ার। ফ্রাঙ্ক ওগুলো ঠেলে দিল ওর দিকে। 'কিছু মনে কোরো না,' মৃদু স্বরে বলল। 'আমার কাগজটা ফেরত দাও। আমি মত পাল্টেছি।'

হতভম্ব ক্যাশিয়ার এমনভাবে তাকাল, যেন কেউ ওর মুখে আচমকা ঘুসি মেরে দিয়েছে। মুখ ঝুলে পড়ল ওর, নির্বোধের মত চেয়ে রইল।

'কই, দাও! হাঁ করে দেখছ কী?'

মালিক খেয়াল করার আগে কাগজটা ঠেলে দিল ক্যাশিয়ার। কাগজটা হাতে নিয়ে অপেক্ষা করল না ফ্রাঙ্ক। ক্যাশিয়ারের রুমের সামনে তখন অনেক লোকের ভিড় জমে উঠেছে। ওদের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পথ করে নেয়ার জন্যে রীতিমত দু'হাতের কনুইয়ের গুঁতো লাগাতে হলো ওকে।

প্রচণ্ড গরম, ঘাম, ক্রোধ আর ভয়ে উচাটন হয়ে পড়েছে সমবেত লোকগুলো। সবাই ছুটে আসছে ব্যাংকের দিকে তাদের গচ্ছিত টাকা তুলে নেয়ার জন্যে। ব্যাংকে টাকা নেই, এমন একটা খবর ছড়িয়ে পড়েছে তাদের মনে আতঙ্কের মত। সবাই চাইছে অন্তত তার টাকাটা যেন মারা না-যায়। মরিয়া হয়ে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে আসতে থাকা লোকগুলোর উদ্দেশে মুখ খারাপ করল ফ্রাঙ্ক। বিড় বিড় করে গাল বকতে বকতে হাতের ধাক্কা আর কনুইয়ের গুঁতো দিতে দিতে সামনে এগোল ফ্রাঙ্ক।

লোকগুলোর হৈ চৈয়ে কান পাতা দায় হয়ে পড়েছে। মরিয়া লোকগুলো চাইছে কাউন্টারের চারপাশে গ্রিল দিয়ে ঘেরা জায়গাটার কাছাকাছি হতে, যেন ক্যাশিয়ারের কানের কাছে গিয়ে সজোরে তাদের টাকা ফিরিয়ে দেয়ার দাবিটা জানাতে পারে। উন্মত্ত জনতার মাঝে মারদাঙ্গা শুরু করার মত সব ধরনের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে ফ্রাঙ্ক। সঠিক নেতৃত্ব পেলে এতক্ষণে হয়তো শুরুও করে দিত।

হাতের ঠেলা, কাঁধের ধাক্কা ও কনুইয়ের গুঁতো–যখন যেভাবে সুযোগ পাচ্ছে, সেভাবে ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগোচ্ছে ফ্রাঙ্ক। ওর আচরণে কেউ কেউ অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। লোকটা আসলে কোন্‌দিকের বোঝার চেষ্টা করছে। ওদের হৈ-হট্টগোল ছাপিয়ে লামট্রিলের গলা শুনতে পাচ্ছে সে। উচ্চকণ্ঠে লোকদের ঠিক কী হয়েছে বোঝানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু ওর বক্তব্যে কান দিচ্ছে না কেউ। তারা তাদের জমা রাখা টাকার নিরাপত্তা চাইছে। আর তাদের মনে এমন আশঙ্কা জেগেছে যে, লামট্রিলের ব্যাংক আর সেটা দিতে পারছে না। তাদের রাগী, ভীতু এবং অসহিষ্ণু চেহারা ফ্রাঙ্কের নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মেজাজ খারাপ হয়ে উঠল ওর। সামনের লোকটার কুঁচকিতে হাঁটুর গুঁতো লাগাল। একই সঙ্গে পেছন থেকে ঘুসি চালাল ওর মুখে। বামদিকে গোঁয়ার গোবিন্দ লোকটা সেটা লক্ষ করে ফ্রাঙ্কের দিকে এগিয়ে এল। ঘুসি মারতে গেল। গান ব্যারেল দিয়ে বাড়ি মেরে লোকটাকে থামাল ফ্রাঙ্ক। লোকটা পড়ে যেতেই ওর শরীর টপকে সামনে চলে গেল। সামনে পড়া আরেকজনের পেটে মারল সে। পরের জনকে ঘাড়ে আঘাত করে কাবু করল। তারপর পেছনে ক্রুদ্ধ জনতার গালাগালি আর অভিসম্পাত উপেক্ষা করে দোরগোড়ায় পৌঁছল।

বন্দুকের ব্যারেল দিয়ে আরেকজনের মুখে মারল ফ্রাঙ্ক। ক্রুদ্ধ লাল মুখটাকে একই সঙ্গে ব্যথায় বিকৃত ও রক্তে লাল হয়ে উঠতে দেখল। পাত্তা দিল না তাতে। ফের ব্যারেল চালাল ও। আরও দু'জন আহত হয়ে পড়ে গেল। কিন্তু আবার কেউ না কেউ ওর সামনে এসে দাঁড়াল। বিভ্রান্তের মত হয়ে গেল ফ্রাঙ্ক। ওর মনে হলো একটা দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে ও। ভয়াবহ সব ব্যাপার যেন মানুষের মুখ হয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। ওর ডানপাশে তিন কদম দূরে একজন লোক দেখল ওকে। আচমকা

বাজখাঁই গলায় চেঁচাল লোকটা, ‘ধরো ওকে, ধরো। কুত্তার বাচ্চাটাকে বানাও আচ্ছা করে!’

লোকটার চিৎকারে চমকে উঠেছিল ফ্রাঙ্ক। মুহূর্তের জন্যে আনমনা হয়ে পড়েছিল। তাই বামদিক থেকে ঘুসিটা আসার সময় খেয়াল করতে পারেনি। চোয়ালে এসে লাগতে সচকিত হয়ে উঠল। কিন্তু ততক্ষণে আরেকটা হাত এসে জামার কলার টেনে ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। আরেকজন এসে ওর কোমরের বেল্ট নিয়ে টানাটানি শুরু করল। হাঁটুর মোক্ষম গুঁতো লাগাল ফ্রাঙ্ক লোকটার পেটে। আরেকজনের মুখে বন্দুকের ব্যারেল দিয়ে আঘাত হানল। ছিটকে রক্ত বেরিয়ে এল ক্ষতবিক্ষত মুখ থেকে। এরপর মাথা নিচু করে বুনো মোষের মত ছুটল। দু'জন তেড়ে আসছিল সামনে থেকে একসাথে। মাথার প্রচণ্ড গুঁতোয় দু'পাশে ছিটকে গেল ওরা। ওর মারমুখী ভঙ্গি দেখে লোকজনের মধ্যে হঠাৎ হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। এতে দরজার সামনেটা ফাঁকা হয়ে পড়ল ক্ষণেকের জন্যে। ওদিকে এগোল ফ্রাঙ্ক ভীষণ বেগে। পেছন থেকে কয়েকজন ওকে তাড়া করে ছুটল। আচমকা পেছনে ফিরল ফ্রাঙ্ক। বন্দুকের ব্যারেলটা চালাল কুড়ালের মত করে। পড়ি কি মরি করে পেছনে সরে গেল ওরা।

একজনের পায়ে লাথি হাঁকাল ও সজোরে। কিন্তু পেছন থেকে দুটো হাত পেঁচিয়ে ধরল ওর গলায়। থামল না ও। হাতদুটোর মালিককে নিয়েই সামনে এগোতে লাগল। সামনে পড়ে যাওয়া একজনকে টপকে পার হলো। আরেকজনের ঘাড়ে মারল ব্যারেল দিয়ে।

ঘাড়ের ওপরের লোকটা হাতের চাপ বাড়াচ্ছে ওর গলার ওপর। পাত্তা দিচ্ছে না ফ্রাঙ্ক। সে-অবস্থায় দরজা পেরিয়ে গেল। বেরিয়েই ঘাড়ের ওপর সিন্দাবাদের দৈত্যের মত চেপে থাকা লোকটার দিকে মনোযোগ দিল। সজোরে এক পাক ঘুরল। গা

ঝাড়া দিল বেশ কয়েকবার। আবার পাক খেল। দু'হাতের কনুই চালাল পিস্টনের মত করে লোকটার পাঁজরে। অনবরত মার সহ্য হলো না লোকটার। আচমকা আলগা হয়ে গেল ওর হাতের চাপ। সজোরে আছড়ে ফেলল ফ্রাঙ্ক লোকটাকে।

পেছন থেকে আবার কাউকে চিৎকার করে উঠতে শুনল। 'শেরিফকে! শেরিফকে ডেকে নিয়ে এসো! তাড়াতাড়ি!'

চরকির মত বামে ঘুরল ফ্রাঙ্ক। মিলিনারি হাউসের দিকে ছুটল। ওটার স্ক্রিনডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। সাদামুখো একজোড়া নর-নারী ওর উপস্থিতি টের পেয়ে ভূত দেখার মত চমকে উঠে এক পাশে সরে গেল। লাফ দিয়ে ওদের মাঝখানে গিয়ে পড়ল ফ্রাঙ্ক। সারি সারি হ্যাট ঝুলিয়ে রাখা একটা স্ট্যাণ্ড কাত হয়ে পড়ল একদিকে। পেছনের দরজাটা দেখতে পেল ও। ঝাঁপ দিল সেদিকে। দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল। একই সময়ে ওর চোখে সরু গলিপথে একটা মানুষের অবয়ব ধরা পড়ল। গাঢ় ছায়ায় একটা কমলা রঙের ছটা দেখে আঁতকে উঠল লোকটা। ওর অস্ফুট আর্তস্বর ফ্রাঙ্কের কানে এল। তবে ওদিকে নজর দিল না। বামদিকে একটা দরজা দেখতে পেয়ে সজোরে হাঁটুর গুঁতো লাগাল। খুলে গেল দরজাটা। ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। একটা ভয়চকিত মুখ দেখতে পেল। লোকটাকে ঝাপটা মেরে নিজের সামনে থেকে সরিয়ে দিল। ভেতরে পর্দা ঝোলানো একটা দরজা দেখে এগোল ওটার দিকে। পর্দার অপর পাশে গ্লাস কেসের পেছনে ভীতসন্ত্রস্ত একটা মেয়েকে দেখল। সেদিকে আর না-তাকিয়ে একটা স্ক্রিনডোর দিয়ে বেরিয়ে ফের রাস্তায় নামল। উত্তর দিকের বেকারির দোকানটা পেরোবার সময় পেছন থেকে তিনটা গুলির শব্দ শুনল। তিন লাফে হেয়ারপিন হাউসের পোর্চে উঠে পেছনে গুলি করল সেও।

হোটেলের ছায়াচ্ছন্ন খালি লবিতে দাঁড়িয়ে মার্টা মের স্বাক্ষর

করা কাগজটি মুখের ভেতর পুরল ফ্রাঙ্ক, একটু ইতস্তত করে চিবোতে শুরু করল। তারপর থোঃ থোঃ করে ফেলে দিতে দিতে হোটেলের স্ক্রিনডোর দিয়ে রাস্তায় তাকাল। রাস্তার ওপাশে যেখানে বেঁধে রেখেছিল, নিজের ঘোড়াটাকে সেখানেই দেখল। রাজার হালে আছে, সামনে দানাপানি। কেউ একজন যত্ন নিচ্ছে মনে হয়। তা-ই যদি হয়ে থাকে, তা হলে যাওয়ামাত্র যে ঘোড়াটা ওর হাতে তুলে দেবে, তা ভাবাটা ঠিক হবে না। ওরা বরঞ্চ ওকে আটকানোর ধান্দায় ঘুরছে। তাই সময় থাকতে এখান থেকে ভাগতে হবে। অন্তত সবাই মিলে জায়গাটা ঘিরে ফেলার আগে।

দর দর করে ঘামছে সে। বাম হাতে চিবুক থেকে ঘাম মুছে নিতে নিতে পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করার চেষ্টা করল। ওর হাতে অঢেল সময় নেই। প্রতিটি মুহূর্তই এখন জরুরি। এরই মধ্যে চারদিক থেকে বুটের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কেউ একজনকে চেঁচিয়ে কী করতে হবে নির্দেশ দিতে শোনা গেল। রাস্তার দিকে তাকাল সে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল একজনকে দেখে। বো ব্রীন!

যা করার, ধীরে সুস্থে ঠাণ্ডা মাথায় করার ইচ্ছে ছিল ফ্রাঙ্কের। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, সেটা আর সম্ভব নয়। বো ব্রীনের মত লোকেরা কখনও মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে না।

ওর নিজেরও মাথা গরম হয়ে উঠতে চাইছে। যে-শুভবোধ ওকে বো ব্রীনদের কাছ থেকে আজ এতদূরে নিয়ে এসেছে, প্রচণ্ড রাগে তা উবে যাওয়ার উপক্রম হলো। ইচ্ছে হলো, এক্ষুণি ব্রীনের সামনে উপস্থিত হয়ে অস্ত্রের সাহায্যে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে। কিন্তু পর মুহূর্তে বুঝতে পারল, সেটা ঠিক হবে না। ও যদি আগের মত একা হতো, তা হলে দ্বিতীয়বার চিন্তা করত না। কিন্তু ও এখন জানে, ওর ওপর নির্ভর করছে *বক্সড ওয়াই*। র‍্যাঞ্চটার স্বার্থে ওকে এখন ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে। সুজানাদের জন্যেই ওকে র‍্যাঞ্চটাকে নিরাপদ রাখতে হবে।

দরজা দিয়ে বেরোল না ফ্রাঙ্ক। একটা জানালা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে লবির উত্তর প্রান্তে ছুটল। অর্ধেক পথ গিয়ে গলির ভেতর কয়েকটা হ্যাটপরা মানুষের ছুটোছুটি দেখে থেমে গেল। ফিরে আসবে, এমন সময় কানে এসে ঢুকল ভারী পায়ের শব্দ। দোতলা থেকে নামছে একজন। সিঁড়ির দিকে তাকাল ফ্রাঙ্ক। প্রথমে পা দুটো নজরে এল। কাছের একটা টেবিলের ওপর পড়ে থাকা ভাঁজ করা খবরের কাগজটা তুলে নিল ফ্রাঙ্ক। চেয়ারে বসে ওটা মেলে ধরল মুখের সামনে, যাতে চেহারা আড়াল করা যায়।

বুটপরা পায়ের শব্দ শুনছে ও। ধীর পায়ে টেনে টেনে হাঁটছে লোকটা। একটু পর সিঁড়ির নীচের ধাপে এক মুহূর্তের জন্যে থামল।

বন্ধ জানালার ওপাশে গলিপথে উত্তেজিত গলায় হৈ চৈ শুনল ফ্রাঙ্ক। রাস্তায় গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে কয়েকজন। তবে এই মুহূর্তে ইচ্ছে করলেও ব্যাপার কী জানার উপায় নেই। খবরের কাগজের আড়াল থেকে মুখ বের করছে না ও।

সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে কথা বলল লোকটা। ফ্রাঙ্কের উদ্দেশে প্রশ্ন করল, 'কী হচ্ছে ওখানে? অত হৈ চৈ কীসের?'

মুখের সামনে থেকে কাগজ সরাল না ফ্রাঙ্ক। 'সম্ভবত ব্যাংকের দিকে,' উদাসীন স্বরে জবাব দিল। আশা করছে, ব্যাপার কী জানার জন্যে লোকটা নিজেই লবি থেকে নেমে ওদিকে হাঁটা ধরবে।

কিন্তু জায়গা থেকে এক পা-ও নড়ল না লোকটা। বাইরে কেউ একজন চেঁচিয়ে বলল, 'আমি যাচ্ছি ভেতরে। ওকে খুঁজে বের করব।'

বলার সাথে সাথেই পোর্চে বুটজুতোর আওয়াজ উঠল। স্ক্রিনডোর খুলে গেল। পোর্চ থেকে একটা লোক জানতে চাইল, 'এখান দিয়ে গেছে নাকি লোকটা?'

ওপর থেকে নেমে আসা লোকটা জানতে চাইল, 'কার কথা বলছ? কোন্ লোক? কোথায় যাবে এখান দিয়ে?'

পোর্চের লোকটা ভয়ানক স্বরে চেঁচাল, 'আরে এই মাত্র যে এদিকে এসেছে, সে লোক। কার্লি ফ্রাঙ্ক। স্ট্রাইপের কলারঅলা শার্ট পরেছে গায়ে...'

'ওহ্, ওই লোকের কথা বলছ? ওই তো হল থেকে সোজা বেরিয়ে এসে পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। এই মাত্র।'

ওর কথা শেষ হওয়ার আগে পোর্চ থেকে বুটের শব্দ মিলিয়ে গেল। একটু পরে রাস্তার হৈ চৈ কমে এল কিছুটা। কেউ গলা উঁচিয়ে কিছু বলছে। এতদূর থেকে বোঝা গেল না ঠিক কী বলা হচ্ছে। আরও কিছুক্ষণ পর হৈ চৈ আরও থিতিয়ে এল। দূরে সরে যেতে লাগল লোকজন।

লবিতে এখন অস্বস্তিকর এক নীরবতা। পেপারের আড়াল থেকে মুখ তুলছে না এখনও ফ্রাঙ্ক। অবাক হয়েছে সে। লবিতে দাঁড়ানো লোকটা কেন মিছে কথা বলল বোঝার চেষ্টা করছে। কী উদ্দেশ্য ওর? সেটা পরিষ্কার হতে বেশি সময় লাগল না। ঠাণ্ডা এবং আত্মবিশ্বাসী গলায় লোকটা বলল, 'তোমার যদি পেপার পড়া শেষ হয়ে থাকে, ফ্রাঙ্ক, তা হলে মাথা তুলতে পার। এসো, এবার আমরা কথা বলি।'

কথা বাড়াল না ফ্রাঙ্ক। চেহারা না-দেখলেও গলার স্বরে বুঝে গেছে লোকটা কে? কাগজটা সরিয়ে তাকাল প্রাক্তন সঙ্গীর দিকে। স্নেক ফ্রেন্সটন। হাতে একটা পিস্তল। তাক করে আছে ফ্রাঙ্কের দিকে।

'টার্নারের কী হয়েছে,' মৃদুস্বরে বলল ফ্রেন্সটন। 'আমার তা জানার কোনও আগ্রহ নেই। যে-টাকাগুলো তুমি ওর কাছ থেকে নিয়ে এসেছ, আমার কেবল সেগুলো পেলেই চলবে।'

# বিশ

'তা হলে তুমিও ওই নির্বোধগুলোর সাথে যোগ দিয়েছ?'

'আমি এক সময় নির্বোধ ছিলাম,' অম্লান বদনে জবাব দিল ফ্রেন্সটন। 'আবার তা হতে চাই না।'

'কিন্তু এখন আবার তা-ই হতে যাচ্ছ, স্নেক। টার্নারের টাকা আমি আনিনি।'

'বেশ তো,' হৃষ্ট স্বরে বলল স্নেক। 'সেটা এক্ষুণি প্রমাণ হয়ে যাবে।' ফ্রেন্সটনের নীল দু'চোখে সন্দেহের কালো ছায়া। 'দেখি, তুমি উঠে দাঁড়াও। তারপর শেলবেল্ট খুলে ফেলো।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল ফ্রাঙ্ক। হাত থেকে ফেলে দিল পেপারটা। গম্ভীর মুখে তাকাল প্রাক্তন সহযোগীর দিকে। বোঝা যাচ্ছে, ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে ওর মাথায়। কিন্তু উদ্যত পিস্তলের মুখে দাঁড়িয়ে আর কীই বা করা যায়? আর প্রতিপক্ষ তো তারই মত আরেকজন দুর্ধর্ষ ডাকাত।

সে জানে, বেগতিক দেখলে গুলি করতে দ্বিধা করবে না ফ্রেন্সটন। গুলির শব্দে মানুষের মনোযোগ কাড়া হবে, এ-নিয়ে মোটেই চিন্তা করবে না সে। ওর লোকেরা, যারা হন্যে হয়ে ফ্রাঙ্ককে খুঁজছে, টের পেয়ে ছুটে আসার অনেক আগেই ফ্রাঙ্ককে খুন করে ওর সব কিছু লুটে নিয়ে সটকে পড়তে পারবে সে। ওদিকে তাকে জীবিত বা মৃত ধরে দেয়ার পুরস্কারটাও কৌশলে কজা করে নেবে বো ব্রীন।

কোমর থেকে বেল্টের দুই প্রান্ত খুলে দিল ফ্রাঙ্ক। মেঝের ওপর নিজের পিস্তল পড়ার ধাতব শব্দ শুনতে পেল।

ফ্রেন্সটনের ঠোঁট বেঁকে গেল বিদ্রূপে। 'আমার ধারণা ছিল, তুমি একজন দুর্ধর্ষ লোক। তুমিও কি তা-ই মনে কর?'

ফ্রাঙ্কের তরফ থেকে কোনও জবাব না পেয়ে বলল, 'চলো, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠা যাক।'

আপাতত লোকটার কথা শোনা ছাড়া আর কোনও পথ দেখতে পাচ্ছে না ফ্রাঙ্ক। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। ওর দু'ধাপ পেছনে পিস্তল হাতে ফ্রেন্সটন। সিঁড়ির ওপরের ধাপে উঠে থামল ফ্রাঙ্ক। পেছন থেকে ফ্রেন্সটনের হুকুম শোনা গেল, 'ডানদিকে তৃতীয় ঘরটা...হ্যাঁ, এবার নক করো।'

তা-ই করল ফ্রাঙ্ক। ভেতরে নড়াচড়ার শব্দ শুনল। তারপর খুলে গেল কপাট। কিন্তু যতটা অবাক হওয়ার কথা, ততটা হলো না ভেতরে লামট্রিলের মেয়ে মার্টাকে দেখে। মার্টার হাত দরজার নবে। ওই খুলে দিয়েছে দরজা। 'অ। তা হলে তুমিই? সব ইঁদুর এক গর্তে!'

বুনো বেড়ালীর মত ফোঁস করে উঠল মার্টা। এগিয়ে এসে খামচি বসাল ফ্রাঙ্কের চিবুকে। তারপর পিছিয়ে যেতে ফ্রেন্সটন বলল, 'হয়েছে। এবার কাপড়চোপড় পরে নাও, বেবি। তারপর যাও, তোমার বুড়ো বাবাকে ডেকে নিয়ে এসো।'

দরজা বন্ধ করার ঝামেলায় গেল না মার্টা। মেঝে থেকে কাপড়চোপড় তুলে নিয়ে ওগুলো গায়ে চড়াল। অসুস্থ বোধ করছে ফ্রাঙ্ক। চোখ নিচু করে মেঝের দিকে চেয়ে রইল। মার্টাকে এখানে এ-অবস্থায় দেখতে পাবে, ভাবতেই পারেনি ও।

কাপড়চোপড় পরে নিয়ে মাথায় চিরুনি বুলাল মার্টা। একদম নিষ্পাপ মনে হচ্ছে এখন মেয়েটাকে। যেন মুখের ভেতর এক টুকরো মাখন ঢুকিয়ে দিলেও গিলে খেতে পারবে না—এমনই

নিরীহ। স্কার্টের ঝুল গুটিয়ে নিয়ে বিনীত ভঙ্গিতে ওদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

সিঁড়িতে ওর হাইহিলের শব্দ মিলিয়ে যেতে কথা বলল ফ্রেন্সটন, 'এবার ভেতরে ঢোকো।'

আদেশ পালন করল ফ্রাঙ্ক। ওকে অনুসরণ করে চলল অস্ত্রধারী। তার আগে লাথি মেরে দরজাটা বন্ধ করে দিল। 'নাও, এবার শুয়ে পড়ো বিছানায়। উপুড় হয়ে।'

'বাই গড, ফ্রেন্সটন...' প্রতিবাদ করল ফ্রাঙ্ক।

এক হাতে থাবড়া মেরে বিছানায় ফেলে দিল ওকে ফ্রেন্সটন। ঘোঁৎ করে উঠল, 'তোমাকে এখনই শুয়ে পড়তে বলেছি। আগামীকাল নয়!'

তীব্র বিদ্বেষ আর ঘৃণায় ঝলসে উঠল ফ্রাঙ্কের চোখ। তবু লোকটার আদেশ মানল। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সে।

'আরাম করে শোও,' বিদ্রূপে ঝলসে উঠল ফ্রেন্সটনের চোখদুটো। ফের কঠোর স্বরে বলল, 'তেড়িবেড়ি করলে কিন্তু তোমার ওই নোংরা মাথাটা স্রেফ গুঁড়িয়ে দেব।'

*তেড়িবেড়ি* করল না ফ্রাঙ্ক। ফ্রেন্সটনের নির্দেশ মত *আরাম* করেই শুল। তবে ফ্রেন্সটন কোনওরকম ঝুঁকিতে গেল না। প্যান্টের পকেটদুটো নিজে থেকে উল্টে দিতে বলল ফ্রাঙ্ককে। তা-ই করল ফ্রাঙ্ক। পকেট থেকে ব্যাংকনোটগুলো ছড়িয়ে পড়ল বিছানায়। সশব্দে নিঃশ্বাস টানতে শুনল ফ্রেন্সটনকে। যেন এত টাকা দেখে নিজেকে সামলাতে কষ্ট হচ্ছে বেচারার। 'বেশ, এবার হাতদুটো রাখো পিঠের ওপর আড়াআড়ি করে,' উত্তেজনায় ফ্যাঁসফেঁসে গলায় হুকুম দিল।

কিছু একটা করতে পারার শেষ সুযোগটাও যেন শেষ হয়ে গেল, এমনভাবে কাজটা করল ফ্রাঙ্ক। কোমরের ওপর হাতদুটো আড়াআড়ি করে রেখে পড়ে রইল নির্জীবের মত। তবে তাতে

ভুলল না ফ্রেস্টন। সামান্যতম অসাবধানতাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ওর কাজে। টাকাগুলো হাতে পাওয়ার জন্যে মোটেও ব্যস্ততা দেখাল না সে। আগে দরজার কাছে গেল। ভেতর থেকে ওটার ছিটকিনি লাগাল। তারপর বিছানার কাছে এল। পায়ের দিকে গোটানো বেডশিট থেকে একটা টুকরো ছিঁড়ে নিল। দু'হাতের কবজি বাঁধল শক্ত করে। তারপর আর এক টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে বলল, 'বুটগুলো খুলে দাও।'

খেঁকিয়ে উঠল ফ্রাঙ্ক, 'জাহান্নামে যাও!'

সে-প্রস্তাবে সাড়া দেয়ার তেমন কোনও উৎসাহ দেখা গেল না ফ্রেস্টনের মধ্যে। সে বরং বিছানার কাছে গেল। ফ্রাঙ্কের দু'পায়ের ওপর বসল। বিছানার সাথে চেপে ধরল ওর দুই পা। মৃদু হিস হিস স্বরে বলল, 'দেখি, আরেকবার বলো দেখি কথাটা।'

পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে ফ্রাঙ্কের ডান কাঁধে সজোরে মারল ও। তারপর বাম কাঁধে মারল। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল ফ্রাঙ্ক। শরীর মোচড়াতে শুরু করল। দেখে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল ফ্রেস্টন। 'বুঝলে, আমার উচিত তোমাকে মাথায় মেরে শেষ করে দেয়া।'

উঠল ও। পিস্তলটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর ফ্রাঙ্কের পা থেকে বুটজোড়া খুলতে গেল। নিচু হতেই কাঁটাঅলা বুটপরা ডান পায়ে সজোরে উল্টো লাথি হাঁকাল ফ্রাঙ্ক।

চিবুকে আচমকা লাথি খেয়ে সোজা হয়ে গেল ফ্রেস্টন। ব্যাপারটা চিন্তাই করতে পারেনি বেচারা। আচমকা মনে হলো, চিবুকটা যেন কপালের সাথে গিয়ে ঠেকে গেছে। প্রথমে অস্পষ্ট ঘোঁৎ এবং পরক্ষণেই বুকফাটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল ওর গলা চিরে। টাল সামলাতে না-পেরে লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়।

আহত দুই কাঁধ নিয়ে উঠে বসল ফ্রাঙ্ক। হাঁচড়ে পাঁচড়ে নেমে গেল বিছানা থেকে। দুই কাঁধ পাথরের মত ভারী। যেন খচ্চরের জোড়াপায়ের লাথি খেয়ে ফুলে উঠেছে। তবে তাতে পাত্তা দিচ্ছে

না সে। ওকে আগে ফ্রেন্সটনের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।

বুটপরা পায়ে ফ্রেন্সটনের মাথার এক পাশে লাথি হাঁকাল সে। আবার আর্তনাদ করে উঠল লোকটা। পরের লাথিতে আর আর্তনাদের সময় পেল না। গলা দিয়ে শব্দ বেরিয়ে আসার আগে জ্ঞান হারাল।

লোকটার দিকে আর একবারও না-তাকিয়ে রাস্তার দিকের দেয়ালের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ফ্রাঙ্ক। বুটের গুঁতোয় জানালার এক পাল্লার কাচ ভেঙে ফেলল। এরপর পেছনে ফিরে ভাঙা কাচের ফাঁক দিয়ে দু'হাতের বাঁধা কবজি ঢুকিয়ে দিয়ে ঘষতে শুরু করল। প্রচণ্ড ব্যথা পাওয়া সত্ত্বেও কাজটা চালিয়ে গেল সে। এক সময় কেটে ছিঁড়ে গেল বাঁধন।

বাঁধনমুক্ত হয়ে বিছানা থেকে টাকাগুলো কুড়িয়ে নিল সে। ফ্রেন্সটনের হোলস্টার থেকে ওর পিস্তলটাও তুলে নিল। তারপর বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে ছিটকিনি খুলে ফেলল। নব ঘুরিয়ে দরজা খুলতে যাবে, এমন সময় নীচতলায় সিঁড়ির গোড়ায় বুটপরা পায়ের শব্দ আর কথাবার্তা শুনে স্থির হয়ে গেল।

এক মুহূর্ত চিন্তা করল ফ্রাঙ্ক। জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা বাদ দিতে হচ্ছে ওকে। দেরি হয়ে গেছে। ওপরে ফ্রেন্সটনের আর্তনাদ নিশ্চয় ওদের কানে গেছে। যে-মুহূর্তে ফ্রাঙ্ককে দেখতে পাবে, অমনি গুলি চালাতে শুরু করবে ওরা। এদিকে আর কয়েক মুহূর্ত পরেই সিঁড়ির গোড়ায় জড়ো হওয়া ওর লোকগুলো ওপরে উঠে আসবে। ওদের চোখে পড়া মাত্র গুলি করবে ওরাও। এর মানে আর হয়তো মিনিট দুয়েক মাত্র তার আয়ু। এত লোকের সাথে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারবে না ও।

কর্মপন্থা ঠিক করতে এক মুহূর্ত সময়ও নিল না ফ্রাঙ্ক। বুকের গভীর, একদম গভীর থেকে শ্বাস টেনে ফুসফুস ভর্তি করল। শরীরে শক্তি সঞ্চয় করল। তারপর অতি কষ্টে নিচু হয়ে

ফ্রেস্টনের কোমরে হাত দিয়ে ওর দশাসই শরীরটা তুলে নিল কাঁধে।

টান দিয়ে দরজা খুলে ফেলল ও। নীচ থেকে পায়ের শব্দ আর উত্তেজিত কথাবার্তার আওয়াজ ক্রমে ওপরের দিকে উঠে আসছে। সম্ভবত হলরুমের ভেতর ঢুকতে যাচ্ছে লোকগুলো।

একটু পরেই ঢুকে পড়ল ওরা। ফ্রাঙ্ককে দেখতে পাওয়ার আগেই ওদের দিকে ফ্রেস্টনের দশাসই শরীরটা ছুঁড়ে দিল সে। 'এই নাও, এটাকেই তো তোমরা খুঁজছিলে, তাই না?'

লোকগুলো কিছু বুঝে উঠতে না উঠতে হলঘরের মাঝখান দিয়ে ডাইভ দিল ফ্রাঙ্ক। লাগোয়া আরেকটা রুমে গিয়ে ঢুকল। ওই রুমে কোনও জানালা নেই। সিলিং-এর সাথে লাগোয়া একটা কাচের ট্র্যাপডোর দিয়ে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে ভেতরটা আলোকিত করেছে। ঘরের মাঝখানে একটা চেয়ারে উঠে সিলিং-এর ট্র্যাপডোরের এক প্রান্ত ধরে ঝুলে পড়ল। এরপর ঝাঁকি দিয়ে পুরো শরীরটা তুলে ফেলল ওপরের দিকে। ট্র্যাপডোর গলে ছাদের ওপর উঠে গেল। পেছন থেকে আটকে দিল ট্র্যাপডোরের দরজা।

ছাদটা সমতল। তবে রাস্তার দিক থেকে উঁচু ফলস ফ্রন্টের কারণে আড়াল পেয়েছে ও। ওর বামদিকে বেকারির একতলা ছাদ। ডানদিকের বিল্ডিংটার ছাদ এটার সমান উঁচু। দুই বিল্ডিং-এর মাঝখানে গলিপথ। দূরত্ব ফুট চারেক। নীচে গলিপথে লোকজন আছে কিনা দেখার চেষ্টায় না-গিয়ে লম্বা এক দৌড়ে লাফিয়ে ডানদিকের ভবনের ছাদে চলে গেল ফ্রাঙ্ক। দ্রুত পায়ে স্কাইলাইটের কাছে গিয়ে ওটার পানিরোধক হ্যাচটা খুলে ভেতরে তাকাল।

ও যেখানে বসেছে, তার ঠিক নীচে ভেতরে একটা স্টোররুম। হাবিজাবি জিনিসপত্রে ঠাসা। সাবধানে মেঝেয় নামল

ফ্রাঙ্ক। সতর্কভাবে জিনিসপত্রের ফাঁকে ফাঁকে পথ করে নিয়ে দরজার দিকে চলে এল। পুরানো ধাঁচের দরজা। নব ঘোরাতে শব্দ হলো, কিন্তু দরজা খুলল না। আবার চেষ্টা করল, কিন্তু একই ফল হলো।

দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত চিন্তা করল ফ্রাঙ্ক। ও জানে, এখানে নষ্ট করার সময় নেই। প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান। কিন্তু দরজা খোলার কোনও উপায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। গুলি করে তালা খোলার কথা ভাবল। পর মুহূর্তে বাতিল করে দিল সে-চিন্তা। গুলির শব্দে ওর নিজের অস্তিত্ব জানান দেয়ার কোনও মানে নেই।

দরজাটা নিয়ে আবার চিন্তা করল সে। ওটা খোলার কোনও উপায় দেখছে না। হঠাৎ স্টোররুমের এক কোনায় কিছু শুকনো তক্তা চোখে পড়ল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল। তারপর এগিয়ে গিয়ে একটা শক্ত দেখে তক্তা তুলে নিল। দরজার নীচে দিয়ে ফাঁকা অংশটায় তক্তাটার এক মাথা ঢুকিয়ে জোরে চাড় দিল। ক্ষয়ে যাওয়া দরজার পাল্লা সইতে পারল না সে-চাপ। সশব্দে উঠে এল দরজার পাল্লার একটা পাট। তক্তা ফেলে দিয়ে পিস্তল হাতে বেরিয়ে পড়ল ভাঙা দরজার ফাঁক গলে। পিস্তল উঁচিয়ে সামনের দিকে তাকাল। তবে গুলি করার মত যৌক্তিক কারণ বা লক্ষ্য না-পেয়ে হোলস্টারে ঢোকাল ওটা।

গার্ডরেইল দিয়ে ঘেরা ব্যালকনির মত একটা ঝুলবারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল সে। জায়গাটা খালি, কিন্তু বাদুড়ের বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ। অন্ধকারে লোহার একটা মরচেধরা সিঁড়ি খাড়াভাবে নেমে গেছে নীচের দিকে। ওটা বেয়ে সাবধানে নামতে শুরু করল ফ্রাঙ্ক। চোখ তীক্ষ্ণ আর কান খাড়া। বিপজ্জনক কোনও শব্দ শোনা কিংবা দৃশ্য দেখার জন্য তৈরি।

সিঁড়ির পাশের খোলা জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়াল সে। মনের ভেতরে একধরনের অস্বস্তি। ম্যাচ জ্বেলে হাতের তালুর ভেতর

সীমাবদ্ধ রাখল আলো। সামান্য আলোয় সামনে গোটাকয়েক দরজা দেখল। প্রথম দরজাটার নবে হাত দিয়ে খুলে ফেলল ওটা। নাকে এসে ঝাপটা মারল ছ্যাতলাপড়া কাপড়ের গন্ধ। পরের ঘরগুলোর ভেতরেও যদি একই অবস্থা হয়, ফ্রাঙ্ক ভাবল, তা হলে নিশ্চয় সে পুরানো পরিত্যক্ত অপেরা হাউসের ড্রেসিংরুমে দাঁড়িয়ে আছে।

ব্যাপারটা ঠিক কিনা বোঝার জন্যে আরেকটা দরজা খুলে ভেতরে তাকাল। ম্যাচের আলোয় দেখল ভেতরে কাপড়চোপড় আর অন্যান্য দ্রব্যের এলোমেলো সমাহার। একটা স্যাডলও দেখতে পেল। ম্যাচের কাঠি জ্বলে শেষ হতেই ওটা ফেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছে, এমন সময়ে এক অদ্ভুত চিন্তা এসে ভর করল ওর মনে। সাথে সাথে পাকস্থলীতে শীতল ভাব টের পেল। ব্যাপারটা হয়তো তেমন কিছু নয়, তবু সে বুঝতে পারছে না অপেরার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ড্রেসিংরুমে চল্লিশ পাউণ্ড ওজনের স্যাডল কেন?

নতুন আরেকটা কাঠি জ্বালাল। ওটার আলোয় দেখতে পেল একজন মহিলার কাপড়চোপড়। এমনভাবে হ্যাঙ্গারে রাখা, মনে হয় এই মাত্র কেউ পরা থেকে খুলে রেখেছে। আবার যে কোনও সময় টেনে নিয়ে গায়ে চড়াতে পারে। স্যাডলটাও যেন কেউ মাত্র গতকালই ব্যবহার করেছে।

শীতের সকালে বরফশীতল এক বালতি পানি ঢেলে গোসল করার কথা ভাবলে যেরকম অনুভূতি হয়, ঠিক সেরকম বোধ হলো ফ্রাঙ্কের কাছে। বুকের ভেতর ভয়ের আভাস। এই স্যাডলটা ও চেনে। এটার মালিক ওর পরিচিত। ব্রীন ছাড়া আর কারও হতে পারে না এটা। কিংবা এমনও হতে পারে, ব্রীনের কোনও চেলা এনে রেখেছে এখানে।

পিছিয়ে বেরিয়ে এল ফ্রাঙ্ক রুম থেকে। গুহামতন একটা

ছায়াচ্ছন্ন জায়গার মধ্য দিয়ে সামনে এগোল। আরেকটু এগোতে একটা দরজা পেল। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে দরজার নবে হাত দিল। আস্তে করে ঘোরাল। ওর ডান হাতে এখনও ফ্রেস্টনের পিস্তলটা।

কোনওরকম শব্দ ছাড়াই খুলে গেল দরজা। গলা বাড়িয়ে ভেতরে তাকাতে থেমে গেল ফ্রাঙ্ক। দম বন্ধ হয়ে গেল যেন হঠাৎ। ঘরের ভেতরে ওর কাছ থেকে মাত্র ফুট দশেক দূরেই চারজন লোক বসে আছে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে গভীর শলা-পরামর্শে ব্যস্ত।

কথা বলছে ন্যাট লামট্রিল। গলায় রাগের আভাস। 'আমি বুঝতে পারছি না লোকটাকে তোমরা ধরতে পারছ না কেন?'

'ওকে আমরা ধরবই,' আশ্বাস দিল একজন। 'এই বিল্ডিংগুলোর কোথাও লুকিয়ে আছে সে। আমার বিশজন লোক রাইফেল হাতে খুঁজছে।'

তলপেটে ঠাণ্ডা অনুভূতিটা আবার ফিরে এল ফ্রাঙ্কের। টের পেল হাত-পা দুটোই কাঁপছে। ঠিক এ-অবস্থায় লামট্রিলের গলা শুনল, 'ওকে ধরতে পারলেই তোমার জন্যে ভাল, ক্রফোর্ড। অবশ্য তুমি যদি নিজের ভালটা বুঝতে পার।'

*ক্রফোর্ড!* লামট্রিল লোকটাকে ক্রফোর্ড নামে ডেকেছে। কিন্তু ওর গলার স্বর ফ্রাঙ্কের কাছে বো ব্রীন বলেই মনে হচ্ছে। ওই শয়তানটার গলা ফ্রাঙ্ক পৃথিবীর দূরতম প্রান্ত থেকে শোনা গেলেও চিনতে পারবে। ওকে ওর এখনই খুন করা উচিত। এই লোক নিজে ভাল নয়, কাউকে ভাল থাকতেও দেবে না। কিন্তু...

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল ফ্রাঙ্ক। জানে, ব্রীনকে যদি ওর খুন করতেও হয়, সেটার উপযুক্ত সময় এখনও আসেনি।

লোকটা লামট্রিলের নোংরা লালসা মেটানোর কাজ করে। পরের ভূমি গ্রাস করার কাজটা ওকে দিয়েই চালায় ব্যাংকার। ও

ওকে ক্রফোর্ড নামে ডেকেছে। এদিকে ফ্রাঙ্ক শুনেছে, *ডেভিল আয়রন* রেঞ্জ বসের নাম ক্রফোর্ড। আর মসম্যানের ধারণা, ওর নাম কিড ব্যাজার, এ-অঞ্চলের দুর্ধর্ষ ও বুনো ডাকাতদলের সর্দার।

নিজের অজান্তেই যেন ফ্রেন্সটনের পিস্তলটা উঁচু করল ফ্রাঙ্ক। যে-অভিযোগে ও এখন অভিযুক্ত, ঠিক সে-কাজটাই করতে ইচ্ছে হচ্ছে। চিবুক শক্ত হয়ে উঠল ওর, গানসাইটে নিয়ে এল লোকটাকে। এই লোকটাই ওকে খুনি হিসেবে প্রচার করেছে, আর এখন ও ব্যাংকারকে বলছে, ওর পেছনে বিশজন রাইফেলধারী লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। ধরা পড়ল বলে।

দু'মুখো সাপের মত কুটিল লোকটাকে খুন করে প্রতিশোধ নেয়ার একটা সুযোগ এখন ওর সামনে। শুধু একটা মাত্র গুলি, চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে ওর সব শয়তানি। শুধু ট্রিগারটা টেনে দিলেই হয়। এবং একই সঙ্গে ওই ভূমিগ্রাসী ব্যাংকারকেও...

কিন্তু আচমকা ওর মনের শুভবোধ তাকে বাধা দিল কাজটা করতে। ক্ষণিকের চাঞ্চল্য কেটে গেল মন থেকে। ওর মনে হলো, এটা হয়তো আপাত সমাধান হতে পারে। কিন্তু এতে স্থায়ী কোনও সমাধান আসবে না। মসম্যানের একটা কথা ওর মনে পড়ল। রেঞ্জার এই প্রসঙ্গেই বলেছিল: *দুটো ভুল মিলেও একটা সঠিক কাজ হয় না। কখনও হয়নি, কখনও হবেও না। জীবনটা অনেক কঠিন। অনেকের চেয়ে এই ব্যাপারটা আমি অনেক বেশি জানি। আর সৎ মানুষ সব সময় আইনকে তার আপন গতিতে চলতে সাহায্য করবে। তা না-হলে কিন্তু আমরা কেউই শেষ পর্যন্ত মানুষ থাকব না। স্রেফ জীব-জন্তুতে পরিণত হব।*

পিস্তলের নল নিচু করল ফ্রাঙ্ক। সে অনেকদিন পর্যন্ত আইনের বিপক্ষে চলেছে, পশুর সঙ্গে ওর কোনও পার্থক্য ছিল না। কিন্তু এখন ওর মধ্যে শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে। এখন সে

জানে, মসম্যান ঠিকই বলেছে।

তবে একটা কথা ভেবে অবাক লাগছে ওর। ও আর বো ব্রীন মিলে অনেক ডাকাতি করেছে। কিন্তু কখনও লোকটার এই দ্বৈত ভূমিক টের পায়নি ও! ও আসলে লামট্রিল নামক নেকড়েটার বশংবদ এক নোংরা শেয়াল। লামট্রিলের উচ্ছিষ্ট খেয়েই বেঁচে আছে।

আস্তে করে দরজাটা টান দিল ও। ভেতরের লোকগুলোর অলক্ষে চলে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু দরজার মরচে ধরা কব্জা হঠাৎ বিশ্বাসঘাতকতা করল ওর সাথে। শব্দ হলো। সাথে সাথে যেন ছিটকে উঠে দাঁড়িয়ে গেল ভেতরে লোকগুলো। খিঁচে দৌড় লাগাল ফ্রাঙ্ক।

পেছনে ধুপধাপ চিৎকার-চেঁচামেচি। ব্রীনের গলাই সবার ওপরে। অন্ধের মত ছুটল ফ্রাঙ্ক। কোন্‌দিক থেকে এসেছে, তাড়াহুড়ার মধ্যে খেয়াল করতে না-পেরে আরেক দিকে চলে গেল। হঠাৎ ওর সামনে বিল্ডিং-এর বাইরের দেয়াল বাধা হয়ে দাঁড়াল। লাফ দিয়ে ওটা ডিঙাল সে। ওপাশে গিয়ে পড়ল। এক মুহূর্ত পড়ে রইল ওখানে। খেয়াল করল লাফ দেয়ার সময় হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেছে ফ্রেন্সটনের পিস্তলটা।

ওর হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে, যেন বুকের খাঁচা ছেড়ে বাইরে চলে আসবে। পিস্তল হারিয়ে ভীত ও হতাশ হয়ে পড়েছে। শরীরের নিচে হাঁটুর কাঁপন টের পেল।

আচমকা একটা জিনিস খেয়াল করল ও। পেছনে দরজাটার বাইরে কোনও সাড়া পায়নি ও। তার মানে কেউ কি বেরিয়ে আসেনি ওর পিছু ধাওয়া করে? একটু পরে ব্যাপারটা স্পষ্ট হলো। ন্যাট লামট্রিল ধুরন্ধর মানুষ, বো ব্রীন তার এক কাঠি বাড়া। ওরা ওই দরজা দিয়ে কেউ বেরোয়নি আচমকা গুলি খেয়ে মরার ভয়ে। ওরা নিশ্চয় ভেবেছে, শত্রু যদি বাইরে ওত পেতে থাকে, তা হলে

দরজা দিয়ে বেরোনো মাত্র ওদের সবাইকে গুলির আওতায় পেয়ে যাবে। তাই বাইরে আসার ঝুঁকি নেয়নি কেউ।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সামান্য স্বস্তি বোধ করছে, এমন সময় পেছনে অস্পষ্ট শব্দ শুনে যেই ঘাড় ফেরাতে যাবে, তার আগে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে জ্ঞান হারাল সে।

## একুশ

চোখ খুলতে লোকটাকে দেখল ফ্রাঙ্ক। ওর ওপর অনেকটা ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। বিশালকায় লোকটাকে চিনতে পারল সে। সেট। চেরি কাউসে এ-লোকটাই তাকে দেখে গ্রেফতার করার জন্যে খুব তড়পানি শুরু করেছিল। ওর চোখে এখনও সে আগের দৃষ্টি। শেরিফ লেইফককেও দেখতে পেল ফ্রাঙ্ক। তবে সেটের চেহারায় তেতো ভাব দেখে মনে হচ্ছে এখানে তেমন একটা পাত্তা পাচ্ছে না বেচারা।

'তুমি আমার সঙ্গে চলো,' লোকটাকে বলল শেরিফ। 'আমি এবার দরজা লাগিয়ে দেব।'

নিজের মর্যাদা সম্পর্কে হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠল সেট। শেরিফের কথায় ভুরু কুঁচকাল। 'কেন এই শালা জোকারটাকে জেরা করবে না?'

'কেন নয়?' ওকে আশ্বস্ত করল শেরিফ। 'আবার যখন আসব, তখন অবশ্যই করব। তখন তুমিও যদি আস, তুমিও করতে পারবে। তবে তার আগে ওর জন্যে খাবারের ব্যবস্থা

করতে হবে।'

'কিন্তু,' ঘোঁৎ করে উঠল সেট। 'আমার মনে হয় না, ততক্ষণ ও এখানে থাকবে।' থপ থপ করে পা ফেলে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল সেট।

স্ক্রিনডোর বন্ধ হওয়ার আওয়াজ কানে না-আসা পর্যন্ত ভুরু কুঁচকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল শেরিফ। তারপর ফ্রাঙ্কের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেছে। এখানে কী ঘটেছে, লামট্রিলের লোকেরা সবাই জেনে গেছে। তোমাকে খুঁজে বের করার আগে তারা আর কোনওদিকে মন দেবে না।'

হাঁটুর ওপর দু'হাত গুটিয়ে মাথা গুঁজে বসে ছিল ফ্রাঙ্ক। সেট যেখানে বাড়ি মেরে ওকে অজ্ঞান করেছিল, সেখানে এখনও রক্ত লেপ্টে আছে। শুকিয়ে গেছে অবশ্য। শেরিফের কথা শুনে গুঙিয়ে উঠল। মাথা না-তুলে জানতে চাইল, 'কী ঘটেছিল?'

'বাছা!' বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলল শেরিফ। 'যদি পিঠের চামড়া বাঁচাতে চাও, তা হলে যে-পথে যাচ্ছিলে, সোজা সে-পথে চলে যাও। আজ রাতে এ-শহরের লোকেরা আগুনের মত তেতে আছে। হাতে পেলে ওরা ছিঁড়ে খাবে তোমাকে। মনে হলো, তোমার কাছে এমন কিছু কাগজপত্র আছে, যা ওরা চায়। তবে আমরা যেটা পেয়েছি, সেটা হলো বার হুইলের বিক্রি রসিদ।'

থামল শেরিফ। তারপর আগের চেয়ে বিতৃষ্ণ স্বরে বলে চলল, 'তুমি লোকটা দেখছি, যেখানে যাও, সেখানে ঝামেলা বাধিয়ে বসো। চেরি কাউসে তোমাকে যখন গ্রেফতার না-করে ছেড়ে দিয়েছি, তখন মনে হয়েছিল, তুমি লোকটা হয়তো ততটা খারাপ নও। সুযোগ পেলে সৎ পথে চলবে। বার্ট মসম্যান যেরকমটা চায়, তোমার মধ্যে হয়তো সেরকম সাহস ও অভিজ্ঞতা দুটোই আছে। তাই চেয়েছিলাম ওর সঙ্গে তোমার দেখা হোক...'

এবার মাথা দুলাল ফ্রাঙ্ক। ওর চোখে আগ্রহ দেখা দিল।

'আচ্ছা! ব্যাপারটা তা হলে তুমিই ঘটিয়েছ!'

'কিন্তু জানতাম না, তুমি এটাকে এমন গুবলেট করে ফেলবে।'

'বুড়ো!' এবার হাসল ফ্রাঙ্ক। 'তুমি তোমার লেজটা ফাটা বাঁশে আটকে দিয়ে বসে আছ। তুমি যদি জানই যে, আমি টার্নারকে খুন করিনি, তা হলে এই জেলে ভরে রেখেছ কেন?'

'সেটা না-করলে এতক্ষণে তুমি মরে পড়ে থাকতে। ওরা তোমাকে পেলে ছিঁড়ে খেত।'

'কিন্তু এটা সিব ডসনের কাউণ্টি। এখানে তো তোমার গ্রেফতারের ক্ষমতা নেই।'

'সেটা কোনও সমস্যা নয়। ন্যাট লামট্রিল আর তার ফোরম্যান এই র‍্যাঞ্চটা দখল করার পাঁয়তারা কষছে। আমি তোমাকে গ্রেফতার করায় ওরা বরঞ্চ খুশি। ওর ধারণা, আমি ডসনের হয়ে কাজটা করেছি। কিংবা সে হয়তো চেয়েছে, কাজটা এভাবেই হোক। কে জানে, সে নিজেই হয়তো ডসনকে এর কাছ থেকে দূরে রাখতে চেয়েছে। স্প্যারোহোয়াকে ওর লোকেরা ফাঁসির দড়ি হাতে নিয়ে বসে আছে। তোমাকে হাতে পাওয়ামাত্র ঝুলিয়ে দেবে। সেট তো মনে হয় সে-উদ্দেশ্যে ঘুর ঘুর করছে।'

'আমাকে একটা বন্দুক আর একটা তাজা ঘোড়া দাও...'

'ব্যাপারটা অত সহজ মনে কোরো না, বাছা।' মৃদু হাসল শেরিফ। 'স্প্যারোহোয়াক থেকে ফাঁসির দড়ি নিয়ে লোকগুলো আসা পর্যন্ত ক্রফোর্ডের চেলারা রাইফেল হাতে অপেক্ষা করছে শহরে। আমার মনে হয়...

ওর কথা শেষ হওয়ার আগে বাইরে হঠাৎ হৈ চৈয়ের শব্দ শোনা গেল। লাফিয়ে উঠল শেরিফ। ফ্রাঙ্কের হাতে একটা সিক্সগুটার ধরিয়ে দিয়ে ছুটে দরজার কাছে গেল। তারপর দরজা খুলে ছুটল অফিসের দিকে। কিন্তু সিঁড়ির দু'ধাপ নামতে বাধা

পেল। বুড়ো ভালুকের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে একটা লোক ওর সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটাকে দেখে পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল ফ্রাঙ্ক, 'ব্ল্যাক!'

পিস্তলের দিকে বাড়ানো দুই বুড়োর হাত থেমে গেল আচমকা। একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা।

'ঠিক আছে। আমরা সবাই এখন একত্র হয়ে গেছি। লেইফ, এই হচ্ছে ব্ল্যাক। বার হুইলের রামরড...

'ফ্রাঙ্ক!' পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার তর সইল না ব্ল্যাকের। 'ওই শালা বেজন্মারা সুজানাকে ওর র‍্যাঞ্চ থেকে তুলে নিয়ে গেছে।'

বুটপরা পায়ের প্রচণ্ড লাথি হাঁকাল ফ্রাঙ্ক মেঝের ওপর। পাথরের মত কঠিন হয়ে উঠল মুখ। চোখ দিয়ে যেন আগুন ছুটল। ব্যাখ্যার অতীত এক ক্রোধে টগবগ করে উঠল ভেতরটা। 'কে?'

'অপহরণ করেছে সে, যাকে তুমি দেখে এসেছিলে। আর ওকে চাকরি দিয়েছিল সুজানার বাবা বুড়ো রোনাল্ড।'

'পুরো ব্যাপারটা প্রথম থেকে বলে যাও,' গম্ভীর স্বরে বলল ফ্রাঙ্ক।

'বেলা একটার দিকে ওসব তার-টার নিয়ে আমি *বক্সড ওয়াই*-এ গিয়েছিলাম। র‍্যাঞ্চে গিয়ে দেখি, বুড়ো রোনাল্ড পড়ে আছে দরজার পৈঠার নীচে। ওর মাথার খুলিতে খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে। তারপর পায়ের ছাপ ধরে সুজানার ঘরে গিয়ে দেখি, ও নেই। ওখানে প্রচুর ধস্তাধস্তির চিহ্ন। বুঝলাম, ওকে জোর করে তুলে নেয়া হয়েছে। তারপর যেখানে মেয়েটাকে ঘোড়ায় তোলা হয়েছে, সে-জায়গাটাও খুঁজে বের করলাম। সেখান থেকে ট্র্যাকিং করে বুঝতে পারলাম, মেয়েটাকে ডেভিল আয়রনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'চমৎকার!' আচমকা যেন খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল লেইফ। 'এবার যদি মি. লামট্রিলকে গেঁথে ফেলা যায়, এবার যদি প্রমাণ করা যায়, মেয়েটাকে অপহরণ করে ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওর কাছ থেকে র‍্যাঞ্চটা কেড়ে নিয়েছে...

বিরক্তিতে ঘোঁৎ করে উঠল ব্ল্যাক। 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, মেয়েটাকে যেন তুমি স্রেফ দাবার ঘুঁটিই মনে করছ?'

'ধ্যাৎ!' খেঁকিয়ে উঠল ফ্রাঙ্ক। 'বক বক থামিয়ে আগে আমাকে যেতে দাও তো...

'তুমি অবশ্যই যাবে, ম্যান,' ওকে আশ্বস্ত করল লেইফ। 'তবে কিনা একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আমি চাইব না সিব ডসন এসে তোমাকে ছাড়া দেখতে পাক, চাই না তোমার হাতের অস্ত্রটি ওর চোখে পড়ুক।' সেলের উঁচু জানালার দিকে চাইল ও। 'আমার আগে মসম্যানের সঙ্গে কথা বলা উচিত।'

আবার ঘোঁৎ করে উঠল ব্ল্যাক। 'খোদার গজব! তোমাদের কথাবার্তার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারছি না। ফ্রাঙ্ককে এখানে কেন বন্দি করা হলো? আর তুমিই বা কীভাবে এসে এত সব আদেশ-নিষেধ শোনাবার অধিকার পেলে?'

নিজের ব্যাজটা একবার নেড়ে যেন ব্ল্যাকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার প্রয়াস পেল লেইফ। তারপর ফ্রাঙ্কের দিকে চেয়ে বলল, 'যে কোনও সময় ওই লোকগুলো এসে হাজির হতে পারে।'

'জাহান্নামে যাক ওরা। দরকার হলে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ুক। আসতে দাও ওদের। আমরা ওদের জন্যে অপেক্ষা করব এখানে। আসার পর বাছাধনদের টের পাইয়ে দেব। কুকুরের মত গুলি করে মারব শালাদের।'

'না,' নিজের সিদ্ধান্ত জানাল লেইফ। তারপর পরামর্শের সুরে বলল, 'ব্যাপারটা আমরা ক্লিনটনের হাতে ছেড়ে দেব। এড জোন্সের বন্দুকের দোকানের পেছনে আমি একজোড়া ঘোড়া তৈরি

রেখেছি। ক্লিনটনকে বলবে সে যেন থিয়েটার ভবনে আগুন লাগিয়ে দেয়। ও যখন কাজটা শুরু করবে, তুমি একটা তাজা ঘোড়া নিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। বন্দুকের দোকানের পেছনে যেখানে ঘোড়াগুলো রেখেছি, সেখানে গিয়ে উদ্ভট কথাবার্তা কিংবা আচরণ শুরু করবে, যাতে লোকেরা মজা পায়। মোট কথা, ওখানে রাখা ঘোড়াগুলো নিয়ে কেউ যেন গবেষণা করার সময় না-পায়। আর এদিকে এরা ব্যস্ত হয়ে পড়বে থিয়েটার ভবনে লাগা আগুন নিয়ে।'

বুড়ো শেরিফের দিকে তাকিয়ে ওর নির্দেশটা এক মুহূর্ত ভেবে দেখল ব্ল্যাক, তারপর কোনও কথা না-বলে রাস্তার দিকে ছুটে গেল।

এবার ফ্রাঙ্ককে নিয়ে পড়ল লেইফ। রিং থেকে একটা চাবি খসিয়ে নিয়ে বারের মধ্য দিয়ে বাড়িয়ে দিল ওর দিকে। 'এই চাবি দিয়ে সেলের দরজা খোলা যাবে। আমরা যদি কাজ শেষ করে সময়মত পৌঁছাতে না-পারি, তার আগে যদি স্প্যারোহোয়াকের লোকগুলো এসে পড়ে, তা হলে...' বাকিটা শেষ না-করে কাঁধ ঝাঁকাল বুড়ো। বেরিয়ে গেল।

মিনিট চারেক পরে থিয়েটার ভবনের দিক থেকে হৈ চৈ আর ভয়ার্ত চেঁচামেচির শব্দ শুনতে পেল ফ্রাঙ্ক। জেলখানা থেকে প্রায় দুই শ' গজ দূরে থিয়েটার ভবন। ক্লিনটন যে তার কাজ শুরু করে দিয়েছে, না-দেখেও আন্দাজ করতে পারল।

গরাদের বাইরে রাস্তায় ছুটন্ত লোকজনের পায়ের শব্দ আর কথা শব্দ শুনল ফ্রাঙ্ক। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে চাইল অবস্থাটা। কিন্তু জানালাগুলো অনেক উঁচুতে হওয়ায় সে-চিন্তা বাদ দিতে হলো। গ্রিল দিয়ে ঘেরা জানালায় কাচ নেই। তাই বাইরে থেকে আসা আওয়াজ শুনতে অসুবিধে হচ্ছে না। রাস্তায় প্রচুর হৈ হল্লা, উত্তেজিত কথাবার্তা।

একটু পরে জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকার অনেকটা ফিকে হয়ে উঠতে দেখল ফ্রাঙ্ক। মাঝে মধ্যে অগ্নিশিখাও দেখল। অনেক ওপরে উঠে গেছে। বাইরে হৈ চৈয়ের সাথে ক্ষুব্ধ ও ভয়ার্ত গলায় আর্তনাদের মত শব্দ পাচ্ছে সে। বোঝা যাচ্ছে কিছু মানুষ আগুনের কবল থেকে তাদের ব্যক্তিগত সহায়-সম্পত্তি রক্ষার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। কেউ কেউ সম্ভবত শহরের ভবিষ্যৎ নিয়েই উদ্বেগে কাতর হয়ে চেঁচামেচি শুরু করেছে।

বুড়ো লেইফের কথা ভাবছে ফ্রাঙ্ক। অগ্নিসংযোগের ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে সে। ওর বন্দির ওপর থেকে লোকজনের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে। আগুনে এখন শহর জ্বলছে আর ও বোধ হয় সিব ডসনের অফিসে বসে বসে তা দেখছে। কিন্তু একজন শেরিফ কি এভাবে আগুন লাগিয়ে দেয়ার কাজ করতে পারে? কেবল একজন মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্যে দশজনের সহায়-সম্পদ নষ্ট করে দিতে পারে? নৈতিকভাবে এটা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

সুজানার কথাও মনে পড়ল ফ্রাঙ্কের। ব্ল্যাক এসে বলেছে, ওকে ধরে নিয়ে গেছে ডেভিল আয়রনে। আচমকা একটা উপলব্ধি হলো ওর। সুজানার নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

মেয়েটার অবস্থা যেন চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী সুজানার শরীর ক্রাউডির মত দুশ্চরিত্রকে বেপরোয়া করে তুলতে পারে।

কিন্তু চিন্তাটা এর বেশি বিস্তৃত হওয়ার আগে জানালা দিয়ে এক দলা ধোঁয়া এসে ঢুকল সেলের ভেতর। করিডরে বিভিন্ন জিনিস পোড়ার গন্ধ। কাছাকাছি কোথাও আগুনে পোড়ার ফট ফট শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড়। বাইরের হৈ চৈয়ের শব্দ ক্ষণকালের জন্যে যেন চাপা পড়ে গেল। হঠাৎ ডসনের অফিসের ভেতর থেকে কার অস্পষ্ট চিৎকার শুনল ও। একই সাথে

সিক্সগানের আওয়াজ। রাইফেলের চেয়ে ভয়ঙ্কর শোনাল শব্দটা।

মেঝেয় কিছু একটা পতনের শব্দ। পর মুহূর্তে স্যাডল গানের এক নাগাড়ে গুলিবর্ষণ। ঝন ঝন শব্দে কাচ ভেঙে পড়তে লাগল। ধোঁয়ার ঝাপটায় চারদিক অন্ধকার। ডসনের অফিস থেকে জেলখানা পর্যন্ত বাঁকানো পথের পুরোটাই অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। দলা দলা কালো ধোঁয়া আগুনের সাথে পাল্লা দিয়ে প্রবল হয়ে ওঠা বাতাসে মোচড় খাচ্ছে।

চকিতে একটা সন্দেহ জাগল ফ্রাঙ্কের মনে। সাথে সাথে যেন পুরো ব্যাপারটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে উঠল ওর কাছে। কিছু একটা চালাকি চলছে এখানে। চালাকিটা করছে লামট্রিলের চেলাদের কেউ। থিয়েটার ভবনে আগুন লাগার সুযোগে কেউ একজন ডসনের অফিসে ঢুকে ঝুলন্ত লণ্ঠনটায় গুলি করে ফেলে দিয়েছে। তারপর গুলি করেছে লেইফককে। এখন জেলখানার দিকে আসবে বন্দিকে তার সেলের ভেতর খুন করার জন্যে।

সেলের একটিমাত্র দরজা। পেছন দিয়ে বেরোবার কোনও পথ নেই। জানালাগুলোও এতটা নীচে নয় যে, টপকে যাওয়া যাবে। এখান থেকে বেরোবার একটাই মাত্র পথ—এবং সেটা সামনে দিয়ে।

ভয় পেল ফ্রাঙ্ক। এমন ভয় যে, ওর মনে হলো, এর চেয়ে বেশি ভয় পাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ঠক ঠক করে কাঁপতে শুরু করেছে ওর হাত-পা। সে-অবস্থায় শেরিফের দেয়া চাবিটা হাতে নিল। তালায় ঢোকাতে গিয়ে আশঙ্কা হলো, চাবিটা হয়তো কাজ করবে না। শেরিফ হয়তো ভুল করে ভুল চাবিটা দিয়ে গেছে ওকে।

প্রবল স্বস্তির মধ্যে নিজের আশঙ্কাটা মিথ্যে হতে দেখল ফ্রাঙ্ক। খুট করে খুলে গেল তালা। দরজা খুলে আলোয় উজ্জ্বল

করিডরে এসে দাঁড়াল সে। ধোঁয়া আর প্রচণ্ড উত্তাপ থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে শরীরটাকে যথাসম্ভব গুটিয়ে।

নিজেকে বাঁচানোর পাশাপাশি সুজানার জীবন নিয়েও দুশ্চিন্তা বোধ করছে ফ্রাঙ্ক। এক সময় অবাক হয়ে আবিষ্কার করল, সুজানার জন্যে মনের ভেতর অদ্ভুত ধরনের আকর্ষণ বোধ করছে। সাথে সাথে অন্ধ এক ক্রোধে ভেতরটা ফুঁসে উঠল। অসহায় মেয়েটা কিনা এখন পড়ে আছে ক্রাউডি আর বো ব্রীনের মত দুই অমানুষের পাল্লায়। এদের কাছে ন্যায়-নীতি বলতে কিছু নেই। আছে কেবল স্বার্থচিন্তা, প্রতিহিংসা আর লোভ।

করিডর বেয়ে ডসনের অফিসের দিকে গেল ও। আগুনের শিখা জিভ মেলে দিয়ে যেন চাটতে চাইছে চারদিক। ভেতরে আবছা অন্ধকার। আগুন ঢুকতে পারেনি। মাথা নিচু করে অগ্নিশিখার ভেতর দিয়ে লাফ দিল সে। ভেতরে ডেস্কের কাছে গিয়ে পড়ল। ওদিককার দরজার কাছে পড়ে থাকতে দেখল লেইফের প্রাণহীন শরীরটা। গুলি করা হয়েছে শেরিফকে। খিস্তি আওড়াল সে। এদিকে আগুনের গরম আর ভেতরে ঢোকা ধোঁয়ায় দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো ওর। লাশটাকে পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে চলল। ধোঁয়ার অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগোল। বাইরের দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে বাকি পথটুকু প্রায় লাফিয়ে পেরোল সে। মাথা উঁচু করতে লোকটাকে দেখল। লোকটার দু'হাতে দু'বালতি পানি।

জীবনে যে মাঝে মধ্যে পানির অভাব বোধ করেনি ফ্রাঙ্ক তা নয়। কিন্তু পানির জন্যে নিজেকে এতটা কাঙাল বোধ করেনি আর কখনও। ওকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠেছে লোকটা। চট করে ডান হাতের বালতিটা নামিয়ে রেখে পিস্তলের জন্যে কোমরের দিকে হাত বাড়াল। জায়গা থেকে লাফ দিয়ে ওর

পায়ের ওপর গিয়ে পড়ল ফ্রাঙ্ক। চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল লোকটা। চিবুকে ঘুসি খেয়ে বন্ধ হয়ে গেল। পরের ঘুসিতে উল্টে পড়ল পেছনে। ধূলিশয্যা নিল। লাফিয়ে লোকটার কাছ থেকে সরে গেল সে। ছুটল পেছনে একটা টাইর‍্যাকের ভেতর দিয়ে। দু'পা এগোতে বুঝতে পারল ওর সামনে গোটাকয়েক ঘোড়া। আগুন, ধোঁয়া আর কোলাহলে আতঙ্কে পাগল হয়ে গেছে প্রায়। বাঁধন ছিঁড়ে পালানোর চেষ্টা করছে। দুটো ঘোড়া সমানে পা ছুঁড়ছে সামনে পেছনে। আরেকটা রশি ছেঁড়ার চেষ্টায় মাথা নিচু করে টানছে।

প্রথম দুটোকে বাদ দিয়ে তৃতীয়টার লাগামে হাত দিল ফ্রাঙ্ক। ঝাঁকি মেরে মাথা সরিয়ে নিল আতঙ্কিত ঘোড়াটা। ঘুরে সরে যাওয়ার আগে আবার হাত বাড়াল ফ্রাঙ্ক। বাঁধনটা খুলে ঘোড়াটাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে, এমন সময় পেছনে রাইফেলের শব্দ শুনে একলাফে চড়ে বসল ওটার পিঠে। আচমকা পিঠের ওপর সওয়ারী পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠতে চাইল ঘোড়াটা। কিন্তু সওয়ারী আনাড়ী নয় বুঝতে পেরে বেগড়বাই করল না আর। লাগামে টান খেয়ে পাশের বিল্ডিংগুলোর সামনে দিয়ে ছুটল।

এদিকে ঘোড়ার পায়ের শব্দে তটস্থ হয়ে উঠল উইনচেস্টারধারী। কিন্তু সামনে কাউকে দেখতে না-পেয়ে প্রতিধ্বনির উদ্দেশে গুলি পাঠাতে শুরু করল। পাত্তা দিল না ফ্রাঙ্ক। ঘোড়া পেয়ে ঠিক বাতাসে ওড়ার অনুভূতি টের পাচ্ছে সে এখন নিজের ভেতর।

ওয়্যাগন চলাচলের রাস্তা ধরে ডেভিল আয়রনের দিকে ঘোড়া ছোটাল সে। ওখানে লামট্রিলের লোকদের হাতে বন্দি হয়ে আছে সুজানা রোনাল্ড। মনে মনে প্রার্থনা করছে, পৌঁছতে খুব বেশি দেরি যেন না-হয়ে যায়।

ঠিক কতটা পথ পেরিয়ে এসেছে বলতে পারবে না ফ্রাঙ্ক। তবে ডেভিল আয়রনের কমলা রঙের বাতি দেখার আগে পর্যন্ত ওর মনে হলো শত শত মাইল পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে ওকে।

বো ব্রীনের সঙ্গে এক সময় ওর মোকাবিলা হবে, এটা সব সময় ওর মনে ছিল। জানে, লোকটা চরম নীচ আর স্বার্থপর। একসঙ্গে অনেকদিন একই কাজ করেও তাদের মধ্যে আন্তরিক কোনও সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তার কারণও অজানা নয় ফ্রাঙ্কের। ওরা আসলে দু'জনেই সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুর লোক। একত্রে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ফ্রাঙ্ক তাই ওর কাছ থেকে সরে যেতে চেয়েছিল। ভবিষ্যতে লোকটার কোনও ক্ষতি করার ইচ্ছে ওর ছিল না। কিন্তু ব্রীন ওকে বিশ্বাস করতে পারেনি। তাই পিছু নিয়েছে, যাতে ওকে শেষ করে দেয়া যায়। শুধু তা-ই নয়, হাত মিলিয়েছে তাদের সাধারণ শত্রু লামট্রিলের সঙ্গে।

তবু তাকে নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাত না ফ্রাঙ্ক। কিন্তু এখন ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে সুজানা রোনাল্ডও। আর সুজানাকে অপহরণ করা হয়েছে ওকে টেনে নেয়ার জন্যে। ওদের ধারণা, ফ্রাঙ্ক সুজানাকে ওদের কাছ থেকে উদ্ধার করতে যাবেই। কারণ সে মেয়েটাকে ভালবাসে।

বাসেই তো! আচমকা সত্যিটা উপলব্ধি করতে পারল ফ্রাঙ্ক। স্টেজে যে মার্টা মেকে দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল, বুঝে গেছে, এই মার্টা মে সে নয়। ওটা ছিল ওর আরেক রূপ। কিন্তু এই মার্টা মেকে সে চেনে না। একে নিয়ে আর কোনও আগ্রহও ওর নেই। ওর এখনকার চিন্তা সুজানাকে নিয়েই। সুজানার মধ্যে মার্টা মের আভিজাত্য নেই, আকর্ষণী ক্ষমতাও নেই। কিন্তু সুজানা আন্তরিক, মনে-মুখে এক।

ডেভিল আয়রনে পৌঁছার শেষ আধ মাইলের মধ্যে কম পক্ষে দু'বার পেছন থেকে আসা ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এসেছে ওর।

তবে তাতে খুব একটা পাত্তা দিচ্ছে না সে। এখন আবার শোনা যাচ্ছে না। কেউ আসুক আর না-আসুক, তাতে এখন আর কিচ্ছু আসে যায় না। ও এসেছে সুজানাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে। যেভাবে হোক, কাজটা সে করবেই। লামট্রিলের এই চোরাই টাকায় গড়া প্রাসাদ তাকে আটকে রাখতে পারবে না।

সুজানার সঙ্গে থাকার সময়ের স্মৃতি হাতড়াচ্ছে ও মনে মনে। কিন্তু সব কিছু কেমন ঝাপসা আর বিবর্ণ লাগছে এখন। ওর হাসি কেমন মনে করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু মনে হচ্ছে মেয়েটা কখনও ওর দিকে চেয়ে হাসেনি। ওর গলার স্বর স্মরণ করতে চাইছে, কিন্তু মনে হচ্ছে কখনও যেন একটা কথাও বেরোয়নি সুজানার মুখ থেকে। অথচ এটা মনে পড়ছে যে, সুজানা ওকে যা বলেছে, তারচে' বেশি বলতে চেয়েছে। কিন্তু ফ্রাঙ্কের চোখে যেন তখন ঠুলি পরানো ছিল। তাই সুজানার কথা বোঝার চেষ্টা করেনি।

কীরকম অন্ধই না ছিল সে যখন সুজানা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে তার সহায়তা কামনা করেছিল! পাত্তা দেয়নি মেয়েটাকে; বরং বিদ্রূপ করেছিল। হা ঈশ্বর! মনে মনে ভাবল ও। কী বোকাই না হতে পারে মানুষ কখনও কখনও!

আসলে মার্টাই ওকে অন্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু লামট্রিলের মেয়েটা স্রেফ শো পিস ছাড়া আর কিছু নয়। একটা ভ্রষ্টা মেয়েমানুষ। অথচ তার মত শক্ত সমর্থ পুরুষের জন্যে দরকার সুজানার মত সাহসী সৎ একটি মেয়ের, যে-মেয়ে সুখে-দুঃখে বিপদে আপদে স্বামীর পাশে দাঁড়াতে পারবে অটল আস্থার প্রতীক হয়ে। ওর মধ্যে কোনও ভান-ভণিতা নেই।

এই মুহূর্তে নিজের মনোভাব নিয়েও ওর মধ্যে কোনও অস্পষ্টতা নেই। জানে, যে-কাজে যাচ্ছে, সেটা নেহাত বেড়ানো নয়। যে কোনও মুহূর্তে ওকে জড়িয়ে পড়তে হতে পারে

গোলাগুলিতে। তাতে রক্ত ঝরতে পারে। তাতে কিসসু আসে যায় না। সুজানাকে উদ্ধার করতেই হবে। কোনওমতেই কাজটা শেষ না-করে পিছু হটবে না সে।

তবে ওরা ওকে আশা করছে। সে জন্যে সতর্ক থাকবে।

সারি সারি উইলো গাছের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে লামট্রিলের হেডকোয়ার্টার। ভবনগুলো একটার পেছনে আরেকটা দাঁড়িয়ে আছে পদাতিক সেনাদলের মত। শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ। তবে তাতে ভুলছে না ফ্রাঙ্ক। সে জানে, প্রতিটি ঘরের পেছনে কেউ না কেউ ঘাপটি মেরে আছে। লক্ষ করছে ওকে। আর সে যেভাবে বেপরোয়া গতিতে যাচ্ছে, তাতে যে কোনও কিছু ঘটতে পারে। তারা হয়তো তাকে দূর থেকে গুলি করবে অথবা ভালমানুষের মত ঢুকতে দেবে। পুরো ব্যাপারটা নির্ভর করছে তারা কী পরিকল্পনা করেছে তার ওপর।

একটা কথা মনে হলো ফ্রাঙ্কের। কথাটা ভাবতে তার ভাল লাগছে না। তবু সম্ভাবনাটাকে উড়িয়ে দিতেও পারছে না। লামট্রিল ক্ষমতাশালী লোক। ধুরন্ধরও। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর কূটকৌশল বলে আজকের এই অবস্থানে এসে পৌঁছেছে। ওর তুলনায় সুজানা দুগ্ধপোষ্য শিশু মাত্র। লামট্রিল চাইবে কলে-কৌশলে ওকে নিজের বশ্যতা স্বীকার করাতে। ধরা পড়া ইঁদুরকে নিয়ে যেমন খেলে শিকারী বেড়াল, সেরকম খেলবে। শেষ পর্যন্ত হয়তো মেয়েটার স্নায়ুর জোর ভেঙে পড়বে। লামট্রিলের শর্তেই রাজি হয়ে যাবে নিজের সহায়-সম্পত্তি ওর হাতে তুলে দেয়ার জন্যে। আর সেটা যদি সম্ভব না-হয়, তা হলে মেয়েটাকে তুলে দেবে ক্রাউডি আর বো ব্রীনদের হাতে...বাকিটা ভাবতেই শিউরে উঠছে ফ্রাঙ্ক। বো ব্রীনদের মত লোকগুলো আসলে মানুষ নামেরই অযোগ্য।

ওর সামনে স্প্যানিশ স্টাইলে তৈরি বিশাল এক ভবন।

লম্বায় নব্বুই ফুটের চেয়ে বেশি হবে। এ অঞ্চলে এধরনের নির্মাণ চোখে পড়ে না বললেই চলে। রোদ থেকে বাঁচার জন্যে ওপরে ছাউনিঅলা খোলা টানা বারান্দা। একটা লোককে দেখা গেল তার ওপর। ওর দিকেই চেয়ে আছে। বারান্দায় খুঁটির মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আরেকজন, হাতে রাইফেল। উঠানের অন্ধকার কোনায় আরও লোক থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না ফ্রাঙ্ক। একটুও ইতস্তত না-করে সোজা ফটকের দিকে ঘোড়া নিয়ে এগোল সে।

সামনে জোড়ায় জোড়ায় দৃষ্টির অস্তিত্ব উপেক্ষা করে গেইটের ভেতর ঢুকে পড়ল সে। খটখটে উঠানে ঘোড়ার খুরের খট খট শব্দ তুলে একেবারে বারান্দার সামনে গিয়ে থামল। এমনভাবে নড়াচড়া করছে যেন বারান্দার ছাতের ওপর দাঁড়ানো পাহারাদার আর আড়াল থেকে চোখ রাখা লোকগুলোকে বোঝাতে পারে যে, তার মনে কোনও বদ মতলব নেই।

কিন্তু ওর ঘোড়াটা, কী বুঝে কে জানে, আচমকা অস্থির হয়ে উঠল। সামনে দু'পা তুলে লাফিয়ে উঠল হঠাৎ। এরকম কিছুর জন্যে মোটেই তৈরি ছিল না ফ্রাঙ্ক। টাল হারিয়ে পড়ার উপক্রম হতে লাফ দিয়ে পড়ল মাটিতে। সাথে সাথে গড়ান দিয়ে সোজা হলো। বাগিয়ে ধরল অস্ত্রটা। বাড়ির ভেতর থেকে কয়েক জোড়া ছুটন্ত পায়ের শব্দ শোনা গেল। ছাতের ওপর থেকে স্প্যানিশে চিৎকার করে উঠল পাহারাদার, 'কুয়েন এস!' তারপরই অন্ধকার থেকে আরেকটা বিচলিত কণ্ঠ, 'কে ওখানে?' এরপর বাড়ির পেছন অংশ থেকে সামনের দিকে ছুটে আসা পায়ের শব্দ।

'বন্ধু,' অস্পষ্ট স্বরে জবাব দেয়ার চেষ্টা করল ফ্রাঙ্ক। তারপর বারান্দার দিকে ছুটল স্খলিত পায়ে, যেন বোঝাতে চাইছে ও মারাত্মকভাবে আহত। চারদিক থেকেই পায়ের শব্দ আরও কাছিয়ে আসতে লাগল। উইলো ঝোপের মাঝখান দিয়ে আসছে

লোকগুলো। তাদের হাতের বাতিগুলো ডালপালার ফাঁকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। অনবরত হাঁকডাক আর কোলাহল চলছে।

বারান্দা বরাবর ছুটছে ফ্রাঙ্ক। জানে, ওখানে পৌঁছতে পারলে নিজেকে সামলে ওঠার কিছুটা সময় পাওয়া যাবে। ওখানকার ছায়ান্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করার চেষ্টা করা যাবে।

প্রাণান্তকর এক দৌড়ে বারান্দায় উঠে গেল সে। কিন্তু দশ ফুট না-যেতে ওপাশে দরজা খোলার শব্দ হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে আলোয় ভরে গেল বারান্দা, বারান্দা পেরিয়ে উঠান পর্যন্ত।

জায়গায় জমে গেল ফ্রাঙ্ক। নিঃশ্বাস নিতে পর্যন্ত ভুলে গেছে।

খোলা দরজা দিয়ে লামট্রিলকে দেখল ও। ব্রীনকে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। চোখ সরাসরি ওর ওপর। আর বো ব্রীনের চোখ জ্বলছে ধক ধক করে।

'তুমি একটা আস্ত বেকুব!' দূর থেকে চেঁচিয়ে ফ্রাঙ্কের সম্পর্কে নিজের মতামত ঘোষণা করল লামট্রিল। 'তোমাকে আমি স্রেফ ফাঁসিতে ঝোলাব ছিঁচকে চোর হিসেবে। তোমাকে আমি...'

পাত্তা দিল না ফ্রাঙ্ক লোকটার আস্ফালনে। 'মেয়েটা কোথায়?' কড়া সুরে জানতে চাইল।

'গুলি করো ওকে!' লামট্রিলের পেছন থেকে চেঁচিয়ে আদেশ দিল ব্রীন। নিজের অস্ত্রটা উঁচিয়ে ধরল।

ছাতের ওপর থেকে পাহারা দেয়া লোকটা গুলি করতে গেল সময় নিয়ে। তার আগে ফ্রাঙ্কের হাতের অস্ত্র গর্জে উঠল। পেটে গুলি খেয়ে গড়িয়ে পড়ল লোকটা ছাত থেকে। উঠানের দূর কিনারা থেকে গুলির শব্দ এল এবার। ফটকের দিক থেকে একটা রাইফেলের আওয়াজ ভেসে এল। বিল্ডিং-এর দিকে গুলি করছে কেউ একজন। হাসল ফ্রাঙ্ক। ছাতের ওপরকার লোকটাকে পড়ে যেতে দেখে আতঙ্কিত কেউ একজন সম্ভবত এলোপাতাড়ি গুলি

শুরু করেছে। পর মুহূর্তে ওর টুপিবিহীন মাথার ওপর দিয়ে শিস তুলে বুলেট ছুটে যেতে চট করে নিচু হয়ে গেল।

হঠাৎ চরকির মত ঘুরল সে, ঝাঁপিয়ে পড়ল একদিকে। ডাইভ দিয়ে অন্ধকারের দিকে সরে গেল, যাতে ব্রীনের পিস্তলের রেঞ্জের বাইরে থাকা যায়। ওখান থেকে লামট্রিলের হতচকিত মুখ দেখতে পেল। এতটা আশা করেনি ব্যাংকমালিক। আর তার পেছনে ব্রীনের মুখ আতঙ্কে সাদা। দরজার সাথে প্রায় গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনে অন্ধকার উঠান থেকে একজনের গলা শুনল ফ্রাঙ্ক। গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে লোকটা, 'মসম্যান! মসম্যান!'

তবে ওদিকে খুব বেশি মনোযোগ দেয়া সম্ভব হলো না। ফ্রাঙ্কের চোখ ও মন দুটোই এখন সুজানার খোঁজে ব্যস্ত।

হতচকিত অবস্থা কাটিয়ে ওঠার আগে লামট্রিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও। প্রচণ্ড ধাক্কায় ওর ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়ে ওকেসহ একটা কক্ষে ঢুকে পড়ল। পেছন থেকে গুলি চালাল ব্রীন। তাড়াহুড়ার কারণে দু'বারই মিস করল। রুমে ঢুকতে ঢুকতে ঘাড় ফিরিয়ে গুলি চালাল ফ্রাঙ্ক নিজেও। গুলি বেরোল না। চেম্বার খালি হয়ে গেছে। ঝাপটা মেরে ভেতর থেকে দরজা লাগিয়ে দিল সে। খালি পিস্তলটা ফেলে দিয়ে লামট্রিলের কোমর থেকে ওরটা ছিনিয়ে নিল। তারপর হাত দিয়ে দরজার নব খোলার চেষ্টায় না-গিয়ে লাথি মেরে সামনের দরজাটা খুলে ফেলল। নিচু হয়ে সামনের পথটা পেরিয়ে ওপাশের দরজার সামনে গিয়ে পড়ল। ঠিক এসময় দরজা খুলে গেল ভেতর থেকে। সাথে সাথে গুলি চালাল ফ্রাঙ্ক। ক্রাউডির গলাফাটানো চিৎকার শুনে বুঝতে পারল, অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে প্রাক্তন সহকর্মীর। পর মুহূর্তে জানালার কাচভাঙার শব্দ শুনল। জানালা দিয়ে পালিয়েছে তা হলে আহত ক্রাউডি!

ঘরে ঢুকে ম্যাচ জ্বালাল ফ্রাঙ্ক। এটা একটা শোবার ঘর। এ-

মুহূর্তে সে ছাড়া আর কেউ নেই ঘরে। সে জানে, সুজানাকে এই বাড়িতেই কোথাও আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু এতগুলো ঘরের মধ্যে তাকে কোথায় খুঁজবে বুঝতে পারছে না। সেটা বো ব্রীন কিংবা ক্রাউডি নিশ্চয় জানে।

লামট্রিলের হেডকোয়ার্টারটা তৈরি করা হয়েছে লিভিংরুমটা ঠিক মাঝখানে রেখে। ওখান থেকে দু'দিকে দুটো পথ চলে গেছে অন্যান্য ঘরের দিকে। এদিকে ঘরের সংখ্যা কেবল একটাই। এর পেছনে একটা বেডরুম—এবং সম্ভবত এটার দরজা লামট্রিলের অফিসের সাথে লাগোয়া। সুজানাকে কি ওখানে রাখা হয়েছে আর ব্রীন কি এখন ওর ঘরে? নাকি এখন এই রাতের অন্ধকারে লেজ তুলে ভাগছে ডাকাতসর্দার বো ব্রীন? সুজানাকেও কি সঙ্গে নিয়ে গেছে?

ফ্রাঙ্ক বুঝতে পারছে না কোন্‌টার সম্ভাবনা বেশি।

ওকে খুব হিসেব করে এগোতে হচ্ছে এখন। ভয় হচ্ছে ওর কোনও ভুল পদক্ষেপে সুজানার কোনও ক্ষতি হয়ে যায় কিনা। ওর মাথায় খেলছে না এই মুহূর্তে সুজানার উদ্ধারের ব্যাপারে ঠিক কী ব্যবস্থা নেয়া উচিত। কিন্তু মেয়েটাকে রক্ষা করতে হলে এক্ষুণি কিছু একটা করতে হবে। এক মুহূর্ত দেরি করা যাবে না।

ম্যাচের কাঠি নিভিয়ে ফেলল ও। পা থেকে বুটজোড়া খসিয়ে নিল। কাজটা করল অতি সাবধানে, সামান্যতম শব্দও না-করে। তারপর লামট্রিলের কোমর থেকে ছিনিয়ে নেয়া পিস্তলটা হাতে নিয়ে দরজা থেকে ফুট দুয়েক দূরে দাঁড়িয়ে কান পাতল।

বাইরে এখনও হৈ চৈয়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তবে আগের মত অতটা জোরে নয়। গুলির আওয়াজও বন্ধ হয়ে গেছে। একধরনের অস্বস্তিকর নীরবতা। এর মধ্যেই সামনের দরজার নবের দিকে হাত বাড়াল ফ্রাঙ্ক।

কিন্তু হাত রাখার আগেই ওর ভেতরে কী করে যেন জানা

হয়ে গেল যে, বো ব্রীন পালায়নি, আছে এবং ঠিক ওই দরজার পেছনেই।

নবের কাছ থেকে হাত সরিয়ে আনল ফ্রাঙ্ক। দুই সেকেণ্ড পরে দরজার পাল্লা স্পর্শ করল। নখে আঁচড় কাটার মত শব্দ করল। আচমকা ভেতর থেকে বো ব্রীনের মৃদু কর্কশ স্বর এসে ঢুকল ওর কানে, 'শেষ পর্যন্ত তা হলে তুমি এলে, ফ্রাঙ্ক!'

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল ফ্রাঙ্ক। ব্রীনের উদ্দেশ্য বোঝার চেষ্টা করছে। লোকটা এগিয়ে এসে গুলি করছে না। বরং আগ বাড়িয়ে নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। এর মানে কী? লোকটা কি গুলি করতে ভয় পাচ্ছে? নাকি মেয়েটাকে জিম্মি করে এখান থেকে চলে যাবার পরিকল্পনা করেছে?

এমনও হতে পারে ভয়ে আধমরা হয়ে গেছে লোকটা। চারদিকের শান্তভাব হয়তো তাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অন্য ধারণা দিচ্ছে। কিংবা লোকটা হয়তো আহত। জায়গা থেকে নড়তে পারছে না।

কাঠের বোর্ডে ওর নড়াচড়ার শব্দ শুনল ফ্রাঙ্ক। গোঙাচ্ছে লোকটা। মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে অশ্রাব্য খিস্তি। কক্ষের মধ্য দিয়ে টেনে টেনে পা ফেলে লোকটা এগিয়ে আসছে দরজার দিকে। নব ঘুরিয়ে কুঁজো হয়ে বসে পড়ল ফ্রাঙ্ক, পাল্লার ওপর ভর দিয়ে। তারপর জোরে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ফেলল। ভেতরে ঢুকতে যাবে, জমে গেল ব্রীনের গলা শুনে।

'আর এক পা-ও এগোবে না, ফ্রাঙ্ক! তা হলে সোজা মেয়েটার মাথায় একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেব।'

'কী চাও তুমি?'

'বেরিয়ে যেতে চাই।' ঘোঁৎ করে উঠল ব্রীন। 'বার্ট মসম্যানের লোকেরা বাড়ির চারদিক ঘিরে রেখেছে। আমি কাউকে ওর নাম ধরে ডাকতে শুনেছি। তুমি গিয়ে ওই পাজি রেঞ্জারকে

বলো ওর লোকদের নিয়ে চলে যেতে। বলো রোনাল্ডদের মেয়েটাকে আমি আটকে রেখেছি। ওরা এখান থেকে এক্ষুণি দূর না-হলে মেয়েটাকে মেরে ফেলব।'

'ধরো আমি গিয়ে বললাম।'

'ঘরের পেছনে খড়ের স্তূপ আছে। ওখানে আগুন ধরিয়ে দাও। খড়ের আগুনের আলোয় আমি দেখব, রেঞ্জার আর তার লোকেরা এখান থেকে চলে যাচ্ছে। তারা চলে যাবার পর তুমি অফিসের পেছনে দুটো ঘোড়া নিয়ে আসবে। তারপর আগুনের আলোয় খোলা একটা জায়গায় দাঁড়াবে, যেখানে আমি তোমাকে পরিষ্কার দেখতে পাব...'

'মেয়েটার কী হবে?'

'ওকে আমি উঠানের সীমানায় ফেলে যাব। এখন তোমার হাতের অস্ত্রটা মেঝের ওপর ফেলে বেরিয়ে যাও। কাজে লেগে পড়ো।'

লোকটাকে কাবু করার জন্য একসাথে অনেকগুলো উপায় নিয়ে ভাবল ফ্রাঙ্ক। তবে তার একটাও কাজে লাগানোর সাহস পেল না। ব্রীন যেভাবে ভয়ে কাবু হয়ে আছে, তাতে ওর কথামত কাজ না-করলে উল্টোপাল্টা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলতে পারে। নিজের পিস্তলটা মেঝের ওপর ফেলে দিল সে। তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ব্রীন কী বলে তা শোনার জন্যে। ঠিক এ-সময় জানালা দিয়ে বাইরে থেকে আলোর ছটা এসে পড়ল ঘরের ভেতর। সে আলোয় লোকটাকে দেখতে পেল ফ্রাঙ্ক। একা, কেউ নেই ওর সাথে। ডেস্কের ওপাশে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

লণ্ঠন হাতে ঘরে ঢুকল মসম্যান। 'ঠিক আছে, ব্যাজার। অস্ত্র ফেলে দিয়ে এখনই বেরিয়ে এসো ওখান থেকে। আর সুজানাকে অপহরণের দায়ে গ্রেফতার করা হয়েছে তোমার বস মি. লামট্রিলকে।'

কিন্তু সুজানা কোথায়? প্রশ্নটা নিজের অজান্তেই যেন বেরিয়ে এল ফ্রাঙ্কের মুখ থেকে।

জবাবে মসম্যানের এক লোক জানাল, সুজানাকে খুঁজে পেতে হলে কিচেনে যেতে হবে। শোনামাত্র কিচেনের উদ্দেশে ছুটল ফ্রাঙ্ক। ওখানে সুজানার সঙ্গে ব্ল্যাককেও পেল। রশির শক্ত বাঁধনে কালশিরে পড়ে যাওয়া মেয়েটার হাতদুটোর পরিচর্যা করছে বুড়ো। ফ্রাঙ্ক ব্যগ্র হয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আমি দেখছি, ব্ল্যাক। তুমি বরং...'

মুচকি হেসে উঠে দাঁড়াল ব্ল্যাক । 'ঠিক আছে আমি বরং...'

মসম্যানদের উদ্দেশে রওনা হলো ও।

একটু ইতস্তত করল ফ্রাঙ্ক। কী বলবে বুঝতে পারছে না। তারপর বলল, 'তোমার জন্যে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না বেচারার। ব্ল্যাকের কথা বলছি।'

'হ্যাঁ,' ক্লিষ্টস্বরে বলল সুজানা। 'আগে ও আমাদের ওয়্যাগন বস ছিল। তখন আমি একদম ছোট...'

ফ্রাঙ্কের দিকে তাকাচ্ছে না সুজানা। নিজের কালশিরে দাগ পড়ে যাওয়া কবজি ডলছে এক মনে।

ওর দিকে তাকিয়ে স্রেফ বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে ফ্রাঙ্ক। ওর মনে অনেক কথার তোলপাড় চলছে। কিন্তু মনের কথাকে মুখে অনুবাদ করতে পারছে না। কোত্থেকে যেন এক গাদা সঙ্কোচ এসে ওর মুখে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। এই মেয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে কখনও ভাল ব্যবহার করেনি ও। অবশ্য সুজানা নিজেও ওকে খুব বাজেভাবে নিজের কাজে লাগাতে চেয়েছে। তবে সে জন্যে এখন আর ওকে দোষ দিতে পারছে না ফ্রাঙ্ক। ওর জায়গায় অন্য কোনও মেয়ে হলেও হয়তো একই আচরণ করত। আসলে মেয়েটা এক চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। সে অনিশ্চয়তা তার এখনও কাটেনি।

The Online Library of Bangla Books

শেষ পর্যন্ত সঙ্কোচ কাটাল ও। সুজানার পাশে বসে পড়ল। ‘তোমার সে-কাজটা এখনও যদি থাকে, তা হলে করতে আমার আর আপত্তি নেই, সু।’

অস্পষ্ট হাসি হাসল সুজানা। ‘ভুল সিদ্ধান্ত নিচ্ছ না তো? পরে হয়তো পস্তাবে।’

‘পস্তাতে হলে একসাথে পস্তাব না হয়, কী বলো?’

আবার হাসল সুজানা। ‘সে-ক্ষেত্রে আমার কোনও আপত্তি নেই।’

ওর একটা হাত তুলে নিল ফ্রাঙ্ক নিজের হাতে। চুমু খেল কালশিরে পড়া জায়গাটায়।

***